মে ২০০৪ কুড়ি টাকা

আনন্দমেলা

সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা

অবিস্মরণীয় **শঙ্কু-কাহিনি:** নেফুদেৎ-এর সমাধি

সম্পূর্ণ **ফেলুদা-কাহিনি:** শেয়াল-দেবতা রহস্য

জমজমাট ছ'টি গল্প লিখেছেন: **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**

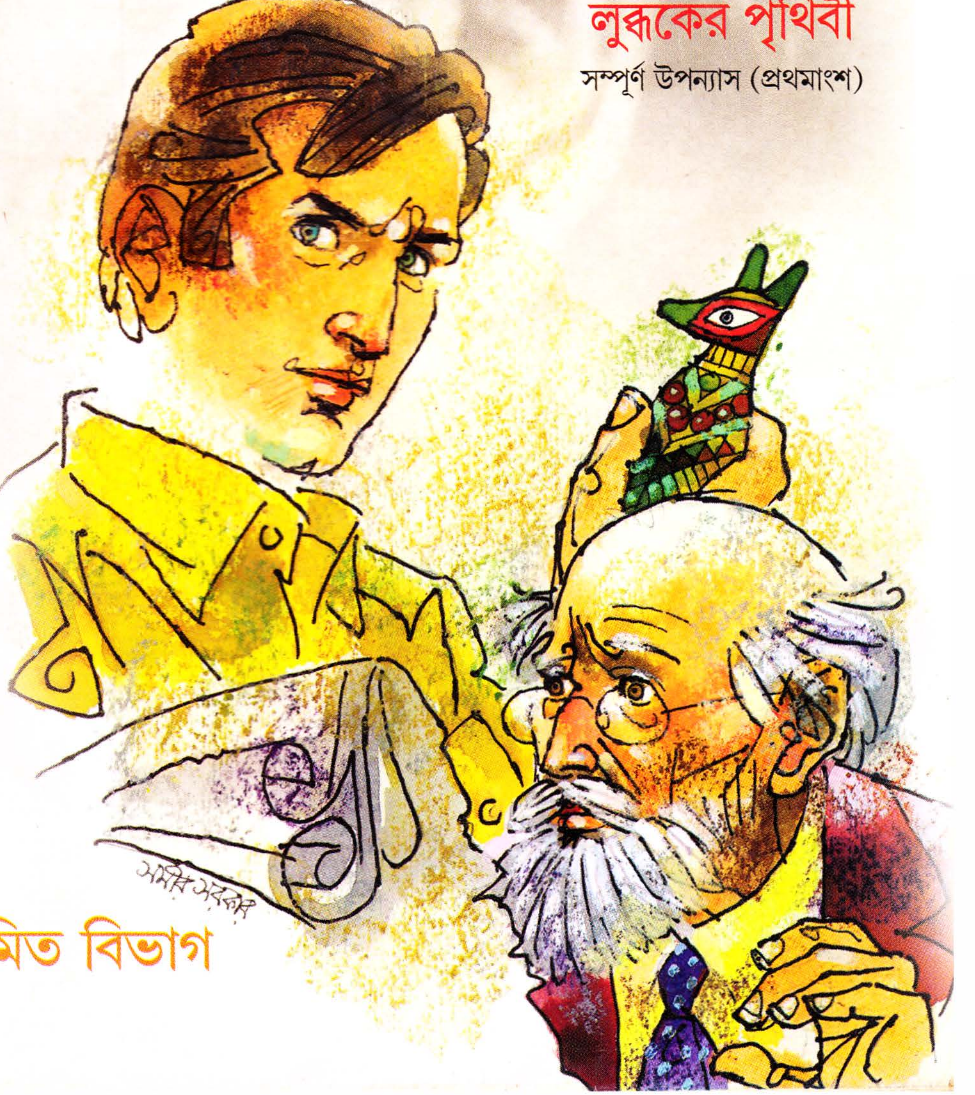
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধার্থ ঘোষ

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মালিনী চট্টোপাধ্যায়

লুব্ধকের পৃথিবী

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)



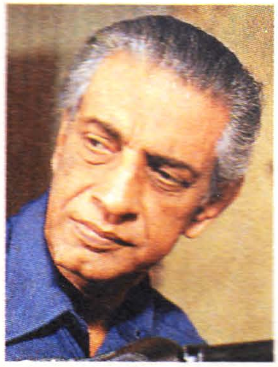
এ ছাড়া সমস্ত নিয়মিত বিভাগ


TurboJet diesel. Unleash the beast within.
Turbojet
UNLEADED
TurboJet
DIESEL WITH ENERGY BOOSTERS
Keep distance
CLUB HP
FASTER PICK-UP > RAPID ACCELERATION > BETTER MILEAGE > VIBRATION-FREE PERFORMANCE
*Available in select cities.
JWT.1035.2004

আনন্দমেলা

৩০ বর্ষ ১ সংখ্যা বৈশাখ ১৪১১ মে ২০০৪

সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা



সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ২ মে। চলচ্চিত্রে তাঁর যেমন অবিস্মরণীয় কীর্তি, তেমনই সাহিত্যেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা ভোলা যাবে না কোনওদিন। তিনি 'আনন্দমেলা' পত্রিকার পাঠকদের জন্য লিখেছিলেন অনেক স্মরণীয় লেখা। তাঁর জন্মদিনের কথা মনে রেখে তাঁরই দু'টি বিখ্যাত লেখা প্রকাশ করে নিবেদিত হল আমাদের শ্রদ্ধা।



প্রোফেসর শঙ্কুর এক জার্মান বন্ধু উইলহেল্‌ম ক্রোল চিঠি লিখে জানালেন, কায়রোতে কার্নাল হোটেলে চলে আসতে। তুতানখামেনের সমাধির মতো আর-একটি সমাধি আবিষ্কারের আগাম খবরও জানিয়েছেন ক্রোল। নতুন সমাধিটি এক পুরোহিত ও জাদুকর নেফ্রুদেৎ-এর। খোঁড়ার সময় সমাধিটির চতুর্থ ঘরটিতে পাওয়া গেল একটা মাঝারি সাইজের অ্যালাব্যাস্টারের কাস্কেট। কী ছিল ওই কাস্কেটের মধ্যে?



নীলমণি সান্যাল নামে রোল্যান্ড রোডের এক ভদ্রলোক জরুরি দরকারে ফেলুদাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ফেলুদারা তাঁর বাড়িতে পৌঁছনোর পর তিনি আলমারির তাক থেকে একটা মূর্তি নামিয়ে ফেলুদাকে দিলেন। মূর্তিটির শরীর মানুষের মতো হলেও, তার মুখটা শেয়ালের মতো। নীলমণিবাবু বললেন, "আমি কি এটা কিনে ভুল করলাম?" ফেলুদা কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন মূর্তি-রহস্যের ঘটনায়?

জমজমাট ছ'টি গল্প

অন্যান্য পাতায়

বিশেষ নিবন্ধ

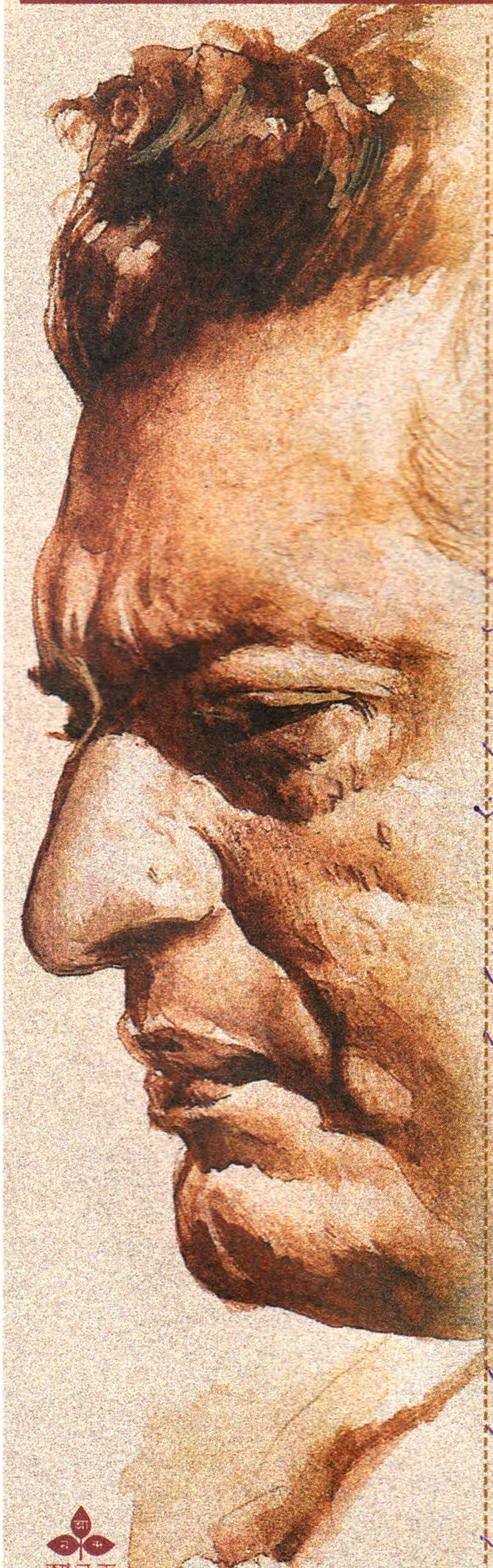
সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)

খেলাধুলো

প্রচ্ছদ: সমীর সরকার

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক: অভীক সরকার।
বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, কাঠমাণ্ডু, পোর্ট ব্লেয়ার, ইম্ফল এবং গ্যাংটক প্রতি কপি দু' টাকা।
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

জন্মদিনে আনন্দ-শ্রদ্ধার্ঘ্য



গল্প সংগ্রহ

আরো এক ডজন
৬০.০০
আরো বারো
৫০.০০
এক ডজন গপ্‌পো
৫০.০০
একের পিঠে দুই
৫০.০০
এবারো বারো
৫০.০০
জবর বারো
৫০.০০
বাঃ! বারো
৪৫.০০

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য-কাহিনী

কৈলাসে কেলেঙ্কারি
৩০.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
৪০.০০
গোরস্থানে সাবধান
৪০.০০
ছিন্নমস্তার অভিশাপ
৩৫.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ
৪০.০০
টিনটোরেটোর যীশু
৩৫.০০
ডবল ফেলুদা
৪০.০০
দার্জিলিং জমজমাট
৩৫.০০
নয়ন রহস্য
৪০.০০
ফেলুদা অ্যান্ড কোং
৪০.০০
ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু
৫০.০০
ফেলুদা প্লাস ফেলুদা
৪০.০০
বাক্স রহস্য
৩৫.০০
বাক্স রহস্য (ক্যাসেট সহ)
৮০.০০
বাদশাহী আংটি
৪০.০০
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে
৩৫.০০
রবার্টসনের রুবি
৩০.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য
৩৫.০০
সোনার কেল্লা
৩৫.০০
হত্যাপুরী
৩০.০০

সবসেরা সংগ্রহ

সেরা সত্যজিৎ
২২৫.০০
আরো সত্যজিৎ
২২৫.০০
পাহাড়ে ফেলুদা
১২৫.০০
কলকাতায় ফেলুদা
১০০.০০
গল্প ১০১
৩৫০.০০
ফেলুদার সপ্তকাণ্ড
১৭৫.০০
ফেলুদার পাঞ্চ
১২৫.০০
ফেলুদা একাদশ
১২৫.০০
শঙ্কুসমগ্র
৩০০.০০

প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

পুনশ্চ প্রোফেসর শঙ্কু
৭৫.০০
প্রোফেসর শঙ্কু
৫০.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা
৫০.০০
মহাসংকটে শঙ্কু
৪০.০০
শঙ্কু একাই ১০০
৫০.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু
৪০.০০
সেলাম প্রোফেসর শঙ্কু
৫০.০০
স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু
৩৫.০০

স্মৃতিকথা

যখন ছোট ছিলাম
৫০.০০

সম্পাদিত গ্রন্থ

সেরা সন্দেশ
২০০.০০

হাসির গল্প

মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প
২০.০০

অন্যান্য বই

তারিণীখুড়োর কীর্তিকলাপ
৩৫.০০
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
৫০.০০
ফটিকচাঁদ
৬০.০০
ব্রেজিলের কালো বাঘ
৩৫.০০
সুজন হরবোলা
৬০.০০

চলচ্চিত্র বিষয়ক

অপুর পাঁচালি
১২৫.০০
বিষয় চলচ্চিত্র
৪০.০০
একেই বলে শুটিং
৪০.০০

বিশেষ চলচ্চিত্র সংস্করণ

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে
১০০.০০

চিত্রকলা

প্রতিকৃতি ৬০.০০
সত্যজিৎ রায়ের আঁকা শতাধিক পোর্ট্রেট

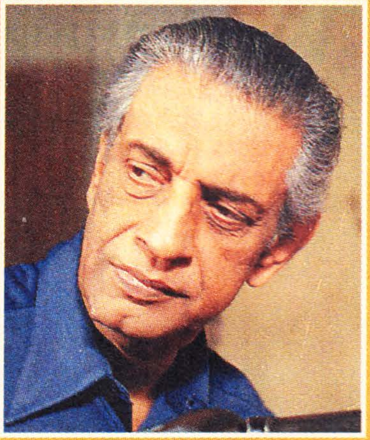
বড়দের গল্প

পিকুর ডায়েরি ও অন্যান্য
২৫.০০

কমিক্‌স

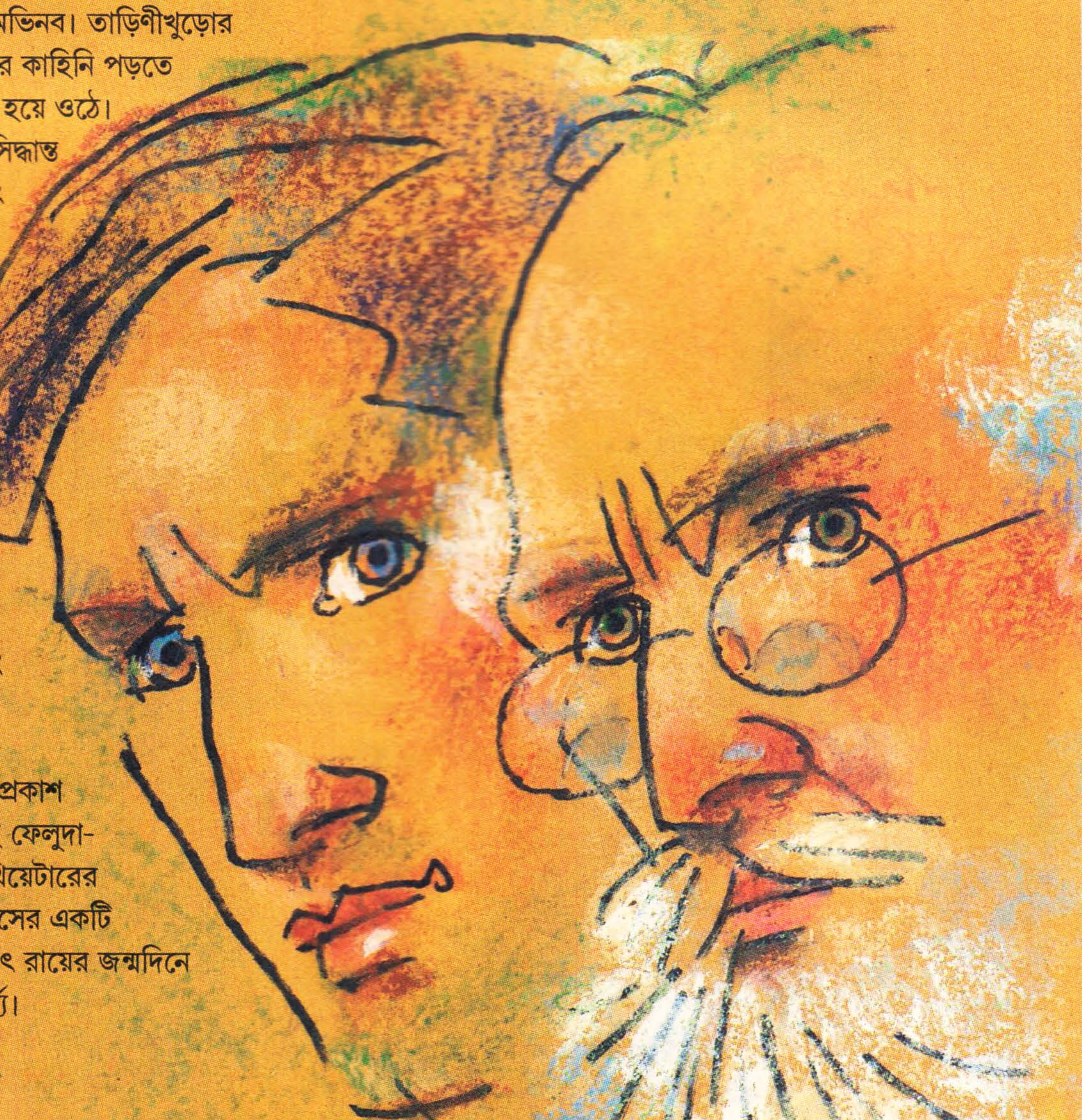
কাহিনী সত্যজিৎ রায়
ছবি অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
১০০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু
একশৃঙ্গ অভিযান
৭০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ.এফ.ও
৩০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু—চী-চিং ও আশ্চর্য পুতুল
৬০.০০
প্রোফেসর শঙ্কু—হাড় ও রোবু
৭০.০০
মরুরহস্য • শঙ্কু ও আদিম মানুষ
৫০.০০
শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান
৪০.০০

আনন্দ
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com



অমর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ২ মে। তিরোধান ২৩ এপ্রিল ১৯৯২। চলচ্চিত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা কোনওদিন ভোলা যাবে না। তেমনই সাহিত্যেও সত্যজিৎ রায়ের অবদান কম নয়। তাঁর অবিস্মরণীয় দুটি চরিত্র প্রোফেসর শঙ্কু এবং গোয়েন্দা ফেলুদা পাঠকের কাছে খুবই জনপ্রিয়। এই দুটি চরিত্রের নানা কাণ্ডকারখানার কথা ছড়িয়ে আছে সত্যজিতের অনেক গল্পে এবং উপন্যাসে। এ ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্ট তারিণীখুড়োর চরিত্রটিও অভিনব। তাড়িণীখুড়োর বিভিন্ন স্বাদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পড়তে পড়তে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। অজানার আহ্বানে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রদের অনন্য করে রেখেছে। সত্যজিৎ ছিলেন 'আনন্দমেলা' পত্রিকার একজন জনপ্রিয় লেখকও। তাই তাঁর জন্মদিনের কথা মনে রেখে তাঁর একটি শঙ্কু-কাহিনি 'নেফ্রুদেৎ-এর সমাধি' এবং একটি ফেলুদা-কাহিনি 'শেয়াল-দেবতা রহস্য' আনন্দমেলার এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল। সেইসঙ্গে আছে ফেলুদা-কাহিনিতে সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটারের বাস্তবতা নিয়ে সুখেন বিশ্বাসের একটি লেখাও। এই নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিনে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।



শঙ্কু-কাহিনি

নেফ্রুদেৎ-এর সমাধি

সত্যজিৎ রায়

ডিসেম্বর ৭

এইমাত্র আমার জার্মান বন্ধু ক্রোলের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। ক্রোল লিখছে—

সব কাজ ফেলে কায়রোতে চলে এসো। তুতানখামেনের সমাধির মতো আরেকটি সমাধি আবিষ্কৃত হতে চলেছে। সাকারার দু মাইল দক্ষিণে সমাধির অবস্থান। কায়রোতে কার্নাক হোটেলে তোমার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে রাখছি।

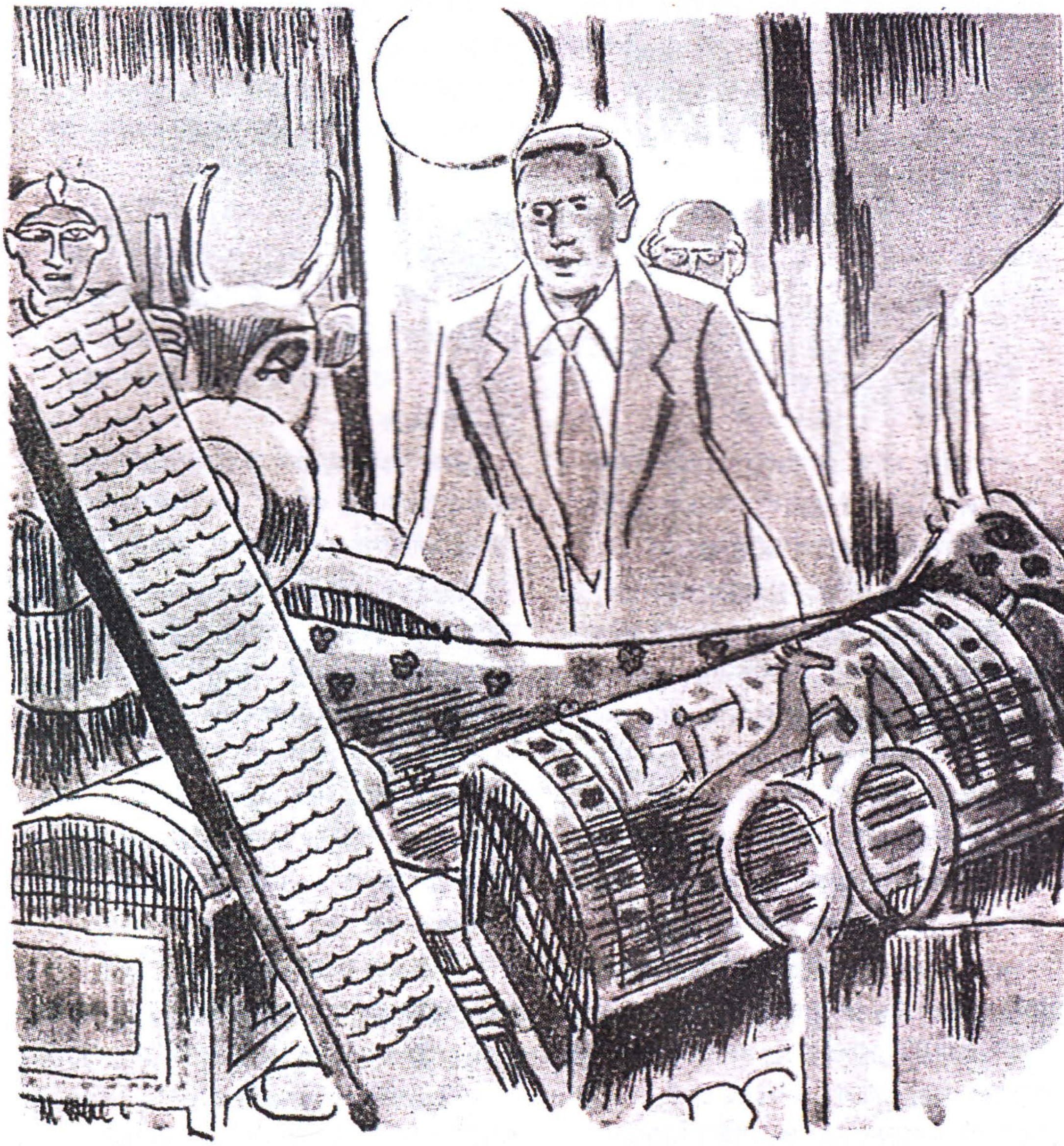
উইলহেল্‌ম ক্রোল

প্রাচীন মিশরের কোনও রাজা বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী মারা গেলে মাটির নীচে ঘর তৈরি করে কফিনে তাদের মমি রেখে তার সঙ্গে আরও বেশ কিছু জিনিসপত্র পুরে দেওয়া হত, এটা সকলেই জানে। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুতেও মানুষের জীবন শেষ হয় না, কাজেই দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসের প্রয়োজনও ফুরায় না। তাই খাবার জিনিস, খেলার জিনিস, প্রসাধনের জিনিস, গয়নাগাটি, আসবাবপত্র, জামাকাপড় সবই সমাধিতে স্থান পেত। এরমধ্যে অনেক জিনিসই থাকত যা অত্যন্ত মূল্যবান; যেমন সোনার উপর পাথর বসানো অলংকার। সোনার তৈরি সিংহাসন পর্যন্ত মিশরের সমাধিতে পাওয়া গেছে। তুতানখামেনের মমির উপরে যে রাজার প্রতিকৃতি সমেত আচ্ছাদন ছিল তার পুরোটাই নিরেট সোনার তৈরি। পৃথিবীতে একসঙ্গে এত সোনা আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

এই সব মূল্যবান জিনিস থাকার দরুন সেই প্রাচীনকাল থেকেই ডাকাতরা সমাধি লুণ্ঠনের

কাজ শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানকালে খুব কম সমাধিতেই মূল্যবান কিছু পাওয়া গেছে। এর ব্যতিক্রম হল তুতানখামেনের সমাধি। আশ্চর্যভাবে এই তরুণ সম্রাটের সমাধির উপর ডাকাতের হাত পড়েনি। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হাওয়ার্ড কার্টার যখন এই সমাধি আবিষ্কার করেন, তখন সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই কারণে যে, এই প্রথম একটি সমাধি পাওয়া গেল যার একটি জিনিসও খোয়া যায়নি।

ক্রোল যে সমাধিটার কথা লিখেছে সেটা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কাগজে পড়েছি। এটা হল আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের এক পুরোহিত ও জাদুকর নেফ্রুদেৎ-এর সমাধি। ইংলন্ডের লর্ড ক্যাভেনডিশ মিশরসরকারের অনুমতি নিয়ে এই সমাধি খননের যাবতীয় খরচ বহন করছেন। ভিন দেশের লোক খননের কাজ চালালেও, খুঁড়ে যা পাওয়া যাবে তার একটা ভাগ মিশরসরকারকে দিতে হবে এই হল নিয়ম। এইভাবেই কায়রোর আশ্চর্য মিউজিয়ম গড়ে উঠেছে। খোঁড়ার কাজ চালাচ্ছেন তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক জোসেফ ব্যানিস্টার। সবেমাত্র একটা ঘর খুঁড়ে বার করার খবর কাগজে বেরিয়েছিল এবং তাতেই মনে হয়েছিল যে, এই সমাধিতে ডাকাতরা কোনও উপদ্রব করেনি। এ খবর



তিনদিন আগে কাগজে পড়ি। এর মধ্যে কাজ নিশ্চয়ই আরও অগ্রসর হয়েছে, যদিও এ ধরনের কাজ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ! আমার দিক দিয়ে এ এক সুবর্ণ সুযোগ। প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে ক্রোলের যথেষ্ট খাতির আছে। সে যখন এই খোঁড়ার কাজে জড়িয়ে পড়েছে, তখন আমারও কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়।

এই লর্ড ক্যাভেনডিশ ভদ্রলোকটি যে মিশর সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী, তা নন। তাঁর নানারকম শখ। ইনি ইংলন্ডে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। বিভিন্ন সময়ে নানান ব্যাপারে ইনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তারমধ্যে ব্রেজিলে এবং নিউগিনিতে দুটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

জোসেফ ব্যানিস্টার সম্বন্ধে আমি শুধু এইটুকুই জানি যে তার বয়স পঁয়ত্রিশ এবং সে মিশর সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ।

আমি তিনদিনের মধ্যেই রওনা হচ্ছি। মিশর সম্বন্ধে আমার চিরকালের কৌতূহল। এই বৃদ্ধ বয়সে ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত বোধ করছি।

ডিসেম্বর ১২, কায়রো

এখন রাত সাড়ে এগারোটা। আমি কার্নাক হোটেলে ৩৫২ নম্বর ঘরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকাল সকালে আমি কায়রো পৌঁছেছি। ক্রোল গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে ফেরার পথেই এই তিনদিনের খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সমাধিতে যে চোরের হাত পড়েনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আসলে সমাধির প্রবেশপথটা কয়েকটা বড় পাথরের নীচে চাপা পড়েছিল। জোসেফ ব্যানিস্টার নেফ্রুদেৎ-এর কথা জানত এবং বিশ্বাস করত তার একটা সমাধি নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। সে অনেক খোঁজার পর প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মুখে একটা শেষ চেষ্টা দেবার জন্য ওই পাথরগুলো সরাতে বলে। পাথর সরাতেই বোঝা যায় সেখানে একটা কিছু রয়েছে। একটু খোঁড়াখুঁড়ি করেই দেখা যায় যে সেটা একটা প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বার মানেই যে সমাধির প্রবেশদ্বার, এ বিষয়ে ব্যানিস্টারের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না, কারণ প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের উপরে প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে নেফ্রুদেৎ-এর নাম লেখা ছিল।

ব্যানিস্টার এটা দেখামাত্র ইংলন্ডে লর্ড ক্যাভেনডিশকে টেলিফোন করে। ক্যাভেনডিশ তাকে খননের কাজ চালিয়ে যেতে বলেন, এবং আশ্বাস দেন যে টাকার কোনও অভাব হবে না।

কাল দুপুরে ক্রোলের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম খোঁড়ার জায়গায়। ব্যানিস্টারের সঙ্গে আলাপ হল। বেশ চালাকচতুর, এবং খুব উৎসাহী। সে এখন চরম উত্তেজনা বোধ করছে। তার বিশ্বাস সে তুতানখামেনের মতোই এক সমাধি আবিষ্কার করতে চলেছে, যদিও তুতানখামেন ছিল সম্রাট আর নেফ্রুদেৎ পুরোহিত ও জাদুকর।

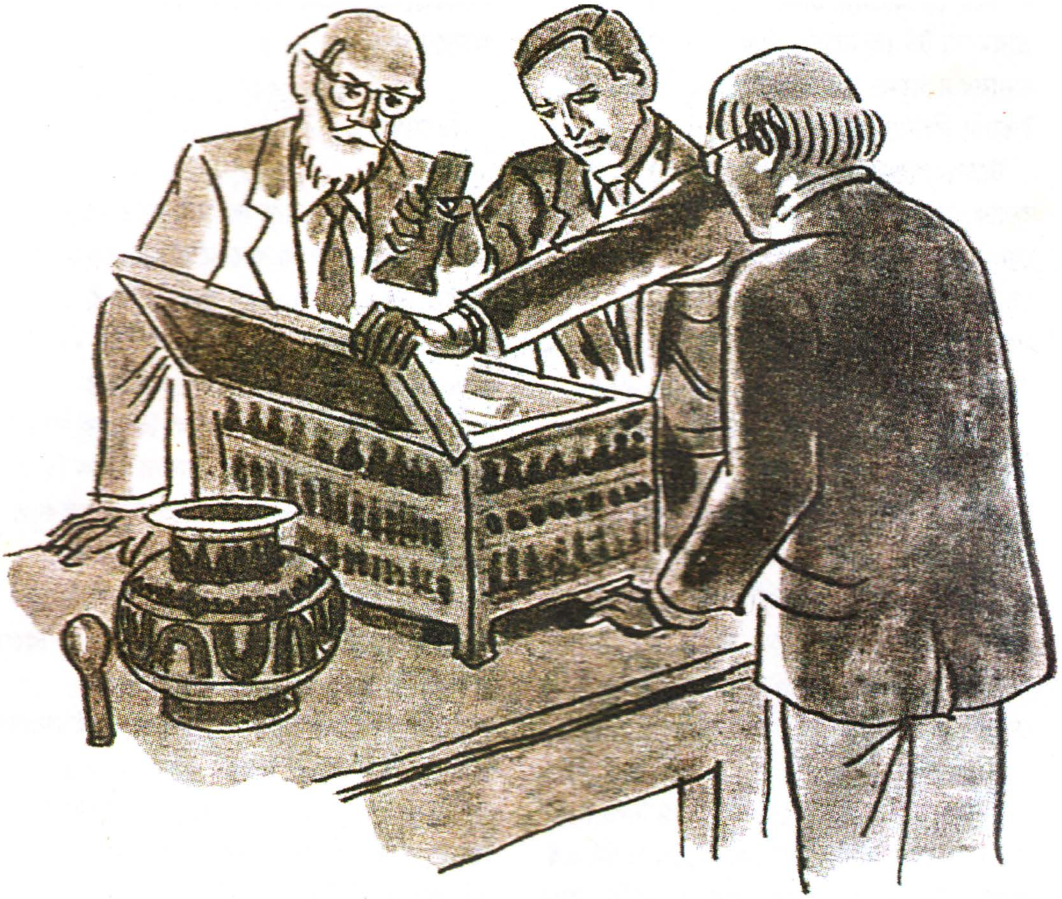
প্রথম যে ঘরটা খোলা হয়েছে তাতে বিস্তর জিনিস পাওয়া গেছে, তারমধ্যে আসবাব আর দেবদেবীর মূর্তিই বেশি। কারুকার্য অতি উঁচু দরের। এরমধ্যেই নানান দেশ থেকে সাংবাদিকরা আসতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের অবশ্য সমাধিকক্ষের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, এবং হবেও না। তারা যা খবর নেবার বাইরে থেকেই নিচ্ছে।

ক্রোল একটা কাজের কাজ করেছে। তার সঙ্গে ব্যানিস্টারের পরিচয় বেশ কিছুদিন থেকেই। সে ব্যানিস্টারকে বলে অনুমতি জোগাড় করে নিয়েছে যাতে খোঁড়ার সময় আমি আর ক্রোল দুজনেই কক্ষের মধ্যে থাকতে পারি। প্রথম কক্ষের জিনিসপত্রে নম্বর লাগিয়ে, তাদের ছবি তুলে অতি সন্তর্পণে তাদের পাঠানো হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে পরিষ্কার করার জন্য।

প্রথম কক্ষের পিছন দিকে একটা সিলমোহর দিয়ে বন্ধ করা দরজা রয়েছে। সেটা যে আরেকটা ঘর তাতে সন্দেহ নেই। তাতে আবার কী আশ্চর্য সম্ভার লুকিয়ে আছে কে জানে!

ডিসেম্বর ১৫

আজ দ্বিতীয় ঘরটা খোলা হল। ব্যানিস্টার প্রথমে একা কিছুক্ষণ টর্চ নিয়ে ঘরটা ঘুরে



দেখল। আমরা দুজন বাইরে অপেক্ষা করলাম। কদিনের মধ্যেই এইসব ঘরে ইলেকট্রিক কানেকশন বসে যাবে, তখন আর সবসময় টর্চের দরকার হবে না। একটু পরেই আমাদের ডাক পড়ল। ব্যানিস্টার উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এ ঘরেও প্রচুর জিনিস। কাস্কেটের সংখ্যাই এগারোটা—তারমধ্যে ছোট বড় সব রকমই আছে। আর কাস্কেট মানেই সেগুলো জিনিসে ভরা।'

তুতানখামেনের সমাধির কাস্কেট বা বাক্স দেখেছি। কাঠ, হাতির দাঁত আর অ্যালাব্যাস্টারের তৈরি। বাক্সগুলোর বাইরে সর্বাঙ্গে অপূর্ব কারুকার্য। এগুলোও দেখলাম সেরকমই ব্যাপার। কিন্তু এ ছাড়াও কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে যেগুলো তুতানখামেনের সমাধিতে দেখা যায়নি। সেগুলো বেশির ভাগই কাঠ বা হাড়ের তৈরি। ক্রোল বলল, 'আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা কোনও সম্রাটের সমাধি দেখছি না। নেফ্রুদেৎ ছিলেন পুরোহিত ও জাদুকর। জাদুসংক্রান্ত অনেক কিছু জিনিসই এখানে পাবার কথা।'

আমাদের দৃষ্টি গিয়েছিল একটা বড় বাক্সের দিকে, অ্যালাব্যাস্টারের তৈরি। ব্যানিস্টার বলল, 'এবার এটাকে খুলব, কিন্তু কাজটা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ, বাক্সটার চারপাশে হাতে আঁকা ছবি রয়েছে। তাড়াহুড়ো করলে সেগুলোর রং খসে আসতে পারে।'

এইবার ব্যানিস্টারের ধৈর্যের নমুনা দেখলাম।

ছেলেটিকে যত দেখছি ততই ভাল লাগছে। আধ ঘণ্টা ধরে পরিশ্রম করে একটিও নকশা স্থানচ্যুত না করে সে বাক্সের ডালাটা খুলল। তারপর তারমধ্যে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল সেটা নানারকম গয়না, ভাঁজ করা কাপড়, ছোট মূর্তি ইত্যাদি জিনিসে ভর্তি।

টর্চের আলোয় একটা ব্যাপার দেখে একটু অবাক হলাম। বাক্সের ভিতরে কী একটা জিনিস যেন অস্বাভাবিক রকম ঝলমল করছে। সেটা সোনা নয়; সেটা যে একটা পাথর তাতে কোনও সন্দেহ নেই, এবং সেটা একটা গয়নার মধ্যে বসানো।

আমি ব্যানিস্টারকে প্রশ্ন করলাম, 'ঝলমলে জিনিসটা কী বুঝতে পারছ?'

ব্যানিস্টার বলল, 'মিশরে প্রাচীনকালে গয়নায় সোনার সঙ্গে যে সব পাথর ব্যবহার হত সেগুলো সেমি প্রেশাস স্টোনস। অর্থাৎ সেগুলো মহামূল্য রত্ন নয়। কারনেলিয়ান, অ্যামেথিস্ট, অবসিডিয়ান—এইসব জাতীয় পাথর। তার থেকে তো এত দ্যুতি বেরোয় না।'

'তা হলে?'

'একটু ধৈর্য ধরতে হবে,' বলল ব্যানিস্টার। 'তোমরা বরং বাইরে অপেক্ষা করো। আমি এই বাক্সের জিনিসগুলো একে একে বার করি। আর, ভাল কথা, এই পাথর সম্বন্ধে যেন বাইরের কেউ না জানে। বিশেষ করে সাংবাদিকরা।'

আমরা দুজন বাইরে চলে এলাম। লাঞ্চের সময় হয়েছিল, কাজেই সে কাজটাও সেরে নেওয়া হল। সাংবাদিকরা আমাদের কাছ থেকে খবর বার করার বহু চেষ্টা করেছিল, আমরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। ব্যানিস্টার না বলা পর্যন্ত আমরা কোনও কথা ফাঁস করছি না।

আজ মনে হয় আর কোনও ঘটনা ঘটবে না, কারণ কাস্কেটের জিনিস বার করতে ব্যানিস্টারের সময় লাগবে। এই সাবধানতার ব্যাপারটা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। শুকনো বালির দেশ বলেই এসব জিনিস এখনও রয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও হলে এতদিনে সব ধুলো হয়ে যেত।

মিশরসরকার থেকে ডাঃ আবদুল সিদ্দিকি বলে এক প্রত্নতাত্ত্বিকও আজ থেকে ব্যানিস্টারকে সাহায্য করছেন। লর্ড ক্যাভেনডিশ এখনও ইংলন্ডে; তবে উনি বলেছেন খবর দিলেই চলে আসবেন।

ডিসেম্বর ১৬

এর চেয়ে আশ্চর্য খবর আর হতে পারে না। কাল যে জিনিসটাকে কাস্কেটের মধ্যে চকচক করতে দেখেছিলাম, সেটা হল হিরে। হ্যাঁ, হিরে—যার সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক ছিল না কোনওদিন। ঈজিপ্টে হিরে পাওয়া আর আফ্রিকার জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া একই জিনিস। ইতিহাসের গোড়ার দিকে হিরে ছিল ভারতবর্ষের একচেটিয়া সম্পত্তি। বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে হিরের খনিতে কাজ হয়ে আসছে। পশ্চিমে তখন যে হিরে গেছে, সবই ভারতবর্ষ থেকে। বহু পরে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে হিরে আবিষ্কার হয় দক্ষিণ আমেরিকায় আর দক্ষিণ আফ্রিকাতে। আজকাল ভারতবর্ষে হিরের উৎপাদন কমে গেলেও কোহিনূর থেকে আরম্ভ করে যে সব বিখ্যাত হিরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশেরই উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ।

কিন্তু ঈজিপ্টে হিরে! এ যে তাক লাগানো ব্যাপার! কাস্কেটের গয়নার মধ্যে যে হিরে পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই মটরদানার সাইজের, দু একটা একটু বড়। সেগুলো সবই প্রায় সোনার মধ্যে বসানো। ল্যাবরেটরিতে এই হিরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে কোনও খুঁত নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হিরের সঙ্গে এর তুলনা চলে। কাঠিন্যে আর ঔজ্জ্বল্যে এ হিরে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে।

বলা বাহুল্য খবরটা দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিশরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে এমন তাজ্জব ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। কোত্থেকে এ হিরে এল, কী করে এল, সেটা কেউই অনুমান করতে পারছে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাও উঠেছে, কিন্তু সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে সোনা

ছিল, এমন কোনও নজির ইতিহাসে নেই।

লর্ড ক্যাভেনডিশ খবর পাওয়ামাত্র কায়রোতে চলে এসেছেন। আজ আমাদের সঙ্গে আলাপ হল। বছর পঞ্চাশ বয়সের সুপুরুষ ভদ্রলোক, এখন মহা ফুর্তিতে আছেন। এসেই আজ রাত্রেই একটা বড় পার্টি দিলেন কার্নাক হোটেলে এই যুগান্তকারী ঘটনা সেলিব্রেট করার জন্য। মিশরে এখন টুরিস্ট সিজন, তাই লোক হয়েছিল অনেক।

এখন পর্যন্ত হিরে সমেত সাতটা গলার হার আর তিন জোড়া কানের গয়না পাওয়া গেছে। আরও অনেক কিছু পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। এখনও আসল সমাধিকক্ষ—যাতে নেফ্রুদেৎ-এর মমি থাকার কথা—সেটাই খোলা হয়নি। আমি পার্টিতে ব্যানিস্টারের সঙ্গে এই ঘটনা নিয়ে কথা বললাম। সে একেবারে হতভম্ব। এই হিরে আবিষ্কারের ফলে মিশর সম্পর্কে এমন একটা নতুন দিক খুলে গেছে, যেটা সম্পর্কে আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। অথচ ব্যাপারটা রহস্যময়। ব্যানিস্টার বলল, 'ঈজিপ্টের সঙ্গে কার্বনের কোনও সম্পর্ক ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। কয়লা এদেশে কোনওদিন ছিল না। অথচ হিরের মূলে হল কার্বন। আমি এর কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছি না।'

আগামী কাল একটা নতুন ঘর খোলা হবে। আশা করছি এটাই হবে প্রধান সমাধিকক্ষ—এবং নেফ্রুদেৎ-এর কফিনও এখানেই পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে হিরের খবরটা অবিশ্যি পৃথিবীর সব কাগজেরই প্রথম পাতায় বেরিয়ে গেছে। খোঁড়ার জায়গায় ভিজিটরের সংখ্যাও ভয়াবহ রকম বেড়ে গেছে। তবে হিরে পাওয়ার পর থেকেই মিশরসরকার খোঁড়ার জায়গায় পুলিশের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন কেবল লর্ড ক্যাভেনডিশ, তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর আমাদের দুজনকে ছাড়া বাইরের লোক আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

ডিসেম্বর ১৭

আজ সকালে একটা ঘটনার কথা শুনলাম যার সঙ্গে এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও, এটাও হিরে সংক্রান্ত।

তিন মাস আগে হোটেল কার্নাকে লর্ড ও লেডি এইন্‌সওয়র্থ নামে ইংলন্ডের বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক দম্পতি এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য। লেডি এইন্‌সওয়র্থের একটি বহুমূল্য হিরের হার ছিল, যার প্রধান হিরেটি একটি আঙুরের মতো বড়। এই হোটেল থেকেই সেই হারটি চুরি যায়, এবং সেইসঙ্গে লর্ড এইন্‌সওয়র্থের ভৃত্য ফ্রানসিসকেও আর পাওয়া যায় না।

পুলিশ অনুমান করে এটা বিখ্যাত গ্রিক হিরে চোর ডিমিট্রি ম্যাক্রোপুলসের কীর্তি। তাকে নাকি এই ঘটনার তিনদিন আগে কায়রোতে দেখা গিয়েছিল। ম্যাক্রোপুলস দুবার জেল খেটেছে। কিন্তু তাতেও তার সংস্কার হয়নি। ম্যাক্রোপুলস এইন্‌সওয়র্থের চাকর ফ্রানসিসকে মোটা ঘুষ দিয়ে হিরের হারটি আদায় করে। তার ফলে ফ্রানসিসকেও পালাতে হয়। এখন হিরেই হচ্ছে একমাত্র আলোচ্য বস্তু। তাই আমাদের হোটেলে এক ফরাসি ভদ্রলোক আমাদের এই কাহিনীটা শোনালেন। মনে মনে বললাম, ভাগ্যিস নেফ্রুদেৎ-এর সমাধিতে ডাকাত পড়েনি, তা হলে তারা দাঁও মারত ভালই।

আজ দুপুরে দুটোর সময় তৃতীয় ঘরের দরজার সিল ভাঙা হল। যা অনুমান করা হয়েছিল, তাই। এটাই হল প্রধান কক্ষ, আর এখানেই রয়েছে নেফ্রুদেৎ-এর শবাধার।

শবাধারটি বিশাল। তার চার পাশে নানরকম ছোটখাটো কাঠের আসবাব ইত্যাদি জমে ছিল; প্রথমে সেগুলোকে ঘর থেকে বার করা হল। এতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নেই।

স্থির হল কাল সকালে নেফ্রুদেৎ-এর শবাধার খোলা হবে। সচরাচর এই কফিনগুলোতে প্রথমে থাকে একটা বাইরের কাঠের আবরণ। সেটাকে খুললে পরে বেরোয় কারুকার্য করা মমির আবরণ, যেটার উপরের দিকে থাকে মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতি। তার নীচে থাকে বুকের উপর জড়ো করা হাত, আর তার নীচে শরীরের নীচের অংশ আর পা। এই মূর্তির সর্বাঙ্গে থাকে কারুকার্য এবং

এতে সোনার অংশ থাকার সম্ভাবনাও বেশি।

কাল দুপুরের মধ্যে নেফ্রুদেৎ-এর কফিন খোলা হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা।

ডিসেম্বর ১৮

আজ আরেক চমক।

নেফ্রুদেৎ-এর মমির আবরণে তার প্রতিকৃতির গলায় একটি হার পাওয়া গেছে যাতে একটি অসামান্য দ্যুতিসম্পন্ন হিরে রয়েছে। ব্যানিস্টার আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই ঢুকেছিল এই কক্ষে। তারপর সে ডাকায় প্রথম গেলেন লর্ড ক্যাভেনডিশ ও তাঁর দুই বন্ধু, তারপর আমরা দুজন। ক্যাভেনডিশ একটি মন্তব্য করলেন যেটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। তিনি কিছুক্ষণ কফিনের গলার হিরেটার দিকে চেয়ে বললেন, 'আই মাস্ট সে ইট লুক্স্ এগজ্যাক্টলি লাইক লেডি এইন্সওয়র্থস ডায়ামন্ড।'

এটা বলার অবিশ্যি একটা কারণ আছে। মিশরীয়রা সেই যুগেই হিরেতে পল কাটতে শিখেছিল—যেটা ভারতবর্ষ কোনওদিনও রপ্ত করতে পারেনি। এই হিরেটাও তাই দেখে আজকালকার হিরে বলেই মনে হয়। ক্রোল আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ম্যাজিক, ম্যাজিক—এ সবই ম্যাজিক।' ম্যাজিক, ভোজবাজি ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ক্রোলের মতো ইউরোপে আর দ্বিতীয় কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। এই হিরে তৈরির ব্যাপারে জাদুর যে একটা ভূমিকা আছে, সে বিষয় ক্রোল নিঃসন্দেহ। শুধু রাসায়নিক ব্যাপারে এটা সম্ভব হয়েছে সেটা ক্রোল মানতে চায় না।

মোটকথা এই সাড়ে তিন হাজার বছর আগের হিরে আমাকে যে চমক দিয়েছে, তেমন আর কিছু দিয়েছে বলে মনে পড়ে না।

ডিসেম্বর ১৯

আজ তুমুল কাণ্ড। একরম যে হবে তা ভাবতে পারিনি।

নেফ্রুদেৎ-এর কণ্ঠহারের হিরে দেখে কায়রো পুলিশ বলেছে সেটা নাকি লেডি এইন্সওয়র্থের নেকলেসের হিরে। এই হিরের একটা ছবি তুলে তৎক্ষণাৎ নাকি লেডি এইন্সওয়র্থের কাছে পাঠানো হয়েছিল, এবং তিনিও সেটাকে তাঁর নিজের হিরে বলে চিনতে পেরেছেন। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরে হিরে তৈরির ব্যাপারটা নাকি সম্পূর্ণ ধাপ্পা।

সমস্ত ব্যাপারটা কী করে সম্ভব হয় সেটারও একটা বিবৃতি পুলিশ দিয়েছে। যেদিন লেডি এইন্সওয়র্থের গলার হার চুরি হয় সেদিন নাকি ম্যাক্রোপুলস কায়রোতে ছিলই না। সে ছিল অ্যাথেনসে। এ ব্যাপারে তার অকাট্য অ্যালিবাই রয়েছে। অর্থাৎ এই বিশেষ হিরে চুরির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই। পুলিশ তাই একটা নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। চুরির সময় ব্যানিস্টার কায়রোতে ছিল আর কার্নাক হোটেলেই ছিল। সে-ই এইন্সওয়র্থের চাকরকে ঘুষ দিয়ে নেকলেসটা চুরি করে তাই দিয়ে ঈজিপ্সিয়ান ধাঁচের গয়না বানিয়ে নেফ্রুদেৎ-এর সমাধিতে পুরেছে। উদ্দেশ্য হল একটা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করা। হাওয়ার্ড কার্টার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তুতানখামেনের সমাধি খুঁড়ে বার করে। ব্যানিস্টার চেয়েছিল কার্টারকেও টেক্কা দিতে।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার হয়েছে। আমেরিকার ডি বিয়ারস কোম্পানি সারা বিশ্বের হিরে বেচাকেনা কনট্রোল করে! সেই কোম্পানি থেকে লোক এসেছে ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য। কৃত্রিম উপায়ে সহজে হিরে তৈরি করতে পারলে হিরের ব্যবসা লাটে উঠত। অবিশ্যি তারা যখন শুনল নেফ্রুদেৎ-এর হিরে আসলে লেডি এইন্সওয়র্থের হিরে, তখন তারা আশ্বস্ত হল।

ব্যানিস্টারকে পুলিশ প্রচণ্ডভাবে জেরা করছে। কায়রো পুলিশ নাকি এ ব্যাপারে একেবারে নির্মম। লর্ড ক্যাভেনডিশ একদম ভেঙে পড়েছেন। তাঁর মন বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে দোলায়িত হচ্ছে। তিনি আমাকে বললেন যে, ব্যানিস্টার নাকি ভীষণ উচ্চাভিলাষী ছিল, যদিও



কাজের দিক দিয়ে তার ওপর কোনও সন্দেহ করা চলতে পারে না। আমি আর ক্রোল দুজনেই বিশ্বাস করি যে ব্যানিস্টার নির্দোষ, কিন্তু সেটা আমরা প্রমাণ করছি কী করে? সে যদি সত্যিই লেডি এইন্‌সওয়র্থের হিরে চুরি করে থাকে এবং তাই দিয়ে ঈজিপ্‌সিয়ান ধাঁচের গয়না তৈরি করে থাকে, তা হলে সেগুলো কাস্কেট ইত্যাদির মধ্যে রাখবার সুযোগ তার ছিল, কারণ রোজই সে প্রথমে একাই সমাধিকক্ষে প্রবেশ করেছে। তারপর আমরা দুজন গেছি। পরিস্থিতি খুব অস্বস্তিকর। এ অবস্থায় কী করা উচিত তা ভেবে স্থির করা খুব মুশকিল।

এদিকে খোঁড়ার কাজ তো বন্ধ রাখা যায় না, তাই সে কাজটা এখন চলছে ডাঃ সিদ্দিকির তত্ত্বাবধানে। লর্ড ক্যাভেনডিশও এ ব্যাপারে রাজি হয়ে গেছেন। সিদ্দিকির সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, কাজেই আমাদের পথ খোলাই আছে। এখন কথা হচ্ছে—আরও হিরে যদি বেরোয়, তা হলে সেটা কার বলে প্রতিপন্ন হবে? তখন কি ব্যানিস্টারকে একটি পাকা হিরে চোর হিসেবে দাঁড় করানো হবে?

কিন্তু আমার মন বলছে আর হিরে বেরোবে না! সেখানেই মুশকিল। এ কদিনে গয়না যা বেরিয়েছে তার পরিমাণ কিছু কম নয়। এদিকে আর হিরে না বেরোলে ব্যানিস্টারকে বাঁচানো আমাদের পক্ষে সত্যিই মুশকিল হবে।

ডিসেম্বর ২০

আজ আর ডায়রি লিখতেও মন চাইছে না।

পুলিশের নির্মম জেরায় ব্যানিস্টার তার অপরাধ মেনে নিয়েছে। এবারে তার যা শাস্তি হবার তা হবে। আমার আর এখানে এক দিনও থাকতে ইচ্ছে করছে না। ক্রোলেরও প্রায় একই অবস্থা, তবে আজ একটা চতুর্থ ঘর—এটা ছোট—খোলা হয়েছে, তাতে ম্যাজিক সংক্রান্ত অনেক রকম জিনিস রয়েছে। ক্রোল বলছে, সে ঘরটা একবার দেখেই চলে যাবে। আমিও তার

প্রস্তাবে রাজি হয়েছি।

ডিসেম্বর ২২

আমাদের এই ঘটনার পরিসমাপ্তি যে এইভাবে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আগেই বলেছি যে চতুর্থ ঘরে ম্যাজিক সংক্রান্ত জিনিসই ছিল বেশি, তার মধ্যে প্রধান হল মড়ার মাথার খুলি আর জন্তুজানোয়ারের হাড়। সে সমস্ত বাইরে পাঠিয়ে দেবার পর ঘর যখন অপেক্ষাকৃত খালি হয়ে এল, তখন আমাদের তিন জনেরই চোখে পড়ল একটা মাঝারি সাইজের অ্যালাব্যাস্টারের কাস্কেট।

যথারীতি সন্তর্পণে কাস্কেটটা খুলে সিদ্দিকি বললেন, 'এতে একটা প্যাপাইরাসের স্ক্রোল দেখছি।'

প্যাপাইরাস গাছের পাতা শুকিয়ে প্রাচীন মিশরীয়রা সেটাকে কাগজের মতো করে ব্যবহার করত। প্যাপাইরাস থেকেই ইংরিজিতে পেপার কথাটা এসেছে। এই প্যাপাইরাস পর পর জুড়ে তা দিয়ে একটা লম্বা কাগজের মতো তৈরি করে তাতে কলম দিয়ে লিখে সেটাকে পাকিয়ে রাখা হত। সেইরকম পাকানো কাগজকেই বলে স্ক্রোল। এই স্ক্রোল অতি সাবধানে খুলে টেবিলের উপর পেতে তার উপর একটা কাচের শিট চাপা দিয়ে প্যাপাইরাসের লেখা পড়া হত। বলা বাহুল্য এই লেখা হল সেই প্রাচীন মিশরীয় লিপি হিয়েরোগ্লিফিক্স। এই ভাষা সিদ্দিকি, ক্রোল এবং আমি তিনজনেই পড়তে পারি।

তিন ঘণ্টা লাগল এই প্যাপাইরাসকে সমান করে বিছোতে।

তারপর তিনজনে মিলে ধীরে ধীরে তার লেখা পড়লাম।

পড়তে পড়তে উত্তেজনায় আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শেষ যখন হল, তখন আমাদের সকলেরই কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর হৃৎস্পন্দন বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ।

প্যাপাইরাসের নীচে নাম রয়েছে নেফ্রুদেৎ-এর। অর্থাৎ তিনিই এটার লেখক।

লেখার বিষয় হল হিরে প্রস্তুত করার উপায়।

ছত্রিশ রকম উপাদান লাগে হিরে তৈরি করতে, এবং তার সব কটিই এই আধুনিক কায়রো শহরেই পাওয়া যায়।

আমরা তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

সিদ্দিকি বললেন, 'তার মানে ব্যানিস্টার নির্দোষ?'

আমি বললাম, 'সেকথা এখনও বলা চলে না; কারণ এটাও তো জাল হতে পারে।'

'তা হলে?'

'তা হলে একটাই রাস্তা আছে।'

'কী?'

'এইসব উপাদান সংগ্রহ করে নির্দেশ অনুযায়ী আপনাদের গবেষণাগারে হিরে তৈরি করা।'

'আপনি ঠিক বলেছেন।'

গবেষণাগারে উনিশ ঘণ্টা কাজ করে যে হিরেটি তৈরি হল, তার আয়তন প্রথম অবস্থায় কোহিনূরের সমান। পল কাটার সময় হল না যদিও, কিন্তু সব রকম পরীক্ষাতেই এ হিরে সসম্মানে উত্তীর্ণ হল। পুলিশ দেখল সে হিরে, লর্ড ক্যাভেনডিশ দেখলেন, এবং সব শেষে দেখল ব্যানিস্টার। তার আনন্দাশ্রু দেখে আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল।

ব্যানিস্টার মুক্তি পেল, পুলিশ আবার লর্ড এইন্‌সওয়র্থের চাকর ফ্রানসিসের খোঁজ করতে শুরু করল।

এই সবের পর আমি আনুষ্ঠানিকভাবে নেফ্রুদেৎ-এর প্যাপাইরাসটা নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নীলনদের জলে ফেলে দিলাম।

এই ফরমুলা আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ এটা জানি শুধু আমরা তিনজন, এবং আমরা তিনজনেই জানি যে হিরের দুষ্প্রাপ্যতাই তার মূল্যের ও তার অসামান্য কদরের কারণ। কোনও কোনও ব্যাপারে এই দুষ্প্রাপ্যতা বজায় রাখা ভাল এবং দরকার। হিরে যে তার মধ্যে একটি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই!

পুনর্মুদ্রিত

ছবি: সত্যজিৎ রায়

সম্পূর্ণ ফেলুদা-কাহিনি

শেয়াল-দেবতা রহস্য

সত্যজিৎ রায়

'টেলিফোনটা কে ধরেছিল ফেলুদা?' প্রশ্নটা করেই বুঝতে পারলাম যে বোকামি করেছি, কারণ যোগব্যায়াম করার সময় ফেলুদা কথা বলে না। এক্সারসাইজ ছেড়ে ফেলুদা এ-জিনিসটা সবে মাস ছয়েক হল ধরেছে। সকালে আধঘণ্টা ধরে নানারকম 'আসন' করে সে। এমনকী, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে শূন্যে তুলে শীর্ষাসন পর্যন্ত। এটা স্বীকার করতেই হবে যে একমাসে ফেলুদার শরীর আরো 'ফিট' হয়েছে বলে মনে হয়; কাজেই বলতে হয় যে যোগাসনে রীতিমত উপকার হচ্ছে।

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেই পিছন দিকে টেবিলের উপর রাখা ঘড়ির টাইমটা দেখে নিলাম। ঠিক সাড়ে সাত মিনিট পরে আসন শেষ করে ফেলুদা জবাব দিল—

'তুই চিনবি না।'

এতক্ষণ পরে এরকম একটা উত্তর পেয়ে ভারি রাগ হল। চিনি না তো অনেককেই, কিন্তু নামটা বলতে দোষ কী? আর না চিনলেও, চিনিয়ে দেওয়া যায় না কি? একটু গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি চেনো?'

ফেলুদা জলে-ভেজানো ছোলা খেতে খেতে বলল, 'আগে চিনতাম না। এখন চিনি।'

কয়েকদিন হল আমার পুজোর ছুটি হয়ে গেছে। বাবা তিনদিন হল জামশেদপুরে গেছেন কাজে। বাড়িতে এখন আমি, ফেলুদা আর মা। এবার আমরা পুজোয় বাইরে যাব না। তাতে আমার বিশেষ আফসোস নেই, কারণ পুজোয় কলকাতাটা ভালই লাগে, বিশেষ করে যদি ফেলুদা সঙ্গে থাকে। ওর আজকাল শখের গোয়েন্দা হিসাবে বেশ নামটাম হয়েছে, কাজেই মাঝে মাঝে যে রহস্য সমাধানের জন্য ওর ডাক পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী? এর আগে প্রত্যেকটা রহস্যের ব্যাপারেই আমি ফেলুদার সঙ্গে ছিলাম। ভয় হয় ওর নাম বেশি হওয়াতে হঠাৎ যদি ও একদিন বলে বসে, 'নাঃ, তোকে আর এবার সঙ্গে নেব না?' কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা ঘটেনি। আমার বিশ্বাস ওর আমাকে সঙ্গে রাখার একটা কারণ আছে। হয়তো সঙ্গে একটা অল্পবয়স্ক ছেলেকে দেখে অনেকেই ওকে গোয়েন্দা বলে ভাবতে পারে না। সেটা তো একটা মস্ত সুবিধে। গোয়েন্দারা যতই আত্মগোপন করে থাকতে পারে ততই তাদের লাভ।

'ফোনটা কে করল জানতে খুব ইচ্ছে করছে বোধহয়?'

এটা ফেলুদার একটা কায়দা। ও যখনই বুঝতে পারে আমার কোনও একটা জিনিস জানবার খুব আগ্রহ, তখনই সেটা চট করে না-বলে আগে একটা সাসপেন্স তৈরি করে। সেটা আমি জানি বলেই বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললাম, 'ফোনটার সঙ্গে যদি কোনও রহস্যের ব্যাপার জড়িয়ে থাকে তা হলে জানতে ইচ্ছে করে বৈকি।'

ফেলুদা গেঞ্জির উপর তার সবুজ ডোরাকাটা শার্টটা চাপিয়ে নিয়ে বলল, 'লোকটার নাম নীলমণি সান্যাল। রোল্যান্ড রোডে থাকে। বিশেষ জরুরি দরকারে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।'

'কী দরকার বলেনি?'

'না। সেটা ফোনে বলতে চায় না। তবে গলা শুনে মনে হল ঘাবড়েছে।'

'কখন যেতে হবে?'

'ট্যাক্সিতে করে যেতে মিনিট দশেক লাগবে। ন'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সুতরাং আর দু'মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ট্যাক্সি করে নীলমণি সান্যালের বাড়ি যেতে যেতে ফেলুদাকে বললাম, 'অনেক রকম তো দুষ্টু লোক থাকে; ধরো নীলমণিবাবুর যদি কোনওরকম বিপদ না হয়ে থাকে—তিনি যদি শুধু তোমাকে প্যাঁচে ফেলার জন্যই ডেকে থাকেন।'

ফেলুদা রাস্তার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, 'সে রিস্ক তো থাকেই। তবে সেরকম লোক বাড়িতে ডেকে নিয়ে প্যাঁচে ফেলবে না, কারণ সেটা তাদের পক্ষেও রিস্কি হয়ে যাবে। সে সব কাজের জন্য অল্প টাকায় ভাড়াটে গুণ্ডার কোনও অভাব নেই।'

একটা কথা বলা হয়নি—ফেলুদা গত বছর অল ইন্ডিয়া রাইফল কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। মাত্র তিনমাস বন্দুক শিখেই ওর হাতে যা টিপ হয়েছিল সে একেবারে থ মেরে যাবার মতো। ফেলুদার এখন বন্দুক রিভলভার দুই-ই আছে, তবে বইয়ের ডিটেকটিভের মতো ও সারাক্ষণ রিভলভার নিয়ে ঘোরে না। সত্যি বলতে কী, এখন পর্যন্ত ফেলুদাকে ও দুটোর একটাও ব্যবহার করতে হয়নি; তবে কোনওদিন যে হবে না সে কথা কী করে বলব?

ট্যাক্সি যখন ম্যাডক স্কোয়ারের কাছাকাছি এসেছে, তখন জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রলোক কী করেন সেটা জানো?'

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোক পান খান, বোধহয় কানে একটু কম শোনেন, "ইয়ে" শব্দটা একটু বেশি ব্যবহার করেন, আর অল্প সর্দিতে ভুগছেন—এ ছাড়া আর কিছুই জানি না।'

এর পরে আর আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

নীলমণি সান্যালের বাড়িতে পৌঁছতে ট্যাক্সিভাড়া উঠল একটাকা সত্তর পয়সা। একটা দু'টাকার নোট বার করে ট্যাক্সিওয়ালার হাতে দিয়ে ফেলুদা হাতের একটা কায়দার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে তার চেঞ্জ ফেরত চাই না। গাড়ি থেকে নেমে পোর্টিকোর তলা দিয়ে গিয়ে



সামনের দরজায় পৌঁছে কলিং বেল টেপা হল।

দোতলা বাড়ি, তবে খুব যে বড় তাও নয়, আর খুব পুরনোও নয়। সামনের দিকে একটা বাগানও আছে, তবে সেটা খুব বাহারের কিছু নয়।

একজন দারোয়ান গোছের লোক এসে ফেলুদার কাছ থেকে ভিজিটিং কার্ড নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় বসতে বলল। ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে বেশ তাক লেগে গেল। সোফা, টেবিল, ফুলদানি, ছবি, কাচের আলমারিতে সাজানো নানারকম সুন্দর পুরনো জিনিস-টিনিস মিলিয়ে বেশ একটা জমকালো ভাব। মনে হয় অনেক খরচ করে মাথা খাটিয়ে এসব জিনিস কিনে সাজানো হয়েছে।

ফেলুদা নিজেই উঠে পাখার রেগুলেটারটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। গায়ে স্লিপিং সুটের পায়জামার উপর একপাশে বোতামওয়ালা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, আর দু'হাতের আঙুলে অনেকগুলো আংটি। হাইট মাঝারি, দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় চুল বেশি নেই, রং মোটামুটি ফর্সা, আর চোখ দুটো ঢুলুঢুলু—দেখলে মনে হয় এই বুঝি ঘুম থেকে উঠে এলেন। বয়স কত হবে? পঞ্চাশের বেশি নয়।

'আপনারই নাম প্রদোষ মিত্তির?' জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি যে এত ইয়াং সেটা জানা ছিল না।'

ফেলুদা একটু হেঁ হেঁ করে আমার দিকে দেখিয়ে বলল, 'এটি আমার খুড়তুতো ভাই। খুব বুদ্ধিমান ছেলে। আপনি চাইলে আমাদের কথাবার্তার সময় আমি ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

আমার বুকটা ধুকপুক করে উঠল। কিন্তু ভদ্রলোক আমার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই বললেন, 'কেন, থাকুন না—কোনও ক্ষতি নেই।' তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'ইয়ে—আপনারা কিছু খাবেন-টাবেন? চা বা কফি?'

'নাঃ। এই সবে চা খেয়ে বেরিয়েছি।'

'বেশ, তা হলে আর সময় নষ্ট না করে কেন ডেকেছি সেইটে বলি। তবে তার আগে আমার নিজের পরিচয়টা একটু দিই। বুঝতেই পারছেন আমি একজন সৌখিন লোক। পয়সাকড়িও কিছু আছে সেটাও নিশ্চয়ই অনুমান করছেন। তবে বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি চাকরিও করি না, ব্যবসাও করি না, বা বাপের সম্পত্তিও এক পয়সাও পাইনি।'

নীলমণিবাবু রহস্য করার ভাব করে চুপ করলেন।

ফেলুদা বলল, 'তা হলে কি লটারি?'

'আজ্ঞে?'

'বলছিলাম—তা হলে কি কখনও লটারি-টটারি জিতেছিলেন?'

'এগজ্যাক্টলি!' ভদ্রলোক প্রায় ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এগারো বছর আগে রেঞ্জার্স লটারি জিতে এক ধাক্কায় পেয়ে যাই প্রায় আড়াই লাখ টাকা। তারপর সেই টাকা দিয়ে, খানিকটা বুদ্ধি আর খানিকটা ভাগ্যের জোরে, বেশ ভালভাবেই চালিয়ে এসেছি। বাড়িটা তৈরি করি বছর আষ্টেক আগে। আপনি হয়তো ভাবছেন, এরকম অকেজোভাবে একটা মানুষ বেঁচে থাকে কী করে; কিন্তু আসলে একটা কাজ আমার কাছে—একটাই কাজ—সেটা হল, অকশান থেকে এইসব জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজানো!'

ভদ্রলোক তাঁর ডান হাতটি বাড়িয়ে চারিদিকের সাজানো জিনিসপত্রগুলোর দিকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—

'যে ঘটনাটা ঘটেছে তার সঙ্গে আমার এইসব আর্টিস্টিক জিনিসপত্তরের কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো থাকতেও পারে। এই যে—'

নীলমণিবাবু তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটা কাগজের টুকরো বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাগজগুলো দেখে নিলাম। তিনটে কাগজ, তার প্রত্যেকটাতেই লেখার বদলে লাইন করে ছোট ছোট ছবি আঁকা। সেই ছবির মধ্যে কিছু কিছু বেশ বোঝা যায়—যেমন, প্যাঁচা, চোখ, সাপ, সূর্য—এইসব। আমার কেমন যেন

ব্যাপারটাকে দেখা দেখা বলে মনে হচ্ছিল, এমন সময় ফেলুদা বলল, 'এসব তো হিয়েরোগ্লিফিক লেখা বলে মনে হচ্ছে।'

ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে?'

ফেলুদা বলল, 'প্রাচীনকালে ঈজিপ্সিয়ানরা যে লেখা বার করেছিল, এটা সেই জিনিস বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই বুঝি?'

'হুঁ। তবে এ লেখা পড়তে পারে এমন লোক কলকাতায় আছে কি না সন্দেহ।'

ভদ্রলোক যেন একটু মুষড়ে পড়ে বললেন, 'তা হলে? যে জিনিস দু'দিন অন্তর অন্তর ডাকে আমার নামে আসছে, তার মানে না করতে পারলে তো ভারী অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে! ধরুন যদি এগুলো সাংকেতিক হুমকি হয়—কেউ হয়তো আমাকে খুন করতে চাইছে, আর তার আগে আমাকে শাসাচ্ছে।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনার যে-সমস্ত জিনিসপত্র সাজানো রয়েছে—তার মধ্যে ঈজিপ্সিয়ান কিছু আছে?'

নীলমণিবাবু হেসে বললেন, 'দেখুন, আমার কোন জিনিস কোথাকার, সেটা আমি নিজেই ঠিক ভালভাবে জানি না। আমি কিনি, কারণ আমার পয়সা আছে এবং আর পাঁচজন সৌখিন লোককে এসব জিনিস কিনতে দেখেছি, তাই।'

'কিন্তু আপনার এত জিনিসের মধ্যে একটিকেও তো খেলো বলে মনে হচ্ছে না। যারা শুধু এগুলো দেখবে, তারা তো আপনাকে রীতিমতো সমঝদার লোক বলে মনে করবে।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'ওটা কী জানেন? এসব ব্যাপারে সচরাচর জিনিস ভাল হলেই তার দাম বেশি হয়। টাকা যখন আছে, তখন আমি সেরা জিনিসটা কিনব না কেন! অনেক ভারী ভারী খদ্দেরের উপরে টেক্কা দিয়ে নীলাম থেকে এসব কিনেছি মশাই, কাজেই ভাল জিনিস আমার কাছে থাকাটা কিছু আশ্চর্য নয়।'

'কিন্তু মিশরের জিনিস কিছু আছে কিনা জানেন না?'

নীলমণিবাবু সোফা ছেড়ে উঠে একটা কাচের আলমারির দিকে গিয়ে তার উপরের তাক থেকে একটা বিঘতখানেক লম্বা মূর্তি নামিয়ে এনে সেটা ফেলুদার হাতে দিলেন। সবুজ পাথরের মূর্তি, তার গায়ে আবার নানা রঙের ঝলমলে পাথর বসানো। দু'-এক জায়গায় যেন সোনাও রয়েছে। তবে আশ্চর্য এই যে, মূর্তিটির শরীর মানুষের মতো হলেও, তার মুখটা শেয়ালের মতো। 'এটা দিন দশেক আগে কিনেছি অ্যারাটুন ব্রাদার্সের একটা নীলাম থেকে। এটা বোধহয়—'

ফেলুদা মূর্তিটায় একবার চোখ বুলিয়েই বলল, 'আনুবিস।'

'আনুবিস? সে আবার কী?'

ফেলুদা মূর্তিটা সাবধানে নেড়েচেড়ে নীলমণিবাবুর হাতে ফেরত দিয়ে বলল, 'আনুবিস ছিল প্রাচীন মিশরের গড অফ দ্য ডেড। মৃত আত্মাদের দেবতা।...চমৎকার জিনিস পেয়েছেন এটা।'

'কিন্তু—' ভদ্রলোকের গলায় ভয়ের সুর '—এই মূর্তি আর এইসব চিঠির মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে কি? আমি কি এটা কিনে ভুল করলাম? কেউ কি এটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে শাসাচ্ছে?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'সেটা বলা মুশকিল। চিঠিগুলো কবে থেকে পেতে শুরু করেছেন?'

'গত সোমবার থেকে।'

'অর্থাৎ মূর্তিটা কেনার ঠিক পর থেকেই?'

'হ্যাঁ।'

'খামগুলো আছে?'

'না, ফেলে দিয়েছি। রেখে দেওয়া হয়তো উচিত ছিল—তবে খুবই সাধারণ খাম, সাধারণ টাইপরাইটারে ঠিকানা লেখা। পোস্টঅফিস এলগিন রোড।'

'ঠিক আছে।' ফেলুদা উঠে পড়ল। 'আপাতত কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। শুধু সেফ সাইডে থাকার জন্য মূর্তিটা ওই আলমারিতে না রেখে আপনার হাতের কাছে রাখবেন। সম্প্রতি একজনদের বাড়ি থেকে এ ধরনের কিছু জিনিস চুরি হয়েছিল।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। একজন সিন্ধি ভদ্রলোক। যদ্দূর জানি এখনও সে চোর ধরা পড়েনি।'

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে ল্যান্ডিং-এ এলাম।

ফেলুদা বলল, 'আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে পারে এমন কারুর কথা মনে পড়ছে?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'কেউ না। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

'আর শত্রু?'

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'ধনীর তো শত্রু সব সময়ই থাকে, তবে তারা তো কেউ আর শত্রু বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না! সামনা-সামনি দেখা হলে সকলেই খাতির করে কথা বলে।'

'আপনি মূর্তিটা তো নীলামে কিনেছিলেন বললেন।'

'হ্যাঁ। অ্যারাটুন ব্রাদার্সের নীলামে।'

'ওটার ওপর আর কারও লোভ ছিল না?'

কথাটা শুনে ভদ্রলোক হঠাৎ যেন বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে হাত কচলাতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'আপনি কথাটা জিজ্ঞেস করে আমার ভাবনার একটা নতুন দিক খুলে দিলেন। আমার সঙ্গে একটি ভদ্রলোকের অনেকবার নীলামে ঠোকাঠুকি হয়েছে—সেদিনও হয়েছিল।'

'তিনি কে?'

'প্রতুল দত্ত।'

'কী করেন?'

'বোধহয় উকিল ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। সেদিন ওর আর আমার মধ্যে শেষ অবধি রেষারেষি চলে। তারপর আমি বারো হাজার বলার পর উনি থেমে যান। মনে আছে, নীলামের পর আমি যখন বাইরে এসে গাড়িতে উঠছি, তখন হঠাৎ ওর সঙ্গে একবার চোখাচুখি হয়ে পড়ে। ওর চোখের চাহনিটা মোটেই ভাল লাগেনি।'

'আই সি।'

আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ি থেকে বেরোলাম। গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'এ বাড়িতে কি আপনারা অনেকে থাকেন?'

নীলমণিবাবু হেসে বললেন, 'কী বলছেন মশাই? আমার মতো একা মানুষ বোধহয় কলকাতায় দুটি নেই। ড্রাইভার, মালি, দুটি পুরনো বিশ্বস্ত চাকর, ও আমি—ব্যস!'

ফেলুদার পরের প্রশ্নটা একেবারেই এক্সপেক্ট করিনি—

'বাচ্চা ছেলে কি কেউ থাকে না এ বাড়িতে?'

ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্য একটু অবাক হয়ে তারপর হো হো করে হেসে বললেন, 'দেখেছেন—ভুলেই গেছি! আসলে আমি লোক বলতে বয়স্ক লোকের কথাই ভাবছিলাম! আজ দিন দশেক হল আমার ভাগনে ঝন্টু এখানে এসে রয়েছে। ওর বাবা ব্যবসা করেন। এই সেদিন সস্ত্রীক জাপানে গেছেন। ঝন্টুকে রেখে গেছেন আমার জিম্মায়। বেচারি এসে অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগচে।'

তারপর হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার বাচ্চার কথা মনে হল কেন?'

ফেলুদা বলল, 'বৈঠকখানার একটা আলমারির পিছন থেকে একটা ঘুড়ির কোনা উঁকি মারছিল। সেইটে দেখেই...'

নীলমণিবাবুর চাকর একটা ট্যাক্সি ডাকতে গিয়েছিল, সেটা নুড়ি ফেলা পথের ওপর দিয়ে কড় কড় শব্দ করে পোর্টিকোর তলায় ঠিক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফেলুদা ট্যাক্সিতে ওঠার সময় বলল, 'সন্দেহজনক আরো কিছু যদি ঘটে তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন। আপাতত আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।'

বাড়ি ফেরার পথে ফেলুদাকে বললাম, 'শেয়াল-দেবতার চেহারাটা দেখে কীরকম ভয় করে—তাই না?'

ফেলুদা বলল, 'মানুষের ধড়ে অন্য যে-কোনও জিনিসের মাথা জুড়ে দিলেই ভয় করে—শুধু শেয়াল কেন?'

আমি বললাম, 'পুরনো ঈজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি ঘরে রাখা তো বেশ বিপজ্জনক।'

'কে বলল?'

'বাঃ—তুমিই তো বলেছিলে।'

'মোটেই না। আমি বলেছিলাম, যেসব

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে প্রাচীন ঈজিপ্সিয়ান মূর্তি-টুর্তি বার করেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বেশ নাজেহাল হতে হয়েছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই যে একজন সাহেব—সে তো মরেই গিয়েছিল—কী নাম না?'

'লর্ড কারনারভন।'

'আর তার কুকুর...?'

'কুকুর তার সঙ্গে ছিল না। কুকুর ছিল বিলেতে। সাহেব ছিলেন ঈজিপ্টে। তুতানখামেনের কবর খুঁড়ে বার করার কিছুদিনের মধ্যেই কারনারভন হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে মারা যান। তারপর খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, যে সময় সাহেব মারা যান, ঠিক সেই একই সময়ে বিনা অসুখে রহস্যজনকভাবে বেশ কয়েকহাজার মাইল দূরে তার কুকুরটিও মারা যায়।'

প্রাচীন ঈজিপ্টের কোনও জিনিস দেখলেই আমার ফেলুদার কাছে শোনা এই অদ্ভুত ঘটনাটা মনে পড়ে যায়। শেয়াল-দেবতা আনুবিসের মূর্তিটাও নিশ্চয়ই কোন মান্ধাতার আমলের ঈজিপ্সিয়ান সম্রাটের কবর থেকে এসেছে। নীলমণিবাবু কি এসব কথা জানেন না? সাধ করে বিপদ ডেকে আনার মধ্যে কী মজা থাকতে পারে তা তো আমি ভেবেই পাই না।

পরদিন ভোর পৌনে ছ'টায় আমাদের বারান্দায় খবরের কাগজের বান্ডিলটা পড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলছি, কিন্তু উলটোদিকের কথা শোনার আগেই ফেলুদা সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। পর পর তিনবার 'হুঁ', দু'বার 'ও', আর একবার 'আচ্ছা ঠিক আছে' বলেই ফোনটা ধপ করে রেখে দিয়ে ও ধরা গলায় বলল, 'আনুবিস গায়েব। এক্ষুনি যেতে হবে।'

সকাল বেলায় ট্রাফিক কম বলে নীলমণি সান্যালের বাড়ি পৌঁছাতে লাগল ঠিক সাত মিনিট। ট্যাক্সি থেকে নেমেই দেখি নীলমণিবাবু কেমন যেন ভ্যাবাচাকা ভাব করে বাড়ির বাইরেই আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফেলুদাকে দেখেই বললেন, 'নাইটমেয়ারের মধ্যে দিয়ে গেছি মশাই। এরকম হরিব্‌ল অভিজ্ঞতা আমার কক্ষনও হয়নি।'

আমরা ততক্ষণে বৈঠকখানায় ঢুকেছি। ভদ্রলোক আমাদের আগেই সোফায় বসে প্রথমে তাঁর হাতের কব্জিগুলো দেখালেন। দেখলাম, লোকে যেখানে ঘড়ি পরে, তার ঠিক নীচ দিয়ে দুই হাতে দড়ির দাগ বসে গিয়ে হাতটা লাল হয়ে গেছে।

ফেলুদা বলল, 'কী ব্যাপার বলুন।'

ভদ্রলোক দম নিয়ে ধরা গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আপনার কথা মতো গতকাল মূর্তিটা শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে একেবারে বালিশের তলায় রেখে দিয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে যেখানে ছিল সেখানেই রাখলে আর কিছু না হোক, অন্তত শারীরিক যন্ত্রণাটা ভোগ করতে হত না। যাক গে—মূর্তিটা তো মাথার তলায় নিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছি, এমন সময়—রাত কত জানি না—একটা বিশ্রী অবস্থায় ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কে জানি আমার মুখটা আষ্টেপৃষ্টে গামছা দিয়ে বাঁধছে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার পথ বন্ধ দেখে হাত দিয়ে বাধা দিতে গেলুম, আর তখনই বুঝতে পারলুম যে আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী লোকের পাল্লায় পড়েছি। দেখতে দেখতে আমার হাত পিছমোড়া করে দিলে। ব্যস—তারপর বালিশের তলা থেকে মূর্তি নিতে আর কী?'

ভদ্রলোক দম নেবার জন্য কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঘন্টা তিনেক বোধহয় হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিলুম। সমস্ত শরীরে ঝি ঝি ধরে গেসল। সকালে চাকর নন্দলাল চা নিয়ে এসে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে বাঁধন খুলে দেয়, আর তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে ফোন করি।'

ফেলুদার দেখলাম চোখ-মুখের ভাব বদলে গেছে। সে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার ঘরটা একবার দেখব, আর প্রয়োজন হলে আপনার বাড়ির কিছু ছবি তুলব।' ক্যামেরাটাও ফেলুদার নতুন বাতিকের মধ্যে একটা।

নীলমণিবাবু দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকেই ফেলুদা বলল, 'এ কী—জানলার শিক নেই?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'আর বলবেন না—বিলিতি কায়দার বাড়ি তো! আর আমি আবার জানলা বন্ধ করে শুতে পারি না।'

ফেলুদা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখে বলল, 'খুব সহজ—পাইপ রয়েছে, কার্নিশ রয়েছে। একটু জোয়ান লোক হলেই অনায়াসে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে আসতে পারে।'

তারপর ফেলুদা ঘরের চারিদিকে খুব ভাল করে দেখে নিয়ে ছবি-টবি তুলে বলল, 'বাড়ির অন্য অংশও এবার ঘুরে দেখতে চাই।' নীলমণিবাবু প্রথমে দোতলা দেখালেন। পাশের ঘরটাতে দেখলাম একটা খাটে বারো-তেরো বছর বয়সের একটা ছেলে গলা অবধি লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখগুলো বড় বড়, আর দেখলেই মনে হয়, তার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। বুঝলাম, এই হল ঝন্টু। নীলমণিবাবু বললেন, 'কালই আবার ডাক্তার বোস ঝন্টুকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছেন। তাই ও রাত্রে কিছুই শুনতে পায়নি।'

দোতলার আরো দুটো ঘর দেখে, একতলার ঘরগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে এলাম। নীলমণিবাবুর ঘরের জানলার ঠিক নীচেই দেখলাম কয়েকটা ফুলের টবে পামজাতীয় গাছ লাগানো। ফেলুদা টবগুলোর ভিতর কিছু আছে কি না দেখতে লাগল। প্রথম দুটোয় কিছু পেল না। তৃতীয়টার পাতার ভিতর হাতড়ে একটা ছোট্ট টিনের কৌটো পেল। সেটার ঢাকনা খুলে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল, 'এ বাড়িতে কারুর নস্যির বাতিক আছে?'

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে না বললেন। ফেলুদা কৌটোটা নিজের প্যান্টের পকেটে রেখে দিল।

এবার নীলমণিবাবু যেন বেশ মরিয়া হয়েই বললেন, 'মিস্টার মিত্তির—আর কিছু না—মূর্তি একটা গেছে, আরেকটা না হয় কিনব—কিন্তু একটা ডাকাত আমার বাড়িতে এসে আমার ঘরে ঢুকে আমার উপর যা-তা অত্যাচার করে চলে যাবে—এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। আপনাদের একটা বিহিত করতেই হবে। যদি লোকটাকে ধরে দিতে পারেন তা হলে আমি আপনাকে ইয়ে—মানে, ইয়ে আর কী—'

'পারিশ্রমিক?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। পারিশ্রমিক—মানে, রিওয়ার্ড দেব।'

ফেলুদা বলল, 'রিওয়ার্ডটা বড় কথা নয়। সে আপনি দিতে চান দেবেন। কিন্তু আমি কাজটার ভার নিচ্ছি তার প্রধান কারণ হল, এ ধরনের অনুসন্ধানে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, একটা আনন্দ আছে।'

এটা শুনে আমার মনে হল, বড় বড় গোয়েন্দাকাহিনীতে ডিটেকটিভরা যে ভাবে কথা বলে, ফেলুদাও যেন ঠিক সেইভাবেই কথাটা বলল।

এর পরে প্রায় দশ মিনিট ধরে ফেলুদা নীলমণিবাবুর ড্রাইভার গোবিন্দ, চাকর নন্দলাল, আর পাঁচু, আর মালি নটবরের সঙ্গে কথা বলল। তারা সবাই বলল রাত্রে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। বাইরের লোক আসার মধ্যে এক রাত ন'টা নাগাদ ডাক্তার বোস এসেছিলেন ঝন্টুকে দেখতে। নীলমণিবাবু নিজে নাকি তারপর একবার বেরিয়েছিলেন—ও এন মুখার্জির ডাক্তারখানা থেকে ঝন্টুর জন্য ওষুধ কিনে আনতে।

ফেরার পথে একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল ট্যাক্সি আমাদের বাড়ির রাস্তা ছাড়িয়ে অন্য কোথাও চলেছে। ফেলুদাকে গম্ভীর দেখে তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। ট্যাক্সি থামল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা বাড়ির সামনে। দেখলাম বাড়ির সদর দরজার উপরে সাইনবোর্ডে উচুঁ উচুঁ রুপোলি অক্ষরে লেখা রয়েছে—'অ্যারাটুন ব্রাদার্স—অকশনিয়ার্স'। এটাই সেই নীলামের দোকান।

আমি কোনওদিন নীলামঘর দেখিনি। এই প্রথম দেখে একেবারে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এত রকম হিজিবিজি জিনিস একসঙ্গে এর আগে কখনও দেখিনি।

ফেলুদার কাজ দু'মিনিটের মধ্যে সারা হয়ে গেল। প্রতুল দত্তের ঠিকানা সেভেন বাই ওয়ান

লাভলক স্ট্রিট। আমি মনে মনে ভাবলাম প্রতুল দত্তের বাড়ি গিয়েও যদি ফেলুদাকে হতাশ হতে হয়, তা হলে ওর কোথাও যাবার থাকবে না। তার মানে এবার ফেলুদাকে হার স্বীকার করতে হবে। আর তা হলে আমার যে কী দশা হবে তা জানি না। কারণ এখন পর্যন্ত ফেলুদা কোথাও হার মানেনি। ও কোনও ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ চুন করে বসে আছে—এ দৃশ্য আমি কল্পনাই করতে পারি না। আশা করি শিগগিরই ও একটা 'ক্লু' পেয়ে যাবে। আমি অন্তত এখন পর্যন্ত চোখে অন্ধকার দেখছি।

দুপুরে খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, 'এর পর?'

ও ভাতের ঢিপির মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে একবাটি সোনামুগ ডাল ঢেলে বলল, 'এর পর মাছ। তারপর চাটনি, তারপর দই।'

'তারপর?'

'তারপর জল খেয়ে মুখ ধোব। তারপর একটা পান খাব।'

'তারপর?'

'তারপর একটা টেলিফোন করে আধঘন্টা ঘুম দেব।'

এর মধ্যে টেলিফোনটাই একমাত্র ইন্টারেস্টিং খবর, কাজেই আমি সেটার অপেক্ষায় বসে রইলাম।

ডিরেকটরি থেকে প্রতুল দত্তর নম্বরটা আমি বার করে দিয়েছিলাম। নম্বরটা ডায়াল করে 'হ্যালো' বলার সময় দেখলাম ফেলুদা গলাটা একদম চেঞ্জ করে বুড়োর গলা করে নিয়েছে। যে কথাটা হল ফোনে, তার শুধু একটা দিকই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, আর সেইভাবেই সেটা লিখে দিচ্ছি—

'হ্যালো—আমি নাকতলা থেকে কথা কইচি।'

—

'আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীজয়নারায়ণ বাগচি। আমি প্রাচীন কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী। এই বিষয় নিয়ে আমি পুস্তক রচনা করেচি।'

—

'হ্যাঁ...আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার সংগ্রহের কথা শুনেচি। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আপনার কিছু জিনিস আমাকে দেখতে দেন...'

—

'না না না! পাগল নাকি!'

—

'আচ্ছা।'

—

'হ্যাঁ—নিশ্চয়ই!'

—

'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার।'

টেলিফোন শেষ করে ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোকের বাড়িতে চুনকাম হচ্ছে—তাই জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে রেখেছেন। তবে সন্ধের দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে।'

আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

'কিন্তু প্রতুলবাবু যদি সত্যিই আনুবিসের মূর্তি চুরি করে থাকেন, তা হলে তো আর সেটা আমাদের দেখাবেন না।'

ফেলুদা বলল, 'যদি তোর মতো বোকা হয় তা হলে দেখাতেও পারে; তবে না দেখানোটাই সম্ভব। আমি মূর্তি দেখার জন্য যাচ্ছি না, যাচ্ছি লোকটাকে দেখতে।'

তার কথামতো ফেলুদা টেলিফোনটা করেই নিজের ঘরে চলে গেল ঘুমোতে। ফেলুদার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা হল, ও যখন তখন প্রয়োজন মতো একটু-আধটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। শুনেছি নেপোলিয়নেরও নাকি এ ক্ষমতা ছিল; যুদ্ধের আগে ঘোড়ায় চাপা অবস্থাতেই একটু ঘুমিয়ে নিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিতেন।

আমার বিশেষ কিছুই করার ছিল না, তাই ফেলুদার তাক থেকে একটা ঈজিপ্সিয়ান আর্টের বই নিয়ে সেটা উলটে পালটে দেখছিলাম, এমন সময় ক্রী—ং করে ফোনটা বেজে উঠল।

আমি এক দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে ফোনটা তুলে নিলাম।

'হ্যালো!'

কিছুক্ষণ কেউ কিচ্ছু বলল না, যদিও বেশ বুঝতে পারছিলাম ফোনটা কেউ ধরে আছে।

আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করতে শুরু করল।

প্রায় দশ সেকেন্ড পরে একটা গম্ভীর কর্কশ গলা শুনতে পেলাম।

'প্রদোষ মিত্তির আছেন?'

আমি কোনওমতে ঢোক গিলে বললাম, 'উনি একটু ঘুমোচ্ছেন। আপনি কে কথা বলছেন?'

আবার কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর কথা এল, 'ঠিক আছে। আপনি তাকে বলে দেবেন যে মিশরের দেবতা যেখানে যাবার সেখানেই গেছেন। প্রদোষ মিত্তির যেন এ ব্যাপারে আর নাক গলাতে না আসেন, কারণ তাতে কারুর কোনও উপকার হবে না। বরং অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি।'

এর পরেই কট করে ফোনটা রাখার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই সব চুপ।

কতক্ষণ যে ফোনটা হাতে ধরে প্রায় দম বন্ধ করে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ ফেলুদার গলা পেয়ে তাড়াতাড়ি রিসিভারটাকে জায়গায় রেখে দিলাম।

'কে ফোন করেছিল?'

আমি ফোনে যা শুনেছি তা বললাম। ফেলুদা গম্ভীর মুখ করে ভুরু কুঁচকে সোফায় বসে বলল, 'ইস—তুই যদি আমাকে ডাকতিস!'

'কী করব? কাঁচা ঘুম ভাঙালে যে তুমি রাগ করো।'

'লোকটার গলার আওয়াজ কীরকম?'

'ঘরঘরে গম্ভীর।'

'হুঁ...। যাক গে, আপাতত প্রতুল দত্তর চেহারাটা একবার দেখে আসি। মনে হচ্ছিল একটু আলো দেখতে পাচ্ছি; এখন আবার সব ঘোলাটে।

ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট, আমরা প্রতুল দত্তর বাড়ির গেটের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি যে, বাবাও আমাদের দেখে চিনতে পারতেন না। ফেলুদা সেজেছে একটা ষাট বছরের বুড়ো। কাচা-পাকা মেশানো ঝোলা গোঁফ, চোখে মোটা কাচের চশমা, গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট, হাঁটুর উপর তোলা ধুতি, আর মোজার উপর বাটার তৈরি ব্রাউন কেডস জুতো। আধঘন্টা ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে মেক-আপ করে বাইরে এসেই বলল, 'তোর জন্য দু'-তিনটে জিনিস আছে—চট করে পরে নে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমাকেও মেক-আপ করতে হবে নাকি?'

'আলবাত!'

দু'মিনিটের মধ্যে আমার মাথায় একটা কদম-ছাঁট পরচুলা, আর আমার নাকের উপর একটা চশমা বসে গেল। তারপর একটা কালো পেন্সিল দিয়ে আমার পরিষ্কার করে ছাঁটা-জুলপিটা ফেলুদা একটু অপরিষ্কার করে দিল। তারপর বলল—

'তুই আমার ভাগ্নে, তোর নাম সুবোধ—অর্থাৎ শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট ভালমানুষটি। ওখানে মুখ খুলেছ কি বাড়ি এসে রদ্দা!'

প্রতুলবাবুর বাড়ি চুনকাম প্রায় হয়ে এসেছে। ডিজাইন দেখে বোঝা যায় বাড়ি অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরনো, তবে নতুন রঙের জন্য দরজা জানলা দেয়াল সব কিছু ঝলমল করছে।

গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়েই দেখি বাইরে একটা খোলা বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। আমাদের এগোতে দেখেও তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও বুঝলাম তাঁর মুখটা বেশ গম্ভীর।

ফেলুদা দু'হাত তুলে মাথা হেঁট করে নমস্কার করে তার নতুন বুড়ো মিহি গলায় বলল, 'মাপ করবেন—আপনিই কি প্রতুলবাবু?'

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আজ্ঞে আমারই নাম জয়নারায়ণ বাগচি। আমিই আপনাকে আজ দুপুরে টেলিফোন করেছিলাম। এটি আমার ভাগ্নে সুবোধ।'

'আবার ভাগ্নে কেন? ওর কথা তো টেলিফোনে হয়নি।'

আমার মাথার পরচুলা কুটকুট করতে শুরু করেছে।

ফেলুদা গলা ভীষণ নরম করে বলল, 'আজ্ঞে ও ছবি আঁকা শিখছে তাই...' ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

'আপনারা আমার জিনিসগুলি দেখতে

চাইছেন তাতে আপত্তি নেই; তবে সরিয়ে রাখা জিনিস সব টেনে বার করতে হয়েছে। অনেক হ্যাঙ্গাম। একে বাড়িতে রাতদিন মিস্ত্রিদের ঝামেলা, এটা ঠেলো, ওটা ঢাকো...চারিদিকে কাঁচা রং...রঙের গন্ধটাও ধাতে যায় না। সব ঝক্কি শেষ হলে যেন বাঁচি। আসুন ভেতরে...'

লোকটাকে ভাল না লাগলেও, ভিতরে গিয়ে তার জিনিসপত্তর দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনার কাছে মিশর দেশের শিল্পকলার অনেক চমৎকার নিদর্শন রয়েছে দেখছি।'

'তা আছে। কিছু জিনিস কায়রোতে কেনা, কিছু এখানে অকশনে।'

'দ্যাখো বাবা সুবোধ, ভাল করে দ্যাখো।' ফেলুদা আমার পিঠে একটা চিমটি কেটে আমায় জিনিসগুলোর দিকে ঠেলে দিল। 'কতরকম দেবদেবী—দ্যাখো! এই যে বাজপাখি, এও দেবতা, এই যে প্যাঁচা—এও দেবতা। মিশর-দেশে কতরকম জিনিসকে পুজো করত লোকেরা দ্যাখো।'

প্রতুলবাবু একটা সোফায় বসে চুরুট ধরালেন।

হঠাৎ কী খেয়াল হল, আমি বলে উঠলাম, 'শেয়াল-দেবতা নেই, বড় মামা?'

প্রশ্নটা শুনেই প্রতুলবাবু যেন হঠাৎ বিষম খেয়ে উঠলেন। বললেন, 'চুরুটের কোয়ালিটি ফল করছে। আগে এত কড়া ছিল না।'

ফেলুদা সেই রকমই মিহি সুরে বললেন, 'হেঁ হেঁ—আমার ভাগ্নে আনুবিসের কথা বলছে। কালই ওকে বলছিলাম কি না?'

প্রতুলবাবু হঠাৎ ফোঁস করে উঠলেন, 'হুঁ!—আনুবিস! স্টুপিড ফুল!'

'আজ্ঞে?' ফেলুদা চোখ গোল গোল করে প্রতুলবাবুর দিকে চাইলেন। 'আনুবিসকে মূর্খ বলছেন আপনি?'

'আনুবিস না। সেদিন নীলামে—লোকটাকে আগেও দেখেছি আমি—হি ইজ এ ফুল। ওর বিডিং-এর কোনও মাথামুণ্ডু নেই। চমৎকার একটা মূর্তি ছিল। এমন এক অ্যাবসার্ড দাম হাঁকলে যে যার ওপর আর চড়া যায় না। অত টাকা কোথায় পায় জানি না।'

ফেলুদা চারিদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার করে বলল, 'অশেষ ধন্যবাদ। আপনি মহাশয় ব্যক্তি। পরম আনন্দ পেলাম আপনার শিল্প সংগ্রহ দেখে।'

এসব জিনিসপত্র ছিল দোতলায়। আমরা এবার নীচে রওনা দিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'আপনার বাড়িতে লোকজন আর বিশেষ...?'

'গিন্নি আছেন। ছেলে বিদেশে।'

প্রতুল দত্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির জন্য হাঁটতে হাঁটতে বুঝলাম পাড়াটা কত নির্জন। সাতটাও বাজেনি, অথচ রাস্তায় প্রায় লোক নেই বললেই চলে। দুটি বাচ্চা ভিখারি ছেলে শ্যামাসংগীত গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। একটু কাছে এলে পরে বুঝলাম একজন গাইছে আর অন্যজন বাজাচ্ছে। ভারী সুন্দর গান করে ছেলেটা। ফেলুদা তাদের সঙ্গে গলা মিশিয়ে গেয়ে উঠল—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা...

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে কিছুদূর হেঁটে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সির দেখা পেয়েই ফেলুদা হাঁক দিয়ে সেটাকে থামাল। ওঠার সময়ে দেখি বুড়ো ড্রাইভার ভারী অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে দেখছে। এই চিমড়ে বুড়োর গলা দিয়ে ওরকম জোয়ান চিৎকার বেরোল কী করে সেটাই বোধহয় চিন্তা করছে ও।

পরদিন সকালে যখন টেলিফোনটা বাজল, তখন আমি বাথরুমে দাঁত মাজছি। কাজেই ফোনটা ফেলুদাই ধরল।

জিজ্ঞেস করে জানলাম নীলমণিবাবু ফোন করেছিলেন একটা খবর দেওয়ার জন্য।

প্রতুলবাবুর বাড়িতেও কাল ডাকাতি হয়ে গিয়েছে, আর এ খবরটা কাগজেও বেরিয়েছে। টাকা পয়সা কিছু যায়নি; গেছে শুধু কিছু প্রাচীন কারুশিল্পের নমুনা। আট-দশটা ছোট ছোট জিনিস, সব মিলিয়ে যার দাম বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার কম না। পুলিশ নাকি তদন্ত আরম্ভ করে দিয়েছে।

প্রতুলবাবুর বাড়িতে যে সকালেই পুলিশের দেখা পাব, আর তার মধ্যে যে ফেলুদার চেনা লোকও বেরিয়ে পড়বে সেটা কিছুই আশ্চর্যের না। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন সোয়া সাতটা। অবিশ্যি আজ মেক-আপ করিনি। ফেলুদা দেখলাম তার জাপানি ক্যামেরাটা নিতে ভোলেনি।

আমরা গেটের ভিতর সবে ঢুকেছি—এমন সময় একজন বেশ হাসিখুশি মোটাসোটা চশমা পরা পুলিশ—বোধহয় ইনস্পেক্টর-টিনস্পেক্টর হবেন—ফেলুদাকে দেখেই এগিয়ে ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল, 'কীহে, ফেলুমাস্টার!—গন্ধে গন্ধে এসে জুটেছ দেখছি!'

ফেলুদা বেশ নরমভাবে হেসে বলল, 'আরে কী করি বলুন—আমাদের তো ওই কাজ!'

'কাজ বোলো না। কাজটা তো আমাদের। তোমাদের হল শখ। তাই না?'

ফেলুদা একথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, 'কিছু কিনারা করতে পারলেন! বার্গলারি কেস?'

'তা ছাড়া আর কী? তবে ভদ্রলোক খুব আপসেট। খালি মাথা চাপড়াচ্ছেন আর বলছেন কাল এক বুড়ো নাকি এক ছোকরা সঙ্গে করে ওঁর জিনিস দেখতে এসেছিল। ওঁর ধারণা এই দু'জনই নাকি আছে এই বার্গলারির পেছনে।'

আমার কথাটা শুনেই গলা শুকিয়ে গেল। সত্যি, ফেলুদা মাঝে মাঝে বড্ড বেপরোয়া কাজ করে ফেলে।

ফেলুদা কিন্তু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলল, 'তা হলে তো সেই বুড়োর সন্ধান করতে পারলেই চোর ধরা পড়বে। এ তো জলের মতো কেস।'

গোলগাল পুলিশটি বললেন, 'বেশ বলেছ—একেবারে খাঁটি উপন্যাসের গোয়েন্দার মতো বলেছ—বাঃ।'

ভদ্রলোকের পারমিশন নিয়ে ফেলুদা আর আমি বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রতুলবাবু দেখি আজও সেই বারান্দাতেই বসে আছেন। বুঝলাম তিনি এতই অন্যমনস্ক যে আমাদের দেখেও দেখতে পেলেন না।

'কোন ঘরটা থেকে চুরি হয়েছে দেখবে?' মোটা পুলিশ জিজ্ঞেস করলেন।

'চলুন না।'

কাল সন্ধেবেলা দোতলার যে ঘরটায় গিয়েছিলাম, আজও সেটাতেই যেতে হল। অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ফেলুদা সটান ঘরের দক্ষিণদিকের ব্যালকনিটার দিকে চলে গেল। সেটা থেকে ঝুঁকে নীচের দিকে চেয়ে বলল, 'হুঁ, পাইপ বেয়ে অনায়াসে উঠে আসা যায়—তাই না?'

মোটা পুলিশ বললেন, 'তা যায়। আর মুশকিল হচ্ছে কী—দরজার রং কাঁচা বলে ওটাকে আবার দুদিন থেকে বন্ধ করা হচ্ছিল না।'

'ঠিক কখন হয়েছে চুরিটা?'

'রাত পৌনে দশটা।'

'কে প্রথম টের পেল?'

'এদের একটি পুরনো চাকর আছে, সে ওদিকের ঘরে বিছানা করছিল। একটা শব্দ পেয়ে দেখতে আসে। ঘর তখন অন্ধকার। বাতি জ্বালানোর আগেই সে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই সুযোগে চোর বাবাজি হাওয়া।'

ফেলুদার কপালে আবার সেই বিখ্যাত ভ্রূকুটি। বলল, 'একবার চাকরটার সঙ্গে কথা বলব।'

চাকরের নাম বংশলোচন। দেখলাম ঘুঁষিটা খাওয়ার ফলে তার এখনও যন্ত্রণা বা ভয়—কোনওটাই যায়নি। ফেলুদা বলল, 'কোথায় ব্যথা?'

চাকরটা চিঁ চিঁ করে উত্তর দিল, 'তলপেটে।'

'তলপেটে? ঘুঁষি তলপেটে মেরেছিল?'

'সে কী হাতের জোর—বাপ্‌রে বাপ! মনে হল যেন পেটে এসে একখানা পাথর লাগল। আর তার পরেই সব অন্ধকার।'

'আওয়াজটা শুনলে কখন? তখন তুমি কী করছিলে?'

'টাইম তো দেখিনি বাবু। আমি তখন মায়ের ঘরে বিছানা করছি। দুটো ছেলে এসে কীর্তন গান করছিল তাই শুনছিলাম। মা ঠাকরুণ ছিলেন পুজোর ঘরে; বললেন ছেলেটাকে পয়সা দিয়ে আয়। আমি যাব যাব করছি এমন সময় বাবুর ঘর

থেকে ঘটিবাটি পড়ার মতো একটা শব্দ পেলাম। ভাবলাম—কেউ তো নেই—তা জিনিস পড়ে কেন? তাই দেখতে গেছি—আর ঘরে ঢুকতেই...'

বংশলোচন আর কিছু বলতে পারল না।

সব শুনে-টুনে বুঝলাম, আমরা চলে যাবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই চোর এসেছিল।

আমি ভাবলাম ফেলুদা বোধহয় আরো কিছু জিজ্ঞেস করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও আর কোনও কথাই বলল না। সেই মোটা পুলিশকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে রাস্তায় এসে ফেলুদার মুখের চেহারা একদম বদলে গেল। এ চেহারা আমি জানি। ফেলুদা কী জানি একটা রাস্তা দেখতে পেয়েছে, আর সে রাস্তা দিয়ে গেলেই রহস্যের সমাধানে পৌঁছনো যাবে।

পাশ দিয়ে খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল, কিন্তু ফেলুদা থামল না। আমরা দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। ফেলুদার দেখাদেখি আমিও ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে খুব বেশিদূর এগোতে পারলাম না। প্রতুলবাবু যে চোর নন সেটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, যদিও প্রতুলবাবুকে বেশ জোয়ান লোক বলে মনে হয়, আর ওঁর গলার আওয়াজটা বেশ ভারী। কিন্তু তাও এটা কিছুতেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না যে, প্রতুলবাবু একটা বাড়ির পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠতে পারেন। তার জন্য যেন আরো অনেক কম বয়সের লোকের দরকার। তা হলে চোর কে? আর ফেলুদা কোন জিনিসটার কথা এত মন দিয়ে ভাবছে?

কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখি আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ির পাঁচিলের পাশে এসে পড়েছি। ফেলুদা পাঁচিলটা বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করল।

কিছুদূর গিয়ে পাঁচিলটা বাঁদিকে ঘুরেছে। ফেলুদাও ঘুরল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও। এদিকে রাস্তা নেই, ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে হয়। মোড় ঘুরে আঠারো কি উনিশ পা হাঁটার পর ফেলুদা হঠাৎ থেমে গিয়ে পাঁচিলের একটা বিশেষ অংশের দিকে খুব মন দিয়ে দেখল। তারপর সেই জায়গাটার খুব কাছ থেকে একটা ছবি তুলল। আমি দেখলাম সেখানে একটা ব্রাউন রঙের হাতের ছাপ রয়েছে। পুরো হাত নয়—দুটো আঙুল আর তেলোর খানিকটা অংশ—কিন্তু তা থেকেই বোঝা যায় যে সেটা বাচ্চা ছেলের হাত।

এবার আমরা যে পথে এসেছিলাম সে পথে ফিরে গিয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সোজা একেবারে বাড়ির দিকে চলে গেলাম।

খবর পাঠাতেই নীলমণিবাবু বেশ ব্যস্ত হয়ে নীচে চলে এলেন। আমরা তিনজনেই বৈঠকখানায় বসার পর নীলমণিবাবু বললেন, 'আপনি শুনলে কী বলবেন জানি না, তবে আমার মনটা আজ কালকের চেয়ে কিছুটা হালকা। আমার মতো দুর্দশা যে আরেকজনেরও হয়েছে, সেটা ভেবে খানিকটা কষ্টের লাঘব হচ্ছে। কিন্তু তাও একটা প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া অবধি কষ্ট যাবে না—কোথায় গেল আমার আনুবিস? বলুন! আপনি এত বড় ডিটেকটিভ—দুটো দুটো ডাকাতি দু'দিন উপরি উপরি হয়ে গেল আর আপনি এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরেই?'

ফেলুদা একটা প্রশ্ন করে ফেলল।

'আপনার ভাগ্নেটি কেমন আছে?'

'কে, ঝুন্টু? ও আজ অনেকটা ভাল। ওষুধে কাজ দিয়েছে। আজ জ্বরটা অনেক কমে গেছে।'

'আচ্ছা—বাইরের কোনও ছেলেটেলে কি পাঁচিল টপকে এখানে আসে? ঝুন্টুর সঙ্গে খেলতে-টেলতে?'

'পাঁচিল টপকে? কেন বলুন তো?'

'আপনার পাঁচিলের বাইরের দিকটায় একটা বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ দেখেছিলাম।'

'ছাপ মানে? কীরকম ছাপ?'

'ব্রাউন রঙের ছাপ।'

'টাটকা?'

'বলা মুশকিল—তবে খুব পুরনো নয়।'

'কই, আমি তো কোনওদিন কোনও বাচ্চাকে আসতে দেখিনি। বাচ্চা বলতে এক আসে—তাও সেটা পাঁচিল টপকে নয়—একটা ছোকরা ভিখিরি। দিব্যি শ্যামাসংগীত গায়। তবে হ্যাঁ—

আমার বাগানের পশ্চিমদিকে একটা জামরুল গাছ আছে। মধ্যে মধ্যে বাইরের ছেলে পাঁচিল টপকে এসে সে গাছের ফল পেড়ে খায় না, এমন গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না।'

'হুঁ...'

নীলমণিবাবু এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'চোরের বিষয়ে আর কিছু জানতে পারলেন কি?'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

'লোকটার হাতের জোর সাংঘাতিক। এক ঘুঁষিতে প্রতুলবাবুর চাকরকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।'

'তা হলে এ চুরি-ও চুরি এক চোরই করেছে তাতে সন্দেহ নেই।'

'হতে পারে। তবে গায়ের জোরটা এখানে বড় কথা বলে আমার মনে হয় না। একটা বীভৎস বুদ্ধিরও ইঙ্গিত যেন পাওয়া যাচ্ছে।'

নীলমণিবাবু যেন মুষড়ে পড়লেন। বললেন, 'আশা করি সে বুদ্ধিকে জব্দ করার মতো বুদ্ধি আপনার আছে! না হলে তো আমার মূর্তি ফিরে পাবার আশা ছাড়তে হয়।'

ফেলুদা বলল, 'আরো দুটো দিন অপেক্ষা করুন। এখন পর্যন্ত কখনও ফেলু মিত্তিরের ডিফিট হয়নি।'

নীলমণিবাবুর বাড়ির গাড়িবারান্দা থেকে গেট অবধি নুড়ি পাথর দেওয়া রাস্তা। সেটার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি তখন একটা কট কট শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে দেখি নীলমণিবাবুর বাড়ির দোতলার একটা ঘরের জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট ছেলে—ঝন্টুই বোধহয়—জানলার কাচটাকে হাত দিয়ে টোকা মারছে।

আমি বললাম, 'ঝন্টু।'

ফেলুদা বলল, 'দেখেছি।'

সারা দুপুর ফেলুদা তার নীল খাতায় অভ্যাসমতো গ্রিক অক্ষরে কী সব হিজিবিজি লিখল। আমি জানি ভাষাটা আসলে ইংরিজি, কিন্তু অক্ষরগুলো গ্রিক, যাতে আর কেউ পড়ে মানে বুঝতে না পারে। আমার সঙ্গে ওর কথা একেবারেই বন্ধ, তবে সেটা এক হিসেবে ভাল। এখন ওর ভাববার সময়, কথা বলার সময় নয়। মাঝে মাঝে শুনছিলাম ও গুন গুন করে গান গাইছে। এটা সেই ভিখিরি ছেলেটার গাওয়া রামপ্রসাদী গানটা।

বিকেলে পাঁচটা নাগাদ চা খেয়ে ফেলুদা বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি। পপুলার ফোটো থেকে আমার ছবির এনলার্জমেন্টগুলো নিয়ে আসতে হবে।'

আমি একাই বাড়িতে রয়ে গেলাম।

দিন ছোট হয়ে আসছে। তাই সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সূর্য ডুবে অন্ধকার হয়ে এল। পপুলার ফোটো দোকানটা হাজরা রোডের মোড়ে। ফেলুদার ছবি নিয়ে ফিরে আসতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগা উচিত না। তবে এত দেরি হচ্ছে কেন? অবিশ্যি অনেক সময় ছবি তৈরি না হলে দোকানে বসিয়ে রাখে। আশা করি অন্য কোথাও যায়নি ও। আমাকে ফেলে ঘোরাঘুরিটা আমার ভাল লাগে না।

একটা করতালের আওয়াজ কানে এল, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চেনা গলায় সেই গান—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা...

সেই ছেলে দুটো। আজ আমাদের পাড়ায় ভিক্ষে করতে এসেছে।

গান ক্রমে এগিয়ে এল। আমি আমাদের ঘরের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকে রাস্তাটা দেখা যায়। ওই যে ছেলে দুটো—একজন গাইছে, একজন করতাল বাজাচ্ছে। কী সুন্দর গলা ছেলেটার।

এবারে গান থামিয়ে ছেলেটি ঠিক আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে মুখ করে বলল, 'মা দুটি ভিক্ষে দেবে মা?'

কী মনে হল, আমার ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ নয়া বার করে জানলা দিয়ে ছেলেটার দিকে ফেলে দিলাম। টিং শব্দ করে পয়সাটা মাটিতে পড়ল। দেখলাম ছেলেটা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝোলার মধ্যে পুরে আবার গান গাইতে গাইতে হাঁটতে শুরু করল।

একটা ব্যাপারে আমার মাথাটা কেমন জানি গোলমাল হয়ে গেল। যদিও আমাদের রাস্তাটা বেশ অন্ধকার। তবুও ভিখিরি ছেলেটা যখন

ওপর দিকে মুখ করে ভিক্ষে চাইল তখন যেন মনে হল তার মুখের সঙ্গে ঝুন্টুর একটা আশ্চর্য মিল আছে। হয়তো এটা আমার দেখার ভুল, কিন্তু তাতে মনের মধ্যে কেমন খটকা লাগল। আমি ঠিক করলাম ফেলুদা এলেই কথাটা ওকে বলব।

প্রায় সাড়ে ছ'টার সময়ে মেজাজ বেশ গরম করে ফেলুদা এনলার্জমেন্ট নিয়ে বাড়ি ফিরল। যা ভেবেছিলাম তাই, ওকে দোকানে বসে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বলল, 'এবার থেকে নিজেই একটা ডার্করুম তৈরি করে ছবি ডেভেলপিং-প্রিন্টিং করব। বাঙালি দোকানের কথার কোনও ঠিক নেই।'

ফেলুদা যখন ওর বিছানার ওপর ছবিগুলো বিছিয়ে বসেছে, তখন আমি ওকে গিয়ে ভিখিরি ছেলেটার কথা বললাম। ও কিন্তু একটুও অবাক না হয়ে বলল, 'সেটা আর আশ্চর্য কী?'

'আশ্চর্য না?'

'উঁহু।'

'কিন্তু তা হলে ভীষণ গণ্ডগোল বলতে হবে।'

'গণ্ডগোল তো বটেই। সেটা তো আমি প্রথম থেকেই বুঝেছি।'

'তুমি বলতে চাও যে ওই ছেলেটা চুরির ব্যাপারে জড়িত?'

'হতেও পারে।'

'কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের ঘুঁষির এত জোর যে একটা ধেড়ে লোককে অজ্ঞান করে দেবে?'

'বাচ্চা ছেলে ঘুঁষি মেরেছে তা তো বলিনি।'

'তাও ভাল!'

যদি ভাল বললাম, কিন্তু আসলে মোটেই ভাল লাগছিল না। ফেলুদাও যে কেন পরিষ্কার করে কিছু বলছে না তা জানি না।

খাটের উপর বিছানো বারোটা ছবির মধ্যে দেখলাম একটা ছবি ফেলুদা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কাছে গিয়ে দেখি সেটা আজই সকালে তোলা নীলমণিবাবুর পাঁচিলে বাচ্চা ছেলের হাতের দাগের ছবিটা। এনলার্জমেন্টের ফলে হাতের তেলোটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বললাম, 'তুমি তো বলো হাত দেখতে জানো—বলো তো ছেলেটার কত আয়ু।'

ফেলুদা কোনও উত্তর দিল না। সে তন্ময় হয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে আছে। লক্ষ করলাম যে তার মধ্যে একটা দারুণ কনসেনট্রেশনের ভাব।

'কিছু বুঝতে পারছিস?'

হঠাৎ ওর প্রশ্নটা আমাকে একেবারে চমকে দিল।

'কী বুঝব?'

'সকালে কী বুঝেছিলি, আর এখন কী বুঝলি—বল তো।'

'সকালে? মানে, যখন ছবিটা তুললে?'

'হ্যাঁ।'

'কী আর বুঝব? বাচ্চা ছেলের হাত—এ ছাড়া আর কী বোঝার আছে?'

'ছাপের রংটা দেখে কিছু মনে হয়নি?'

'রং তো ব্রাউন ছিল।'

'তার মানে কী?'

'তার মানে ছেলেটার হাতে ব্রাউন রঙের কিছু একটা লেগেছিল।'

'কিছু মানে কী? ঠিক করে বলো।'

'পেন্ট হতে পারে।'

'কোথাকার পেন্ট?'

'কোথাকার পেন্ট... কোথাকার...?'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

'প্রতুলবাবুর ঘরের দরজার রং!'

'এগজ্যাক্টলি। সেদিন তোরও সার্টের বাঁদিকের আস্তিনে লেগে গিয়েছিল। এখনও গিয়ে দেখতে পারিস লেগে আছে।'

'কিন্তু'—আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল, '—যার হাতের ছাপ, সেই কি প্রতুলবাবুর ঘরে ঢুকেছিল?'

'হতেও পারে। এখন বল—ছবি দেখে কী বুঝছিস।'

আমি অনেক ভেবেও নতুন কিছু বোঝার কথা বলতে পারলাম না।

ফেলুদা বলল, 'তুই পারলে আশ্চর্য হতাম। শুধু আশ্চর্য হতাম না—শক পেতাম। কারণ তা হলে বলতে হত তোর আর আমার বুদ্ধিতে কোনও তফাত নেই।'

'তোমার বুদ্ধিতে কী বলছে?'

বলছে যে এটা একটা সাংঘাতিক কেস।

ভয়াবহ ব্যাপার। আনুবিস যেরকম ভয়ঙ্কর—এই রহস্যটাও তেমনই ভয়ঙ্কর।

পরদিন সকালে ফেলুদা প্রথম নীলমণি সান্যালকে ফোন করল।

'হ্যালো—কে, মিস্টার সান্যাল?...আপনার রহস্য সমাধান হয়ে গেছে...মূর্তি এখনও হাতে আসেনি, তবে কোথায় আছে, মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছি...আপনি কি বাড়ি আছেন?...অসুখ বেড়েছে?...কোন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন...ও, আচ্ছা। তা হলে পরে দেখা হবে...'

ফোনটা রেখেই ফেলুদা চট করে আরেকটা নম্বর ডায়াল করল। ফিস্ ফিস্ করে কী কথা হল সেটা ভাল শুনতে পেলাম না—তবে ফেলুদা যে পুলিশে টেলিফোন করছে সেটা বুঝলাম। ফোনটা রেখেই ও আমাকে বলল, 'এক্ষুনি বেরোতে হবে—তৈরি হয়ে নে।'

একে সকালে ট্রাফিক কম, তার উপর ফেলুদা আবার ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলল টপ স্পিডে যেতে। দেখতে দেখতে আমরা নীলমণিবাবুর বাড়ির রাস্তায় এসে পড়লাম।

গেটের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি, তখন দেখি নীলমণিবাবু তাঁর কালো অ্যাম্বাসাডরে বেরিয়ে বেশ স্পিডের মাথায় আমরা যেদিকে যাচ্ছি তার উলটোদিকে রওনা দিলেন। সামনে ড্রাইভার আর পিছনে নীলমণিবাবু ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

'আউর জোরসে'— ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল। ট্যাক্সি ড্রাইভারও কীরকম একসাইটেড হয়ে অ্যাক্সিলারেটরে পা চেপে দিল।

সামনের গাড়িটা দেখলাম বিশ্রী গোঁ গোঁ শব্দ করে ডানদিকে মোড় নিচ্ছে।

এইবার ফেলুদা যে জিনিসটা করল সেটা এর আগে কক্ষনও করেনি। কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে হঠাৎ তার রিভলভারটা বার করে গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনের টায়ারের দিকে অব্যর্থ টিপ করে রিভলভারটা মারল।

প্রায় একই সঙ্গে রিভলভারের আর টায়ার ফাটার শব্দে কানে তালা লেগে গেল। দেখলাম নীলমণিবাবুর গাড়িটা বিশ্রী ভাবে রাস্তার একপাশে কেতরে গিয়ে একটা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

আমাদের গাড়িটা নীলমণিবাবুর গাড়ির পিছনে থামতেই দেখি উলটোদিক থেকে পুলিশের জিপ এসেছে।

এদিকে নীলমণিবাবু গাড়ি থেকে নেমে এসে ভীষণ বিরক্ত মুখ করে এদিক ওদিক চাইছেন।

ফেলুদা আর আমি ট্যাক্সি থেকে নেমে নীলমণিবাবুর দিকে এগিয়ে গেলাম।

পুলিশের জিপটাও কাছাকাছি এসে থেমেছে। দেখলাম সেটা থেকে নামলেন সেই মোটা অফিসারটি।

নীলমণিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এসব কী হচ্ছে কী?'

ফেলুদা গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কে আছে জানতে পারি কি?'

'কে আবার থাকবে?' ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন। 'বললাম তো আমি আমার ভাগ্‌নেকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি।'

ফেলুদা এবার আর কিছু না বলে সোজা গিয়ে নীলমণিবাবুর গাড়ির দরজার হ্যান্ডেলটা ধরে একটানে দরজাটা খুলে ফেলল।

খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে গাড়ি থেকে তীরের মতো বেরিয়ে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর টুঁটি টিপে ধরল। কিন্তু ফেলুদা তো শুধু যোগব্যায়াম করে না? ও রীতিমতো যুযুৎসু আর কারাটে শিখেছে। ছেলেটার কবজি দুটো ধরে উলটে তাকে অদ্ভুত কায়দায় মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আছাড় মেরে রাস্তায় ফেলল। যন্ত্রণার চোটে একটা চিৎকার ছেলেটার মুখ দিয়ে বেরোল, আর সে চিৎকার শুনে আমার রক্ত জল হয়ে গেল!

কারণ সেটা মোটেই বাচ্চার গলা নয়।

সেটা একটা বয়স্ক লোকের বিকট হেঁড়ে গলার চিৎকার!

এই গলাই সেদিন আমি টেলিফোনে শুনেছিলাম!

ইতিমধ্যে পুলিশ এসে নীলমণিবাবুর গাড়ির ড্রাইভার আর 'বাচ্চা'টাকে ধরে ফেলল।



ফেলুদা তার জামার কলারটা ঠিক করতে করতে বলল, 'পাঁচিলের গায়ে হাতের ছাপ দেখেই ধরেছিলাম। অল্প বয়সের ছেলের হাতে এত লাইন থাকে না। তাদের হাত আরো অনেক মসৃণ থাকে। অথচ সাইজ যখন ছোট, তখন তার একটাই মানে হতে পারে। এটা আসলে একটা বেঁটে বামনের হাতের ছাপ। বাচ্চাটা আসলে আর কিছুই না—একটি ডোয়ার্ফ। কত বয়স হল আপনার সাকরেদের, নীলমণিবাবু?'

'চল্লিশ!' ভদ্রলোকের গলা দিয়ে ভাল করে আওয়াজ বেরোচ্ছে না!

'খুব বুদ্ধি খাটিয়েছেন যা হোক। আগে জিনিস চুরির মিথ্যে ঘটনাটা খাড়া করে আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, তারপর নিজেই লোক লাগিয়ে পরের জিনিস চুরি করছেন। আপনার বাড়িতে কাল যাকে দেখলাম সে কি সেই ভিখারি ছেলেটি?'

নীলমণিবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'তার মানে আপনার ভাগ্নে বলে আসলে কেউ নেই। ওকে বাড়িতে এনে ধরে রেখেছেন এই চুরির ব্যাপারে হেল্প করার জন্য?'

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলেন।

ফেলুদা বলে চলল, 'ছেলেটা গান গাইত আর বামনটা খঞ্জনি বাজাত। কেবল চুরির টাইম এলে খঞ্জনিটা ভিখারির হাতে দিয়ে যেত, এবং তখন সে-ই বাজাতে থাকত। বামন বলেই তার গায়ে জোরের অভাব নেই। এক ঘুঁষিতে একজন জোয়ান লোককে ঘায়েল করতে পারে। ওয়ান্ডারফুল! আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না নীলমণিবাবু।'

নীলমণিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মিশরের প্রাচীন জিনিসের উপর একটা নেশা ধরে গিয়েছিল। প্রচুর পড়াশুনা করেছি এই নিয়ে। সাধে কি প্রতুল দত্তের উপর হিংসা হয়েছিল।'

ফেলুদা বলল, 'অতি লোভে শুধু তাঁতিই নষ্ট হয় না, বামুনও হয়। কারণ আপনার ওই বেঁটেটিও বামুন, আর আপনি সান্যাল—একেবারে উচ্চশ্রেণীর বামুন!...যাকগে—এবার একটা শেষ অনুরোধ আছে।'

'কী?'

'আমার রিওয়ার্ডটা।'

নীলমণিবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন।

'রিওয়ার্ড!'

'আনুবিসের মূর্তিটা আপনার কাছেই আছে বোধহয়?'

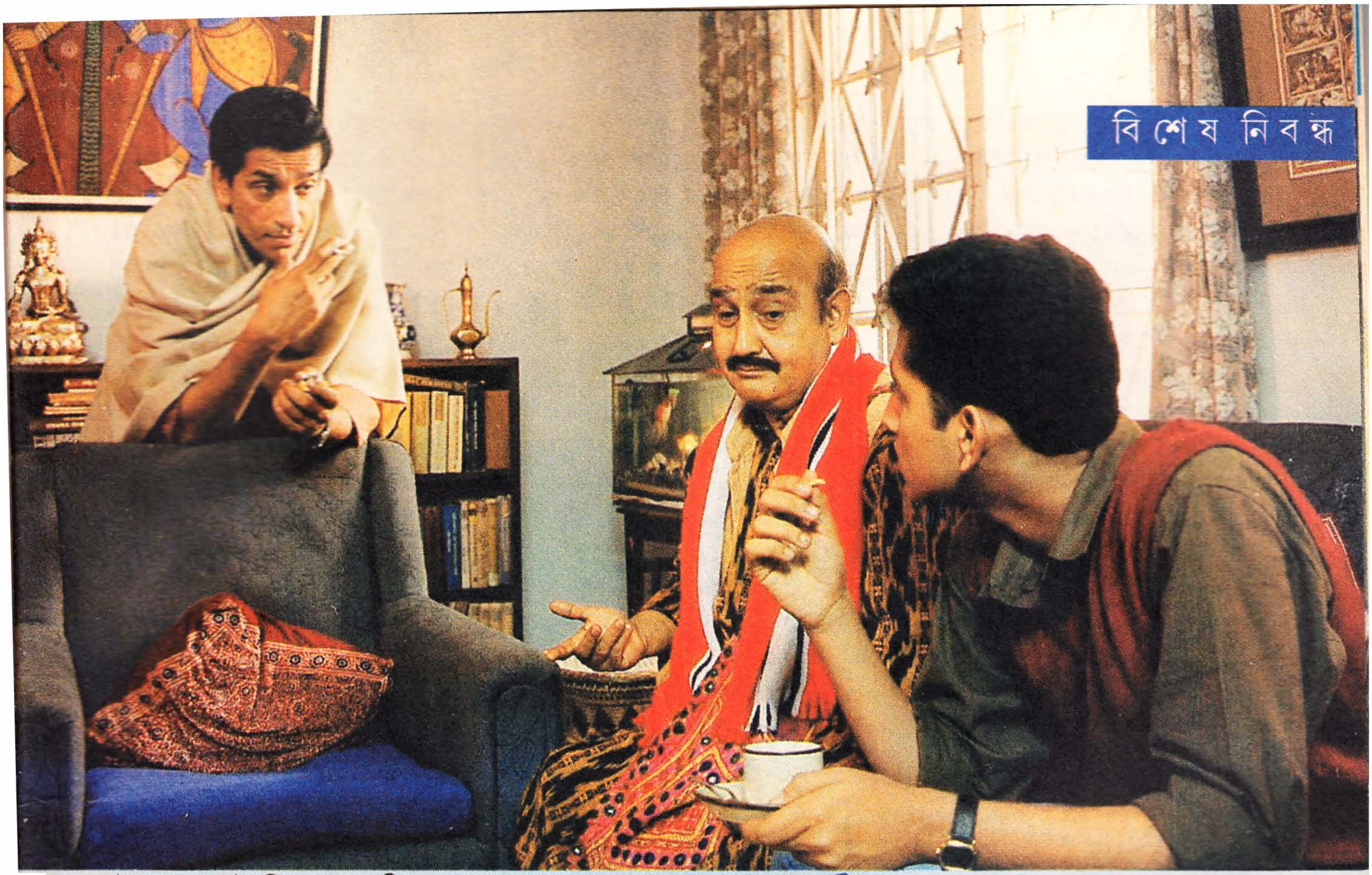
ভদ্রলোক কেমন যেন বোকার মতো ডান হাতটা নিজের পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

হাতটা বার করতে দেখলাম তাতে রয়েছে এক বিঘত লম্বা কালো পাথরের উপর রঙিন মণিমুক্তা বসানো চার হাজার বছরের পুরনো মিশর দেশের শেয়ালমুখী দেবতা আনুবিসের মূর্তি।

ফেলুদা হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

পুনর্মুদ্রিত

ছবি: সত্যজিৎ রায়



'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' সিনেমার একটি দৃশ্য

সিনেমা-থিয়েটারে ফেলুদা

দার্জিলিং, গ্যাংটক, বোসপুকুর, কাঠমান্ডু, বোম্বাই— এমন জায়গা নেই যেখানে ফেলুদা অ্যান্ড কোং যাননি। সেইসঙ্গে রহস্য সমাধানের পাশাপাশি ফেলুদার প্রতিটি কাহিনিতে হাসির রং ধরিয়েছেন লালমোহনবাবু। সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের আশ্চর্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন তাঁর ফেলুদা কাহিনিগুলিতে, সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটারের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন 'সমাদ্দারের চাবি', 'বোসপুকুরে খুনখারাপি', 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা' ইত্যাদি গল্পে। এইসব গল্পেও সিনেমা-থিয়েটারের ইমেজ ছাপিয়ে ফেলুদাই হয়ে উঠেছেন নায়ক। লিখেছেন **সুখেন বিশ্বাস**

ইতিহাসের পাতায় নানা সাহেব বা তাঁতিয়া টোপিকে কে না চেনে। 'নওলখা হার' ছিল নানা সাহেবের অতি প্রিয়। বিখ্যাত এই অলঙ্কারটি একসময় নেপাল থেকে পাচার হয়ে কলকাতায় আসে। চলচ্চিত্র প্রযোজক মিঃ সান্যাল খবর পেয়েছেন লালমোহনবাবু বোম্বাই যাচ্ছেন তাঁর নিজেরই একটি কাহিনির হিন্দি শুটিংয়ে যোগ দিতে। মিঃ সান্যাল লালমোহনবাবুর হাত দিয়ে চোরাই হারটি পাঠালেন বোম্বাইয়ের চিত্র প্রযোজক মিঃ গোরের কাছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে হারটি পেয়ে গেলেন ফেলুদা।

ছবির নাম 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'। ডিরেক্টর পুলক ঘোষাল। সিকোয়েন্স: চলন্ত ট্রেনে রেল ডাকাতদের আক্রমণ। পুলকবাবু 'অ্যাকশন' বলতেই শুরু হল শুটিং। ট্রেন ছুটে চলেছে সামনের দিকে। রাস্তা ধরে ডাকাতদের ঘোড়দৌড়। ট্রেনের এক কামরায় ফেলুদারা বসে। হঠাৎই ফেলুদা লক্ষ করলেন তাদেরই সামনে রিভলভার হাতে

মিঃ সান্যাল দাঁড়িয়ে। লালমোহনবাবুর কাছে 'লাইফ ডিভাইন' বইয়ের প্যাকেটটা তিনি চাইলেন। এই বইয়ের মধ্যে গর্ত করেই তিনি পাচার করেছিলেন সেই নওলখা হারটা। মিঃ সান্যাল বললেন, "ব্যাগটা খুলুন, খুলে বার করে দিন। না দিলে কী ফল হবে সেটা আর নাই বললাম।" একদিকে শুটিং, অন্যদিকে মিঃ সান্যালের অ্যাকশন। চলন্ত ট্রেনেই বেধে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। শুটিংয়ের ফাঁকে হঠাৎই ভল্ট দিয়ে ফেলুদার কামরায় ঢুকে পড়লেন ভিক্টর। মিঃ সান্যালের রিভলভার হাত থেকে ছিটকে গেল। মিঃ সান্যালের দাড়ি-গোঁফ-পরচুলা খুলে দিলেন ফেলুদা। আরে এ যে মিঃ গোরে, বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবির প্রযোজক। একথা সকলেরই জানা যে, স্মাগলিংয়ের প্রাণকেন্দ্র বোম্বাই। বোম্বাইয়ের শুটিং-স্পটে আন্তর্জাতিক স্মাগলার মিঃ গোরেকে চিহ্নিত করেন সত্যজিতের গোয়েন্দা কাহিনির মহানায়ক ফেলুদা।

ফেলুদার জন্ম ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ কলকাতার তারা রোডে। ১৯৬৫ সালে, বয়স যখন ২৭, তখন থেকেই অপরাধ উদ্ঘাটন করা শুরু করেছেন ফেলুদা। কোথাও উদ্ধার হয়েছে প্রাচীন রত্নালঙ্কার, কোথাও দুর্মূল্য মূর্তি, কোথাও বা মূল্যবান পাথর। ওইসব মূল্যবান জিনিসকে কেন্দ্র করেই রহস্য দানা বেঁধেছে। তারপর হয়েছে রহস্যের সমাধান। এর মধ্যেই অবশ্য খুনের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সত্যজিৎ রায় ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই একজন চলচ্চিত্র পরিচালক। তাই তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায় সিনেমার শুটিংয়ের খুঁটিনাটি। তিনি চলচ্চিত্রের আশ্চর্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে', 'দার্জিলিং জমজমাট' ইত্যাদি গল্পে। যাত্রা-থিয়েটারের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন 'সমাদ্দারের চাবি', 'বোসপুকুরে খুনখারাপি', 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা' ইত্যাদি গল্পে। এইসব গল্পেও সিনেমা-থিয়েটারের ইমেজ ছাপিয়ে ফেলুদাই নায়ক হয়ে উঠেছেন।

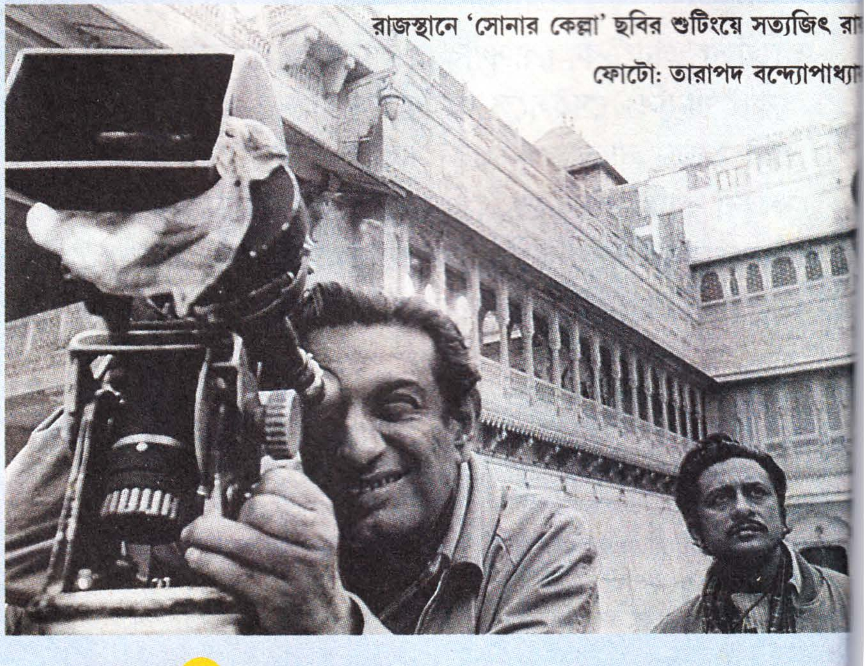
ধরা যাক 'দার্জিলিং জমজমাট' গল্পের কথা। এখানেও আছে শুটিংয়ের প্রসঙ্গ। কাহিনিকার লালমোহনবাবু। ডিরেক্টর পুলক ঘোষাল। নায়ক মিঃ রায়না। দার্জিলিংয়ে বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে শুটিং শুরু হল। এরই মাঝে হঠাৎই একদিন খুন হলেন বিরূপাক্ষবাবু। মৃতদেহের পাশে একটা কাগজে লেখা 'বিষ'। ফেলুদা ভাবলেন, তবে কি বিষ খাইয়ে বিরূপাক্ষবাবুকে মারা হয়েছে? তা ছাড়া খুনি আর কেই বা হতে পারে? খুনের মোটিভই বা কী ছিল? শুটিং বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে। তদন্তে নামলেন ফেলুদা। জানা গেল, এক সময়ের ব্যাঙ্ককর্মী ভি বালাপোরিয়া দেড় লাখ টাকা তছরুপ করে বেপাত্তা হয়ে যান। সেইসময় তদন্তের ভার পড়েছিল ওই ব্যাঙ্কেরই ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিরূপাক্ষবাবুর ওপর। মৃত্যুর আগেও অপরাধীকে চিনতে পেরে তার নামের প্রথমটুকু লিখে নিয়েছিলেন বিরূপাক্ষবাবু। শুটিংয়ের সিকোয়েন্সকে ছাপিয়ে গেছে ফেলুদার বুদ্ধিমত্তা। তদন্তের শেষে তিনি জানালেন, "...ভি, বালাপোরিয়া হচ্ছেন বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া। বিষ্ণুদাসের 'বিষ' টুকু বিরূপাক্ষ মজুমদার লিখতে পেরেছিলেন, আর পারেননি।" বিষ্ণুদাসই এই ছবিতে মিঃ রায়নার ছদ্মবেশে অভিনয় করতে এসেছেন। ফিল্মি কায়দায় সিনেমার নায়ককে পরাস্ত করে ফেলুদা হয়ে গেছেন রহস্য উন্মোচনের নায়ক।

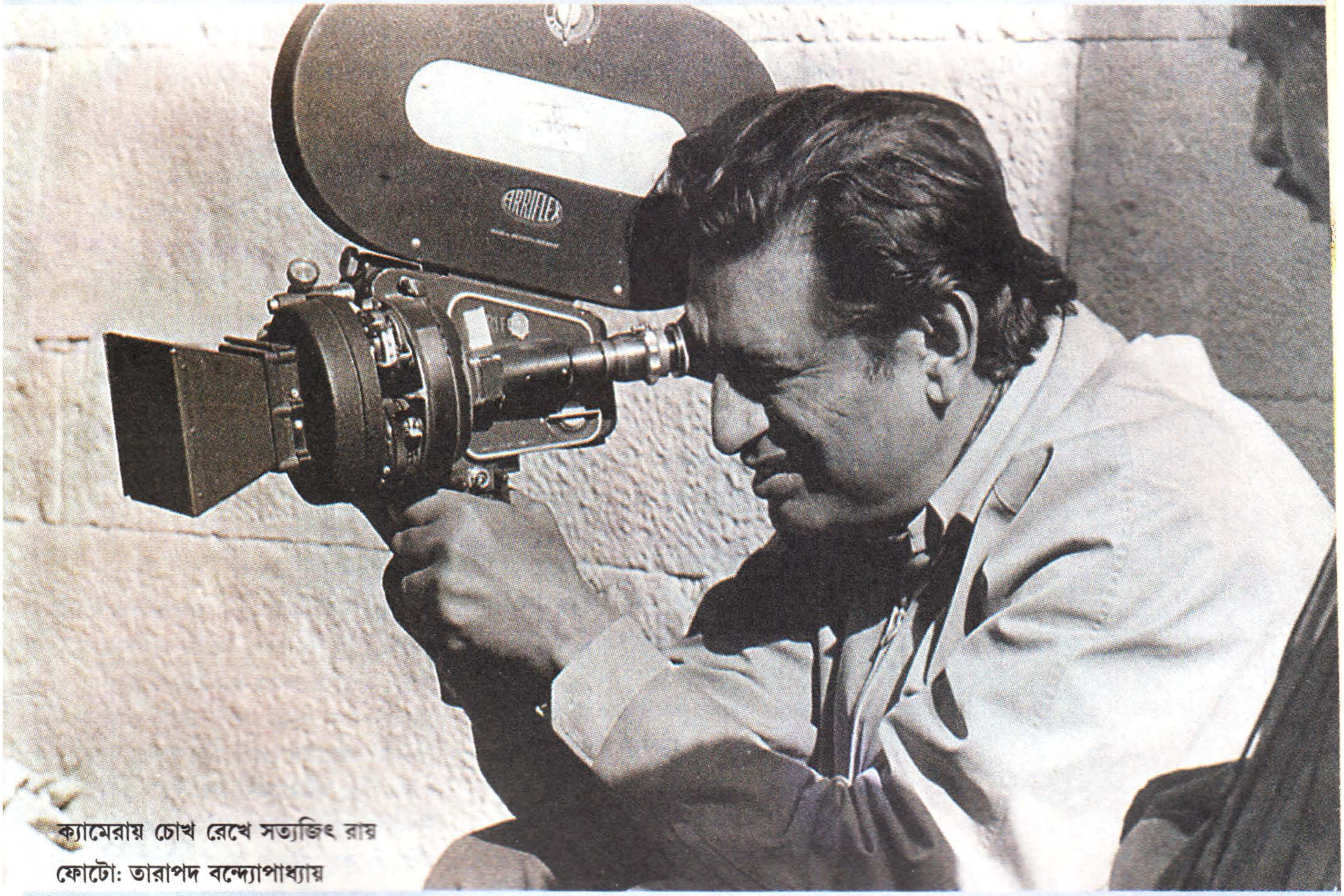
সিনেমার শুটিংয়ের পাশাপাশি সত্যজিতের গল্পে দেখা গেছে যাত্রা-থিয়েটারের বাস্তবতা। যেমন, সমাদ্দারের চাবি গল্পে ধরণীধর রাধারমণের একমাত্র নাতি। পড়াশোনা ছেড়ে থিয়েটারে যোগ দেওয়ার জন্য নাতির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেন রাধারমণ। মৃত্যুর আগে গচ্ছিত টাকার সন্ধান জানাতে তিনি বলেছিলেন, "আমার নামে...চাবি...চাবি...।" ফেলুদার মনে হল রাধারমণবাবু আসলে সুরপাগল মানুষ। এইজন্য তাঁর ঘরে এত বাদ্যযন্ত্র। সেতার, সরোদ, তানপুরা, এসরাজ সবই তাঁর আছে। এ ছাড়াও আছে 'মেলোকর্ড' নামে একটি অপরিচিত যন্ত্র। তদন্তে নেমে ফেলুদার একটি কথাই বারবার কানে বাজল—'আমার নামে চাবি'। অর্থাৎ রাধারমণ সমাদ্দারের নামে চাবি। মেলোকর্ডের রিডে ফেলুদা রাধারমণ সমাদ্দার অর্থাৎ (রে-ধা-রে-মা-নি-সা-মা-দা-দা-রে) সুর বাজাতেই যন্ত্রটা খুলে গেল। তোপসে লিখেছে, "আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেই দরজাটার পিছনে রয়েছে...তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট।" তারপর নাটকীয়ভাবে সেই টাকার রহস্য উদ্ঘাটনে ফেলুদা অসাধারণ।

বোসপুকুরে খুনখারাপি গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এক দুর্মূল্য বেহালা 'আমাটি'। 'সূর্যতোরণ' যাত্রাপালার বেহালাবাদক ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য। তিনি অন্যদিকে লেখক, গীতিকারও। জটায়ুর পাল্লায় পড়ে ফেলুদারা সূর্যতোরণ যাত্রাপালাটি দেখলেন। অনেকটা যেচেই তাঁরা ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সঙ্গে আলাপও করলেন। কয়েকদিন বাদে হঠাৎ

রাজস্থানে 'সোনার কেল্লা' ছবির শুটিংয়ে সত্যজিৎ রা

ফোটো: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যা





ক্যামেরায় চোখ রেখে সত্যজিৎ রায়
ফোটো: তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রনারায়ণবাবু খুন হওয়ায় ফেলুদা অবাক। তদন্তে নেমে ফেলুদা প্রথমেই কাগজে বিদেশি বেহালা কেনার বিজ্ঞাপন দিলেন। উত্তর এল জনৈক মিঃ রাবেলার কাছ থেকে। মিঃ রাবেলা জানালেন যে, বেহালাটি আচার্যবাড়ি থেকেই কেনা। ফেলুদার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, বেহালা চোরই আসলে খুনি। ঘটনার তদন্তে নেমে ফেলুদা জানলেন, আচার্যবাড়িতে কীর্তিনারায়ণবাবুর জীবনীলেখক প্রদ্যুম্ন আসলে জুয়াড়ি। 'HAPPY BIRTHDAY' ও 'HUKUM-CHAND' এই দুটি নামের সূত্র ধরেই জানা গেল তিনি নিয়মিত রেসের মাঠে যান। 'HAPPY BIRTHDAY' ও 'HUKUM-CHAND' আসলে দুটি ঘোড়া। টাকার প্রয়োজনেই তিনি ইন্দ্রনারায়ণবাবুকে খুন করেন। তারপর আমাটি সরিয়ে মিঃ রাবেলার কাছে বিক্রি করেন। যাত্রার পটভূমিকায় খুনের রহস্য উন্মোচনে বোসপুকুরেও ফেলুদাই নায়ক বনে গেলেন।

বোসপুকুরের পাশাপাশি 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা'-তেও ফেলুদা জয়ী। গল্পটা পড়লে জানা যায় এই থিয়েটারে প্রথমে নিখোঁজ হয়েছে অভিনেতা মহীতোষ রায়। পরে খুন হয়েছে নেপাল দত্ত। তদন্তে নেমেই ফেলুদা প্রথমে অপ্সরা থিয়েটারের সমস্ত কলাকুশলীদের জেরা করলেন। অবাক হয়ে গেলেন থিয়েটারে আসা নতুন অভিনেতা সুধেন্দু চক্রবর্তীর মুখে মেক আপের বহর দেখে। মুখভর্তি কেনই বা তাঁর মোগলাই গোঁফ আর দাড়ি। তদন্তে জানা গেল, অপ্সরা থিয়েটারের নতুন নাটক 'আলমগীর' মঞ্চস্থ হবে শুনেই সে গোঁফ-দাড়ি রাখতে শুরু করেছে। ফেলুদা জানালেন যে, মহীতোষবাবু নিখোঁজ হননি। সুধেন্দু চক্রবর্তীই আসলে মহীতোষ রায়। ঈর্ষাবশে আলমগীরের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যই সে নেপাল দত্তকে খুন করেছে। সুধেন্দুর মেকআপ নেওয়া আর মশলা খাওয়ার অভ্যেসের ফলেই মহীতোষের আসল রূপ ফুটে উঠেছে। খুনি অভিনেতাকে ধরিয়ে ফেলুদা যেন নিজেই অপ্সরা থিয়েটারের নায়ক হয়ে বসেছেন।

লালমোহনবাবু গোয়েন্দাকাহিনির বেস্ট সেলার 'অথর'। 'সাহারায় শিহরণ', 'হংকং-এ হিমসিম', 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা অনেক গল্পের শুটিং হয়েছে। তাতে তিনি অংশও নিয়েছেন। আসল কথা হল, গোয়েন্দাকাহিনিতে হাসির রং ধরিয়েছেন লালমোহনবাবু। আর সেইসব ঘটনা নিরুচ্চারে লিখে গেছে তোপসে। আর ফেলুদার কথা? দার্জিলিং, গ্যাংটক, বোসপুকুর, কাঠমান্ডু, বোম্বাই—এমন জায়গা নেই যেখানে ফেলুদা অ্যান্ড কোং যাননি। ফেলুদা কিন্তু লালমোহনবাবুর মতো রহস্য-উপন্যাস লেখেননি। তাঁর রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারই শেষ পর্যন্ত সিনেমা-কাহিনি হয়ে গেছে। লালমোহনবাবুর মতো তিনিও সিনেমা-থিয়েটারে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু অভিনয় করেননি। রহস্য উন্মোচনের পাশাপাশি সিনেমা-থিয়েটারের রস গ্রহণ করে আনন্দ পেয়েছেন।

কুইজ

এই মাসের ২ তারিখে সত্যজিৎ রায়ের জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনে তাঁরই দুই অমর সৃষ্টি ফেলুদা আর প্রোফেসর শঙ্কুই এবারের কুইজের বিষয়।

১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ক্রিকেট খেলতে লখনউ আর বেনারসে গিয়েছিলেন ফেলুদা। ক্রিকেটের কোন বিভাগে তাঁর দক্ষতা ছিল?

২ মাত্র বিশ বছর বয়সে কলকাতার কোন কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন প্রোফেসর শঙ্কু?

৩ 'সাহারায় শিহরণ', 'বোর্নিওর বিভীষিকা', 'ভ্যাঙ্কুবারের ভ্যাম্পায়ার'—প্রখর রুদ্রকে হিরো বানিয়ে এরকম অনেক থ্রিলার লিখেছেন লালমোহনবাবু। তাঁর একমাত্র রূপকথাধর্মী বইয়ের নাম কী?

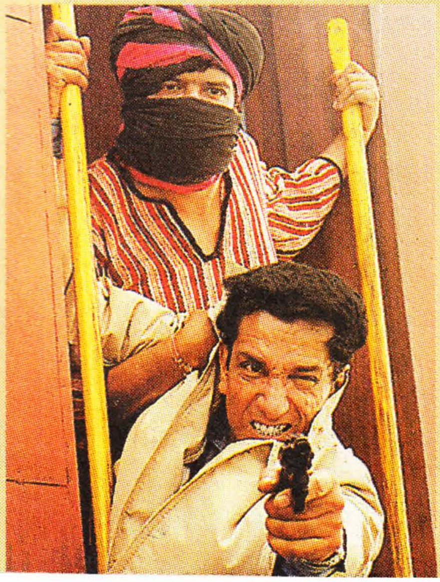
৪ আবিষ্কারক হিসেবে বিশ্বের একমাত্র কোন বিজ্ঞানীর পরেই প্রোফেসর শঙ্কুর নাম পাঁচ মহাদেশে সর্বজনস্বীকৃত?

৫ ফেলুদার ন'বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। ফেলুদার বাবার নাম কী ছিল?

৬ প্রোফেসর শঙ্কু এমন একটি চশমা আবিষ্কার করেছিলেন যাতে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, এক্স রে এই তিনটি জিনিসেরই কাজ একসঙ্গে হত। এর নাম কী দিয়েছিলেন তিনি?

৭ রহস্য সমাধানে কাঠমাণ্ডু ছাড়াও ফেলুদা বিদেশে গিয়েছেন দু' বার। কোথায় কোথায়?

৮ প্রোফেসর শঙ্কুর মোট আটত্রিশটি ডায়রির কথা আমরা জানি। তার প্রথমটি হল 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। শঙ্কুর সর্বশেষ ডায়রির নাম কী?



অভিজিৎ সুকুল, তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা: আনন্দমেলা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১। ই-মেল anandamela@abpmail.com

● গত সংখ্যার উত্তর:

১. হানিফ মহম্মদ।
২. কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত।
৩. ইমরান খান।
৪. দু'জনকেই 'টাইগার' নামে ডাকা হয়।
৫. হানিফ মহম্মদ।
৬. আমির ইলাহি।
৭. হাসান রাজা।
৮. জাহির আব্বাস।

জবাব চাই

১. প্রোফেসর শঙ্কুর পুরো নাম কী?
২. সত্যজিৎ রায় এবং জটায়ুর লেখা কোন বইয়ের নাম এক? বোম্বাইয়ের বোম্বেটে
৩. 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' ছবিতে তোপসের ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন?

উত্তর আগামী সংখ্যায়

● গত সংখ্যার জবাব চাইয়ের উত্তর:
১. শোয়েব আখতার। ২. ওয়াকার ইউনিস। ৩. লাহোর।

● সঠিক উত্তরদাতা

দেবাঙ্কা বণিক, নবম শ্রেণী, মহারানি কাশীশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; আরিফ হাসান, নবম শ্রেণী, লালগোলা এম এন একাডেমি; সৌম্যদীপ দে, সপ্তম শ্রেণী, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল; শুভদীপ গুহ, ষষ্ঠ শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট স্কুল; অরিত্র দত্ত, অষ্টম শ্রেণী, শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়; পৃথীশ ঘোষ, একাদশ শ্রেণী, মহিয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশন; পৃথ্বীসুতা মণ্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণী, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্ল্স স্কুল; সুচরিতা মেহেরা, দশম শ্রেণী, বোলপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; অর্কপ্রভ গঙ্গোপাধ্যায়, তৃতীয় শ্রেণী, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল; রক্তিমাভ বসু, চতুর্থ শ্রেণী, নব নালন্দা স্কুল; অয়ন অধিকারী, সপ্তম শ্রেণী, প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির; নিরুপম সাহা, অষ্টম শ্রেণী, সেন্ট অ্যান্ড্রুজ স্কুল; স্বরূপকান্ত সাহা, নবম শ্রেণী, বহরমপুর জে এন একাডেমি; সৌভিক সাউ, সপ্তম শ্রেণী, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ; তনুশ্রী দাস, সপ্তম শ্রেণী, ন্যাশনাল জেমস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল; পৃথা উপাধ্যায়, সপ্তম শ্রেণী, ক্রাইস্ট চার্চ গার্ল্স হাই স্কুল; সায়নদীপ ধাড়া, পঞ্চম শ্রেণী, ত্রিবেণী থার্মাল ডঃ বিধানচন্দ্র রায় বিদ্যালয়; আগামী মিত্র, সপ্তম শ্রেণী, লিসে স্কুল; অভিজিৎ সাধুখাঁ, সপ্তম শ্রেণী, বর্ধমান টাউন স্কুল; সুপার্থ কর চৌধুরী (ই মেল); ঐশ্বর্যপ্রজ্ঞা, ষষ্ঠ শ্রেণী, ডি এ ভি মডেল স্কুল; জয়দীপ ভট্টাচার্য, নবম শ্রেণী, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল; নীলাঞ্জন সেন (ই মেল)।

একটা ছাতা আর একটা কলম

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



বাবার কাছে দু'জন লোক এসেছিলেন কীসব কাজের কথাটথা বলতে। সকালবেলায় বাবা খুব ব্যস্ত থাকেন, অফিসে যাওয়ার আগেও টেলিফোনে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়। বাবার হেড অফিস সিঙ্গাপুরে। সেখান থেকেও টেলিফোন আসে।

দশ মিনিট বাদে সেই লোক দুটি চলে গেলেন। তারপরেই এল জরুরি টেলিফোন। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে যাওয়ার সময় মা হঠাৎ বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একী, এটা কার ছাতা?"

বাড়িতে আর দুটি মাত্র প্রাণী। সোনালি আর মেঘ, দুই ভাইবোন। সোনালিই বড়, তার বয়স বারো আর মেঘ তার চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট।

দু'জন এক টেবিলে বসে পড়াশোনা করে আর ঝগড়া করে মাঝে-মাঝে।

রান্নার মাসি ছুটি নিয়েছেন তিনদিন।

মা দ্বিতীয়বার বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ছাতাটা কার?"

বাবা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি তা কী করে জানব?"

তারপরই টেলিফোনের ওপাশের মানুষটিকে বললেন, "ওয়ান মিনিট প্লিজ়।"

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে মাকে বললেন, "নিশ্চয়ই ওই ভদ্রলোক দু'জন ফেলে গেছেন। ডাকো, ডাকো,

এখনও সিঁড়িতে...পৌঁছে দাও।"

কে পৌঁছে দেবে? লোক দুটি তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন, দৌড়ে গেলে ধরা যায়।

কে যাবে?

সোনালি প্রত্যেক বছর স্কুলের স্পোর্টর্সের সময় অনেক প্রাইজ পায়। লং জাম্পে প্রথম হয়েছে পর পর তিনবার। সেই তুলনায় মেঘ খেলাধুলোয় অত ভাল নয়। ছবি আঁকার দিকে তার ঝোঁক।

কিন্তু মেয়েদের যখন-তখন বাইরে পাঠানো হয় না। এইসব কাজে ছেলেদেরই যেতে হয়।

মা বললেন, "মেঘ, ছাতাটা দিয়ে আয় না।"

মেঘ অনিচ্ছার ভাব নিয়ে পড়ার টেবিল ছেড়ে উঠল। দরজার কাছে এসে বলল, "আমার চটি কোথায়?"

চটিজোড়া খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশি দেরি হলে লোক দুটিকে আর ধরা যাবে না। মা আবার তাড়া দিতেই তাকে খালি পায়েই যেতে হল।

লোক দুটি সিঁড়িতে নেই, এতক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে।

ছাতাটা হাতে নিয়ে মেঘ থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় অনেক লোক। বাবার কাছে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের তো মেঘ ভাল করে দেখেইনি। এখন চিনবে কী করে?

ছাতাটা ফেরত নিয়ে গেলে নির্ঘাত বকুনি খেতে হবে বাবার কাছে। আর দিদি হাসবে।

একটু দূরে দু'জন লোক পাশাপাশি যাচ্ছে গল্প করতে করতে। ওরা কি হতে পারে?

মেঘ ছুটে গিয়ে পিছন থেকে বলল, "এই যে, শুনছেন? আপনারা ছাতা ফেলে এসেছেন?"

লোক দুটি ঘুরে দাঁড়াল।

একজন মেঘের হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে দেখল ভাল করে। তারপর বলল, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

অন্য লোকটি শুধু বলল, "বেশ।"

তারপর দু'জনে চলে গেল রাস্তা পেরিয়ে।

মেঘ তবু দাঁড়িয়ে রইল। তার একটু খটকা লেগেছে।

ছাতা ফেরত পেয়ে লোক অবাক হয়, খুশি হয়। কিংবা ফেলে আসার জন্য লজ্জা পায়। যে ফেরত দেয়, তাকে কিছু একটা বলে।

ওরা কিছুই বলল না। তবে কি এই ছাতাটা ওদের নয়? জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, ওরাই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি না!

এখন আর ছাতাটা ফেরতও আনা যায় না। লোক দুটি অনেক দূরে চলে গেছে।

বৃষ্টির দিনে যারা ছাতা নিয়ে বেরোয়, তারা সবাই কখনও-না-কখনও ছাতা হারায়। ওই লোক দুটোরও হয়তো কখনও ছাতা হারিয়েছে, তাই এটা পেয়ে নিয়ে গেল!

যাই হোক, এখন আর কিছু করবার নেই।

উপরে উঠে এসে মেঘ দরজার বেল বাজাবার আগেই খুলে গেল দরজাটা।

মা ব্যস্তভাবে বললেন, "দিয়েছিস? তোকে আর-একবার যেতে হবে। ওরা একটা কলমও ফেলে গেছে।"

মায়ের হাতে একটা কলম। সাধারণ ডট পেন নয়, ফাউন্টেন পেন।

মেঘ বলল, "ওঁরা তো চলে গেছেন! এখন দেব কী করে?"

মা বললেন, "চলে গেছে? কত দূরে গেছে?"

মেঘকে এবার একটু বানিয়ে বলতেই হল যে, লোক দুটিকে ট্যাক্সিতে উঠে পড়তে দেখেছে সে।

বাবা এতক্ষণে টেলিফোনের কথা শেষ করে বললেন, "দেখি কলমটা।"

সেটা হাতে নিয়ে বললেন, "শস্তার জিনিস নয়, বেশ দামিই মনে হচ্ছে।"

মা বললেন, "লোক দুটো এত ট্যালা কেন? ছাতা ফেলে যায়, কলম ফেলে যায়। ওদের ঠিকানা কিংবা ফোন নাম্বার জানো?"

বাবা বললেন, "সেসব কিছুই জানি না। ওরা তো এসেছিল একটা কম্পিউটার কোম্পানি থেকে। আমার কিছু দরকার নেই, আমি ভাল করে ওদের কথাই শুনিনি।"

মা বললেন, "তা হলে কলমটা কী হবে?"

মেঘ বলল, "আমি নেব।"

বাবা বললেন, "তুই নিবি কী! যদি ওরা ফেরত নিতে



একটা ছাতা আর একটা কলম

আসে? এই কলমটা বসবার ঘরেই থাকুক।"

বসবার ঘরে যেখানে টেলিফোন থাকে, তার পাশে রেখে দেওয়া হল কলমটা। ওটার নাম হয়ে গেল, 'বাইরের লোকের কলম'।

দু'-তিনদিনের মধ্যে কলমটা নিতে কেউ এল না।

মাঝে-মাঝে এমন হয়, বাবাকে কোনও জরুরি ফোন নাম্বার লিখতে হবে, হাতের কাছে কোনও কলম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ওই বাইরের লোকের কলমটা দিয়েই লিখতে হয়।

প্রথমবারেই একটা বিপত্তি হল।

বাবা একটা বিদেশের টেলিফোন নাম্বার টুকে রাখলেন তারপর অফিস থেকে ফোন করতে গিয়ে শুনলেন, রং নাম্বার!

নিজের হাতে টুকেছেন, তবু ভুল হল কী করে? আসল নাম্বারটা আর কিছুতেই পাওয়া গেল না।

দুপুরবেলা দরজায় বেল বাজল। মা দরজা খুলে দেখলেন, পোস্টম্যান এসেছেন, একটা রেজিস্ট্রি প্যাকেট দিতে। সই করে নিতে হবে।

পোস্টম্যানের কাছেই কলম থাকে, কিন্তু সেটা দিয়ে কিছুতেই লেখা পড়ছে না। তাড়াতাড়িতে মা বাইরের লোকের কলমটা দিয়েই সই করে নিলেন।

প্যাকেটটা শক্তভাবে সেলোটেপ দিয়ে মোড়া। মা একটা ছুরি দিয়ে সেটা খুলে ফেললেন।

ভেতরে একটা কৌটো, তার মধ্যে একটা টাকা। এ আবার কে পাঠাল? কৌটোটা সাধারণ টিনের, তার মধ্যে মাত্র একটা টাকা। এটা পাঠাবার কী মানে হয়?

তাড়াতাড়ি ছেঁড়া প্যাকেটটা তুলে নিয়ে মা দেখতে গেলেন প্রেরকের নাম। এ কে দাশগুপ্ত, দুর্গাপুর। এই নামে দুর্গাপুরের কেউ চেনা নেই। তারপর নিজের নাম দেখতে গিয়ে চমকে উঠলেন।

সুপর্ণা মুখার্জি ঠিকই আছে, কিন্তু ঠিকানাটা অন্য। হিন্দুস্থান রোড নয়, হিন্দুস্থান পার্ক। তার মানে ওই রাস্তায় আর-একজন সুপর্ণা মুখার্জি আছে।

পিওন ভুল করে দিয়েছেন। কাল ফেরত দিলেই হবে।

তারপরেই মায়ের বুকটা কেঁপে উঠল। প্যাকেটটা খুলে ফেলা হয়েছে। এখন যদি পিওন কিংবা ওই সুপর্ণা মুখার্জি বলে, মোটে এক টাকা নয়, ওর মধ্যে অনেক টাকা ছিল!

অন্য লোকরা শুনলেও সেই কথাই ভাববে। এক টাকা কেউ কখনও পাঠায়? তারা মাকে বলবে মিথ্যেবাদী কিংবা চোর!

বিকেলবেলা বাবাকে ভয়ে-ভয়ে ঘটনাটা জানাবার পর বাবাও প্রথমে অবাক হলেন। কৌটোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। সেটার কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। সেটার কোনও দামই নেই। শুধু এক টাকা!

তারপর বাবা বললেন, "এটা কোনও গোপন সঙ্কেত হতে পারে! চোরাকারবারিরা অনেক সময় এইভাবে খবর পাঠায়। তুমি ভাল করে দেখে নাওনি কেন?"

মা বললেন, "নামটা ঠিকই আছে। লোকে তো সেটাই দেখে। পিওনটা এত তাড়া দিতে লাগল। ওরই তো দোষ।"

বাবা বললেন, "ওর খানিকটা দোষ আছে বটে। কিন্তু দায়িত্বটা তোমার ওপরেই পড়বে।"

মা বললেন, "ওই কলমটাই অপয়া। পিওনের কাছে একটা বাজে কলম ছিল, সেটা দিয়ে লিখতে গিয়েই..."

বাবা বললেন, "কলম কখনও অপয়া হয়? নিজেরা সাবধান হলে..."

সোনালি বলল, "বাবা, কলমটা আমি নিয়ে নিই?"

মেঘ বলল, "আমি আগে চেয়েছি। কেউ তো নিতে আসেনি।"

বাবা সোনালিকেই বেশি ভালবাসেন। তিনি মেঘকে বললেন, "তুই হারিয়ে ফেলবি। দিদিই এটা ব্যবহার করুক।"

পরদিন ইস্কুল থেকে ফিরে সোনালি বলল, "এই কলমটা সত্যি অপয়া। এটা আমার চাই না।"

মা বললেন, "কী হল?"

সোনালি বলল, "আজ আমার হিস্ট্রির ক্লাস টেস্ট ছিল। কত পেয়েছি জানো? জিরো। সব সাল-তারিখ ভুল। অথচ সব আমার মুখস্থ। কী করে ভুল হল? মা, তোমার পিওন এসেছিল আজ?"

মা বললেন, "না। উঃ, কী দুশ্চিন্তাই যে হচ্ছে। কী যে জবাব দেব!"

বাবা রাত্তিরবেলা ফিরে সোনালির পরীক্ষার কথা শুনে বললেন, "একবার যখন মনের মধ্যে ঢুকে গেছে যে, কলমটা অপয়া, তখন ওটা দিয়ে আর না লেখাই ভাল। মনই তো আসল।"

পরদিন সকালে শুরু হল ঝড় আর বৃষ্টি।

তারই মধ্যে একজন লোক এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

প্যান্টের উপর পাঞ্জাবি পরা, মাথায় বড় বড় চুল। বাবা প্রথমে লোকটিকে চিনতে পারলেন না।

লোকটি বিনীতভাবে নমস্কার করে বলল, "স্যার, আমাকে বোধ হয় আপনার মনে নেই। কয়েকদিন আগে আমি একটা কম্পিউটার কোম্পানি থেকে এসেছিলাম।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু সেদিনই তো বলেছি, আমার এখন কিছু দরকার নেই। দু'মাস আগেই নতুন কিনেছি।"

লোকটি বললেন, "তা জানি। আজ আপনাকে আমি বিরক্ত করতে আসিনি। আসলে সেদিন আপনার এখানে আমি কি আমার ছাতাটা ফেলে গেছি? মানে ছাতাটা আমার নিজের নয়, আমার কাকার। হাতলটা আসল রুপোর।"

বাবা বললেন, "ছাতা? ছাতা আপনি ফেরত পাননি?"

লোকটি বলল, "না তো স্যার!"

বাবা বললেন, "সে কী! মেঘ, মেঘ, এদিকে আয় তো।"

পড়ার টেবিল থেকে উঠে এল মেঘ। লোকটির কথা শুনে তার মুখটা শুকিয়ে গেল। ছাতাটা যে নিয়েছে, সে অন্য লোক।

তাকে সত্যি কথাটা বলতেই হল।

বাবা একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "ওর কোনও দোষ নেই। যেতে একটু দেরি হয়েছিল, ও তো আপনাকে চেনেও না। অন্য একজন যদি নিজের বলে নিয়ে নেয়, ও কী করবে? ঠিক আছে, আপনার ছাতাটার কত দাম হবে বলুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

লোকটি জিভ কেটে বলল, "না, না, স্যার। আপনি কেন দাম দেবেন? ছাতাটা ফেলে যাওয়া তো আমারই ভুল। অন্য কোথাও ফেলে যেতে পারতাম।"

বাবা বললেন, "তবু আপনার ক্ষতি তো হয়েছে। রুপো বাঁধানো ছাতা।"

লোকটি বলল, " না, স্যার, দাম আমি নিতে পারব না। আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না।"

বাবা বললেন, "এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কী করে? আমার বাড়ি থেকে অন্য একটা ছাতা নিয়ে যান। রুপো বাঁধানো হবে না, তবে বৃষ্টি আটকানো যাবে।"

লোকটি তাও নিতে চায় না।

বাবা জোর করেই নিজের ছাতাটা ওকে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "ও, ভাল কথা, শুধু ছাতা কেন, আপনি তো একটা পেনও ফেলে গিয়েছিলেন। এই নিন।"

লোকটি বলল, "ও কলম তো আমার নয়।"

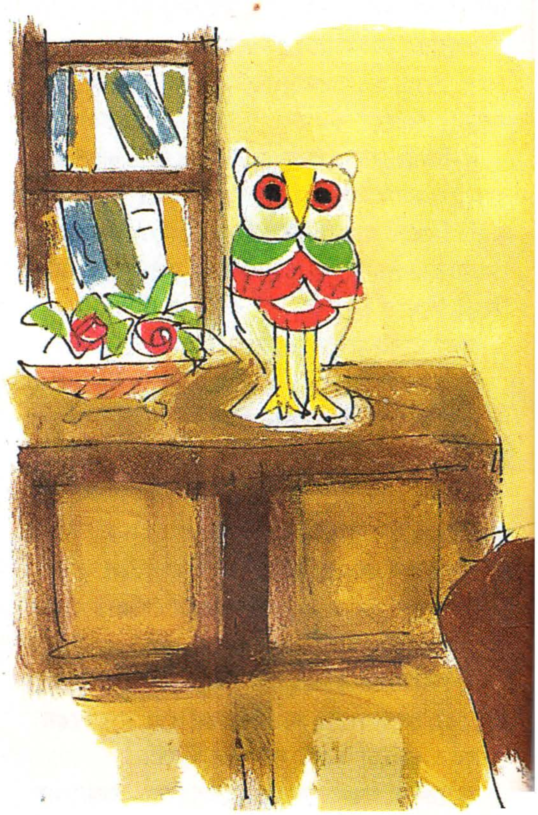
বাবা বললেন, "আপনার সঙ্গে তো আর-একজন লোক ছিল। নিশ্চয়ই তার। নিয়ে যান, তাকে দিয়ে দেবেন।"

লোকটি বলল, "কলমটা আমার বন্ধুরও নয়। আমরা যখন এখানে এসেছিলাম, তখনই এই কলমটা সোফার উপর পড়ে থাকতে দেখেছি।"

বাবা বললেন, "তা হলে এটা আবার কার?"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি জোর করছেন তাই নিয়ে যাচ্ছি। কাল ফেরত দিয়ে যাব। আপনার ছাতা নেওয়াটা আমার পক্ষে অন্যায় হবে।"

বাবা বললেন, "আপনার কলম লাগবে? এটা নিতে



পারেন।"

লোকটি বলল, "না স্যার, আমার কলম লাগবে না।"

লোকটি নমস্কার করে চলে গেল।

বাবা বললেন, "ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে। আসল ছাতাটা তো অন্য লোক নিয়ে গেল, কলমটা তো নিল না।"

মা বললেন, "এ কলমটা তুমি বিদায় করো। এমনিতেই আমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।"

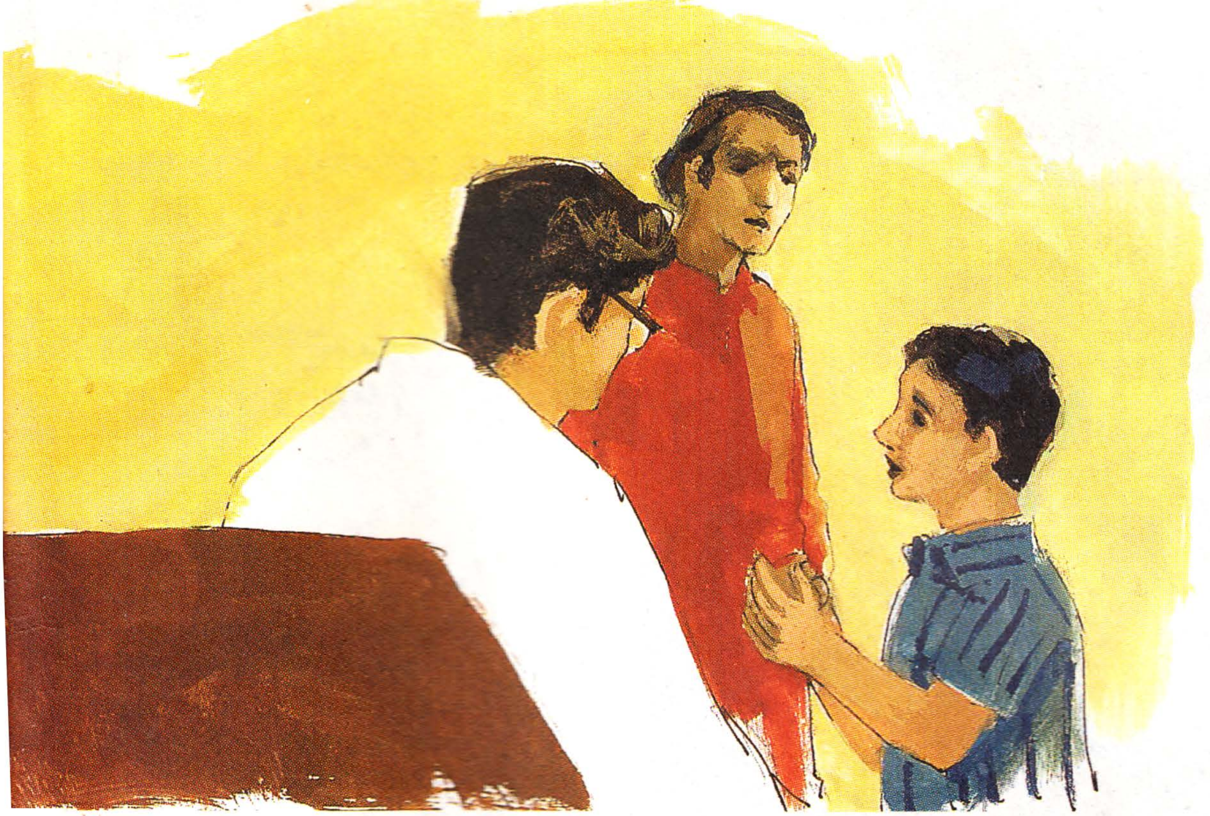
বাবা বললেন, "কী করে বিদায় করব? একটা দামি কলম তো জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলা যায় না!"

মা বললেন, "কেন যাবে না? দাও, আমি ফেলে দিচ্ছি।"

বাবা বললেন, "যায়, রাস্তায় কারও-না-কারও গায়ে লাগবে। কোনও গরিব-টরিবের কাজে লাগবে। মেঘ, তুই বরং পাশের বসতিটার সামনে ফেলে রেখে আয় চুপিচুপি। যে পাবে, সে পাবে, সে ব্যবহার করবে।"

কলমটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল মেঘ। অপয়া কলম! তার মনে হল যেন কলমটার মধ্যে কিছু একটা শব্দ হচ্ছে। কানের কাছে নিয়ে গিয়ে শোনবার চেষ্টা করল।

কলমটা নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছে করে ফেলে গেছে তাদের বাড়িতে। সবাইকে বিপদে ফেলার জন্য।



বসতি পর্যন্ত যাওয়ার দরকার কী? রাস্তায় যে-কোনও জায়গায় ফেলে গেলেই তো হয়। বৃষ্টি থেমে গেছে এর মধ্যে।

দুটি ছেলে হেঁটে যাচ্ছে পাশাপাশি। কলেজের ছেলেদের মতো বয়স। মেঘের একটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হল।

সে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের কি কলম হারিয়েছে? আমি একটা কলম পেয়েছি।"

একটি ছেলে বলল, "কই, দেখি, দেখি।"

অন্য ছেলেটি বলল, "আরে এই তো সেই কলমটা। তুমি কোথায় পেলে ভাই?"

মেঘ বলল, "আমাদের বাড়ির দরজার সামনে পড়ে ছিল।"

দ্বিতীয় ছেলেটি বলল, "কাল এখানে দাঁড়িয়ে একটা ঠিকানা লিখছিলাম, তখনই বোধ হয় অন্যমনস্কভাবে..."

প্রথম ছেলেটি বলল, "বেশ দামি পেন!"

দ্বিতীয় ছেলেটি মেঘের পিঠ চাপড়ে বলল, "তুমি আমার খুব উপকার করলে ভাই। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। এটা আমার মা আমাকে দিয়েছেন।"

বোঝাই গেল ওরা মিথ্যে কথা বলছে। কলমটা মেঘদের বাড়িতে আছে তিন-চারদিন। ওরা বলল, " কাল ফেলে গেছে, তাও দরজার কাছে।"

এই অপয়া কলমে ওদের মিথ্যে কথা বলার দাম দিতে হবে। বুঝবে ঠ্যালা।

উপরে উঠে আসার পর মা বললেন, "আপদ দূর করে দিয়েছিস তো? উফ। আমার ধারণা পিওনটা আর আসবে না।"

সোনালি বলল, "পিওন ভদ্রলোক যে ঠিকানা ভুল করেছেন, তা বোধ হয় নিজেই জানেন না। তুমি আর ও নিয়ে চিন্তা কোরো না মা।"

বেজে উঠল দরজার বেল।

আবার কে এল, পোস্টম্যান নাকি!

মেঘ দরজা খুলে দিতেই দেখল, তার ছোটমামা। খুব ভাল ছাত্র। সবেমাত্র ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

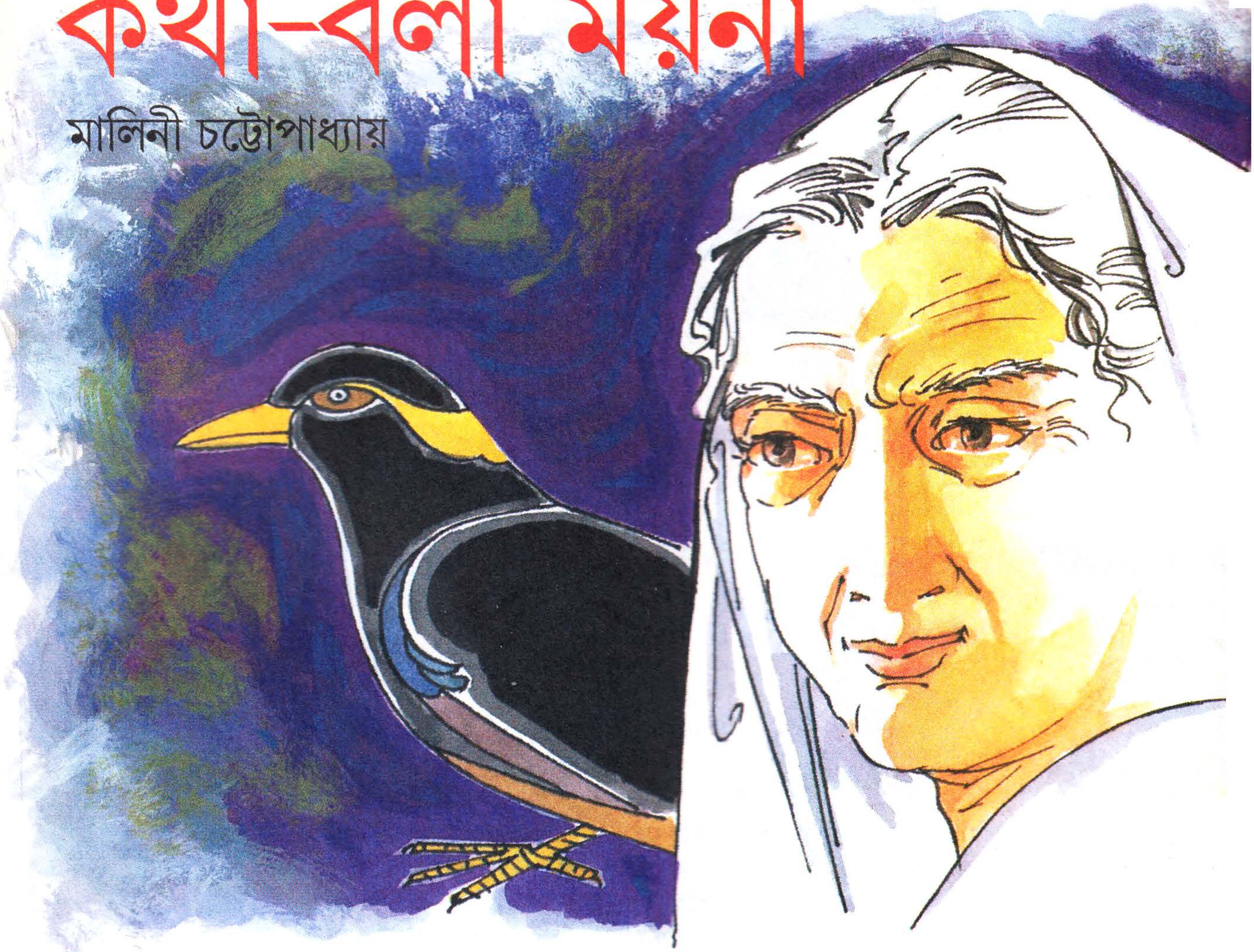
ঘরে ঢুকেই বললেন, "দিদি, আমাকে চায়ের সঙ্গে ওমলেট খাওয়াও। কেমন আছিস মেঘু? সোনালিটা ধাঁ ধাঁ করে লম্বা হচ্ছে।"

তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, "তড়িৎদা, আপনার এখানে ক'দিন আগে একটা পেন ফেলে গেছি? ওটা আমার খুব পয়া কলম। ওই কলম দিয়ে লিখে এবারে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি। এইখানেই কোথাও আছে। খুঁজে দেখুন তো।"

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

কথা-বলা ময়না

মালিনী চট্টোপাধ্যায়



যাওয়ার আগে সোমনাথ বলল, "দোরটা লাগিয়ে দিও পিসি, কাল চৌধুরীবাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।"

পিসি খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে চলে যেতে দেখলেন। আজ সারাগ্রাম জমজমাট। অনেক দূর থেকে লোক আসছে মেলা দেখতে। পিসির ঘর ফাঁকা, ছেলেমেয়ে কেউ একজন কিংবা নাতি-নাতনিরাও যদি আসত! পিসি জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন।

সেদিন রাত্রে পিসি বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। পিসেমশাই এসে বলছেন, "কষ্ট পাচ্ছ কেন? তোমার জন্য যা করার আমি করে রেখে এসেছি। চৌকির তলায় কাঠের বাক্সটা একবার খুলে দ্যাখো।"

পিসির ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙেও অনেকক্ষণ শুয়ে রইলেন তিনি। তারপর আলো জ্বেলে চৌকির তলা থেকে বাক্সটা নিয়ে খুলতেই সেটা থেকে বার হল একটা প্লাস্টিকের ময়না পাখি, একটা বাচ্চাদের খেলার ঝুমঝুমি, আর একটা বটুয়া। খুলে দেখলেন, একটা নয়া পয়সাও নেই বটুয়াটায়।

পিসি চুপচাপ বসে রইলেন মেঝের উপর। পিসেমশাই এমনিই ছিলেন। তা না হলে সারাজীবন টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে রাজ্যের আবর্জনা জমা করেন ঘরে? ভেবেছেন হয়তো পিসির সময় কাটে না, ওই ময়না নিয়ে খেলে সময় কাটাবেন। পিসি একটা থলেয় ভরে জিনিসগুলো জানলার পাশে একটা পেরেকে টাঙিয়ে শুয়ে পড়লেন। শেষরাতে আবার স্বপ্ন দেখলেন পিসি। পিসেমশাই বলছেন, "আমার কথায় কান দিলে না তুমি? হেলাফেলা করে রেখে দিলে জিনিসগুলো। ওর একটা জিনিসও সাধারণ নয়।"

পিসি বলতে গেলেন, 'ঝুমঝুমি নিয়ে খেলার বয়স কি আমার আছে আর?' কিন্তু তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল তার পরদিন। সোমনাথ ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, ওর মাথায় লেগে বেজে উঠল থলির ভিতরে রাখা ঝুমঝুমিটা। সঙ্গে সঙ্গে পিসি শুনলেন, কে যেন বলছে, "পিসি গো! চিন্তা নেই।"

পিসি চমকে উঠলেন, কে বলল কথাটা? চারদিকে দেখলেন, কেউ নেই ঘরে। সোমনাথের মুখ দেখেই



বুঝতে পারলেন, ও কিছু শুনতে পায়নি। না, সত্যিই তাঁর বয়স হয়েছে, একেই বোধ হয় বুদ্ধিনাশ বলে। কিন্তু দিন সাতেক পরে আবার একই ঘটনা। পিসি হতভম্ব হয়ে গেলেন। আওয়াজটা আসছে থলির ভিতর থেকে। পিসি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন থলিটার দিকে, বারবার পিসেমশাই বলছেন, কেন ও বাক্সের ওই জিনিসগুলো অমূল্য?

সোমনাথ চলে যেতে পিসি একটা-একটা করে বার করলেন জিনিসগুলো। সাজিয়ে রাখলেন তাকে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে মারলেন ঝুমঝুমিটায় এক গুঁতো। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, "একটা গল্প শুনবে? একটা গল্প?" ঝুমঝুমিটা বাজলে ময়না কথা বলে। পিসি মেঝেতে নুয়ে পড়ে প্রণাম করলেন জিনিসগুলোকে।

পরদিন ট্যামবুড়ো এল। পিসির পুকুরটা লিজ নিয়েছে ট্যামবুড়ো, বছরে একবার এসে টাকা দিয়ে যায়। বারোশো টাকা পিসিকে দিয়ে ট্যামবুড়ো বেরিয়ে যাচ্ছে, পিসি পরিষ্কার শুনতে পেলেন, ময়না বলছে, 'সাবধান! আগুন! আগুন!' ট্যামবুড়ো আপনমনে বেরিয়ে গেল। সে কিছু শুনতে পায়নি। চলে যেতে পিসি ময়নাকে বললেন, "চেঁচাচ্ছিলি কেন?"

ময়না চুপ। ঝুমঝুমি না বাজলে আর সে কথা বলবে না। পিসি রান্না করতে চলে গেলেন।

দু'দিন পর ভোরে পিসির ঘুম ভেঙে গেল একটানা বুকফাটা কান্নার আওয়াজে। দরজা খুলে দেখলেন রাস্তায় অনেক লোক জমেছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কী হয়েছে গো? কে কাঁদছে?"

বোসেদের মেজোছেলে বলল, "কালরাতে ট্যামবুড়োর ঘরে আগুন লেগে গিয়েছিল। আর সবাই বেরিয়ে আসে, শুধু ট্যামবুড়ো আর কাজের লোকটা বেরিয়ে আসতে পারেনি। মারা গেছে।"

পিসি চমকে উঠলেন, দু'দিন আগে ট্যামবুড়ো চলে যাওয়ার সময় ময়না বলে উঠেছিল, 'সাবধান! আগুন!' ঝুমঝুমি বাজেনি, তবু বলে উঠেছিল ময়না। ময়না কি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়?

মাস তিনেকের মধ্যে এ-প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন

পিসি। এই তিন মাসে বার-পঁচিশেক ঝুমঝুমি না বাজতেই কথা বলে উঠেছে ময়না। প্রথম দু'বার পিসি কী করবেন বুঝতে পারেননি। তারপর থেকে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। ময়না কারও সম্পর্কে কিছু বললেই, তাকে গিয়ে পিসি বলে আসেন, 'বাবা, কাল যেন তুমি মাছ ধরতে যেও না। জলে তোমার ফাঁড়া আছে।' কিংবা 'ওখানে মেয়ের বিয়ে দিও না বাবা, ওরা লোক ভাল নয়। ছ'মাসের মধ্যে খুব ভাল বিয়ে হবে মেয়ের, তুমি দেখো।'

প্রথম প্রথম লোক গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু দু'-একটা ঘটনার পরই চমকে উঠেছে গাঁয়ের লোক, গাঁয়ে এখন পিসিকে সবাই সমীহ করে। এমনকী কোনও কাজ করার আগে পিসির অনুমতি নিয়ে যায়, সবাই বলে এত বড় জ্যোতিষী এ-তল্লাটে আগে আসেনি।

সেদিন দুপুরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ঠিক তাঁর বাড়ির সামনে। ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ফরসা সুদর্শন এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে সোজা এগিয়ে এসে প্রণাম করল পিসিকে। পিসি অবাক হয়ে বললেন, "তুমি কে বাবা?"

"আমি খুব সামান্য লোক। নাম বললে চিনতে পারবেন না। তবে আমার বাবা এ-অঞ্চলের একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন, আকাশরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।"

আকাশরঞ্জন! যার টাকাপয়সার সীমা পরিসীমা ছিল না, সেই আকাশরঞ্জন! পিসি চমকে উঠলেন। তাঁর ছেলে আশিসরঞ্জনেরও তো পরোপকারী বলে খুব সুনাম। এই তা হলে সেই আশিসরঞ্জন!

পিসি বললেন, "এসো বাবা, ঘরে এসো। কত নাম শুনেছি তোমার। দীনদুঃখীরা তোমায় নিত্য আশীর্বাদ করে। আজ দেখে চোখ সার্থক হল।"

ছেলেটি বলল, "ওকথা বলবেন না পিসি, আমি অতি সাধারণ লোক। নিজে সাধারণ বলেই হয়তো যাঁরা অসাধারণ, তাঁদের সঙ্গ আমার এত ভাল লাগে। কতদিন ধরে আপনার কথা শুনে আসছি, এবার একবার আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিতে হবে। আপনারা গুণী মানুষ। আমার মতো লোকের সংস্পর্শে থাকা হয়তো আপনার মনে হবে সময় নষ্ট। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমি যাতে আপনার কোনও অসুবিধা না হয়। ক'টা দিন আমার ওখানে কাটিয়ে আসুন।"

পিসির চোখে জল এসে গেল, "এভাবে তো আমাকে কেউ বলেনি বাবা কোনওদিন। যাব বইকী বাবা।"

"আপনি আমাকে বাঁচালেন পিসি। কালই সকালে গাড়ি পাঠিয়ে দেব তা হলে?"

"গাড়ি লাগবে না বাবা, এটুকু পথ আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

"না-না, হেঁটে যাবেন কেন? আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন, গাড়ি এসে নিয়ে যাবে।"

আরও কিছুক্ষণ বসে আশিসরঞ্জন চলে গেল। সোমনাথ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। বেরিয়ে যেতেই ছুটে এল, "পিসি গো! কাল ওদের বাড়িতে খাব। ওরা যে কী বড়লোক গো! কতরকম খাবার! বিরিয়ানি, পটল পোস্ত, থোড়-ছেঁচকি, ও পিসি, স্বপ্ন নয় তো?"

পিসি বললেন, "কী সবসময় খাওয়া-খাওয়া করিস সোমনাথ, আমার ভাল লাগে না।"

"লাগবে গো পিসি। কালই তোমাকে নিতাই কোবরেজের ওষুধ এনে দেব, আমার জেঠিমার তো ওই হয়েছিল, খাওয়ার নাম শুনতে পারে না, এত অরুচি। শেষে নিতাই কোবরেজের ওষুধ খেয়ে সারল।"

পিসি হাসলেন, না, এর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।

পরদিন সকালেই একটা লাল রঙের মারুতিতে চেপে ওরা পৌঁছল আশিসরঞ্জনের প্রকাণ্ড বাড়িতে, আশিসরঞ্জন ওদের দেখে এগিয়ে এল। ঘুরে ঘুরে সব দেখাল। "এ-বাড়ি আমার বাবার করা। এটা বৈঠকখানা, তার পাশে গেস্ট এলে থাকার ঘর, অবশ্য এখন আমি তিনতলাটা ছাড়া বাকি সবগুলোই ছেড়ে দিয়েছি অতিথিদের। এর পাশে লাইব্রেরি, বাবার খুব পড়ার শখ ছিল কিনা। তার পাশে..."

পিসির মাথা ঝিমঝিম করছিল, একতলাতেই চোদ্দটা ঘর! আশিসরঞ্জন দোতলার একটা বিশাল ঘরে এসে থামল, "এই ঘরটায় আপনারা থাকবেন। এখন বিশ্রাম করুন। আপনার মতো আরও কয়েকজন গুণী মানুষ এ-বাড়িতেই স্থায়ীভাবে রয়েছেন, পরে আলাপ করিয়ে দেব।"

দুপুরে খাওয়ার সময় বোঝা গেল কেন আশিসরঞ্জন দোতলা-তিনতলার সমস্ত ঘর অতিথিদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। জনা-পঁচিশেক লোকের সঙ্গে একে-একে আলাপ করিয়ে দিল আশিসরঞ্জন, "ইনি জ্যোতিষসম্রাট মুক্তানন্দ পাণিগ্রাহী, ইনি বিজ্ঞানী অবিনশ্বর রায়চৌধুরী, ইনি..." প্রত্যেকেরই মোটাসোটা চেহারা, দেখে মনে হচ্ছে ঘুম থেকে তুলে তাঁদের খেতে বসানো হয়েছে।

বিকেলে আশিসরঞ্জন বলল, "বাগানে ঘুরবেন চলুন পিসি।"

বাড়ির পিছনে বিশাল দিঘি। একজোড়া অশ্বত্থগাছ দাঁড়িয়ে আছে দিঘির কোল ঘেঁসে, সেইজন্যই হয়তো এ-দিঘির নাম জোড়া-অশ্বত্থদিঘি। পুকুরের ধার ঘেঁসে সারি সারি আম-কাঁঠালের বাগান, একধারে শিবমন্দির। ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধে হয়ে এল।

আশিসরঞ্জন বলল, "এরকম আরও পাঁচটা পুকুর আছে বাবার, মজার ব্যাপার কী জানেন? মৃত্যুর আগে



কথা-বলা ময়না

বাবা আমাকে বলে যান, 'আমি তোর জন্য এমন সম্পদ রেখে গেলাম, যার কাছে এসব তুচ্ছ। কোথায় আছে সে সম্পদ আমি বলব না, পারলে তুই-ই খুঁজে বার করিস।"

তারা শিবমন্দিরের সামনে এসে বসল। আশিসরঞ্জন বলল, "কিছুই যেন ভাল লাগে না পিসি, আরও বেশি সম্পত্তির লোভ আমার নেই। কিন্তু বাবা আমার জন্য এক অমূল্য সম্পদ রেখে গেলেন, অথচ আমি তাঁর এমন অযোগ্য ছেলে যে, আজও তার কিছুই বুঝতে পারলাম না, ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। এখানে এই যে এত গুণী মানুষ, সবাই চেষ্টা করেছেন এ-রহস্য উদ্ধারের। কিন্তু পারলেন কই? আপনি তো ভবিষৎদ্রষ্টা, আপনি পারেন না বলতে কী সেই সম্পদ?"

পিসির মন খারাপ হয়ে গেল।

ঘরে ফিরে সোমনাথ বলল, "এইজন্য তা হলে তোমার এত কদর? সব ধান্দা।"

পিসি বললেন, "খবরদার ওকথা বলিস না, ও যদি স্বার্থ নিয়েই চলত তা হলে এই যে এত মানুষ কিছুই করতে পারেননি এতদিন ধরে, তাঁদের কদর তো কমেনি।"

রাতে শুয়ে পিসি ভাবলেন, সবই তো দেখা হল বাগানে ঘুরে-ঘুরে। কিছুই তো নজরে পড়ল না। ভাবতে ভাবতেই পিসি চমকে উঠলেন। ময়না বলছে:

'বয়স তোমার অনেক হল, আজও জানো না?
দিনের হিসেব রাত্রিবেলা আদৌ মেলে না।
মৃত গদাই আজও প্রভুর ঋণ চুকোতে মত্ত
দিঘির ধারে মায়াবী রাত, অতীত হয় জীবন্ত।'

গভীর রাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন পিসি। দিঘির ধারে বসলেন। তাঁর মনে হল হাজার হাজার বছর আগে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁরা কেউ যাননি এ পৃথিবী ছেড়ে। পুরনো সংসার এখানে, প্রিয়জন এখানে, একে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবলেই ব্যথায় ভরে যায় মন। রাত আশ্রয় দেয় সবাইকে তাই। আশ্চর্য রাত! অতীত-বর্তমান একাকার হয়ে যায়। দিঘির ধারের বাতাস কী শীতল। আহা! ওই বাতাসের সঙ্গে যদি ভুঁইচাঁপার গন্ধ ভেসে আসত! পিসি প্রাণভরে নিশ্বাস নিলেন, আরে! ভুঁইচাঁপার গন্ধই তো ভেসে আসছে। তিনি এতক্ষণ টেরই পাননি। বাবা তাঁর বেহালা বাজিয়ে গান করতেন, এমনই কত রাত তাঁর কেটেছে ভুঁইচাঁপার গন্ধে ভরা উঠোনে বসে বাবার বাজনা শুনে। একবারও যদি ফিরে আসত সে রাত। চমকে উঠলেন পিসি, কাছেই কে যেন বেহালা বাজাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকালেন, ছোটখাটো চেহারার একটা আবছা মূর্তি মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। কী যেন বলেছিল ময়না? 'মৃত গদাই আজও প্রভুর ঋণ চুকোতে মত্ত।' তিনি ভাবলেন, ইস সেই যে ছেলেবেলায় গল্প পড়েছিলাম, দুটো ছেলে একজোড়া জুতো পেয়েছিল, যা পরে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। মুহূর্তের মধ্যে পিসি দেখলেন তাঁর সামনে একজোড়া জুতো, এই তা হলে আশিসরঞ্জনের বাগানের রহস্য। উত্তেজনায় সারারাত তাঁর ঘুম এল না। ভোরে আশিসরঞ্জনকে গিয়ে বলল, "গদাই কে বাবা?"

আশিসরঞ্জন একটু ভেবে বলল, "বাবার এক পুরনো কর্মচারী ছিল, কিন্তু সে তো আর বেঁচে নেই। বাবার মৃত্যুর অনেক আগেই মারা গেছে। তার একমাত্র ছেলের একবার ভয়ানক অসুখ হয়। বাবা অনেক টাকা খরচ করে বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে সারে। গদাই সেকথা ভোলেনি। যতদিন বেঁচে ছিল মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের সেবা করেছে।"

"আজও সে তোমাদের সেবা করে চলেছে আশিস? দিঘির ধারে গিয়ে যা চাইবে তাই পাবে তার কাছে। তবু আমার মনে হয় তোমার বাবা যে বলেছিলেন, এমন সম্পদ রেখে গেলেন যার কাছে সব তুচ্ছ, তার কারণ ওর কাছে যা চাইবে তাই পাবে বলে নয়, যে লোক তোমার বাবার সেবা করেও থামেনি, তার বংশধরদের সেবা করে চলেছে মৃত্যুর পরও, তেমন মানুষের বন্ধুত্বের চেয়ে বড় সম্পদ আর কী আছে বলো?"

আশিসরঞ্জন যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল, পিসি থামালেন, "এখন তার দেখা পাবে না আশিস, পাবে রাতে। দিন আমাদের অনেক দেয়, রাতও কম দেয় না।"

"এভাবে তো ভাবিনি কোনওদিন পিসি।"

"আমিই কি ভেবেছি আগে? আজ মনে হচ্ছে এ-পৃথিবীর সবই অমূল্য। এই দ্যাখো না, বুড়ো মানুষ রাস্তায় বেরোলে ছেলে-ছোকরারা মজা করে, প্রশ্নেরও উত্তর দেয় না কতজন, তাই বলে বার্ধক্য কি কম সুখের?"

দু'দিন পরই পিসি বললেন, "এবার আমার বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা করো আশিস। তোমার এখানে খুব ভাল রইলাম। কিন্তু ও যে আমার শ্বশুরের ভিটে, ওকে ছেড়ে থাকতে বেশিদিন মন চায় না যে।" বলতে বলতে পিসির গলা ধরে এল। কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ঢাকা তাঁর সেই ছোট্ট ঘর। তাঁর দুই ছেলেমেয়ের সেই প্রথম হামা দিতে শেখা। ও বাড়ি ছেড়ে পিসি কি থাকতে পারেন বেশিদিন?

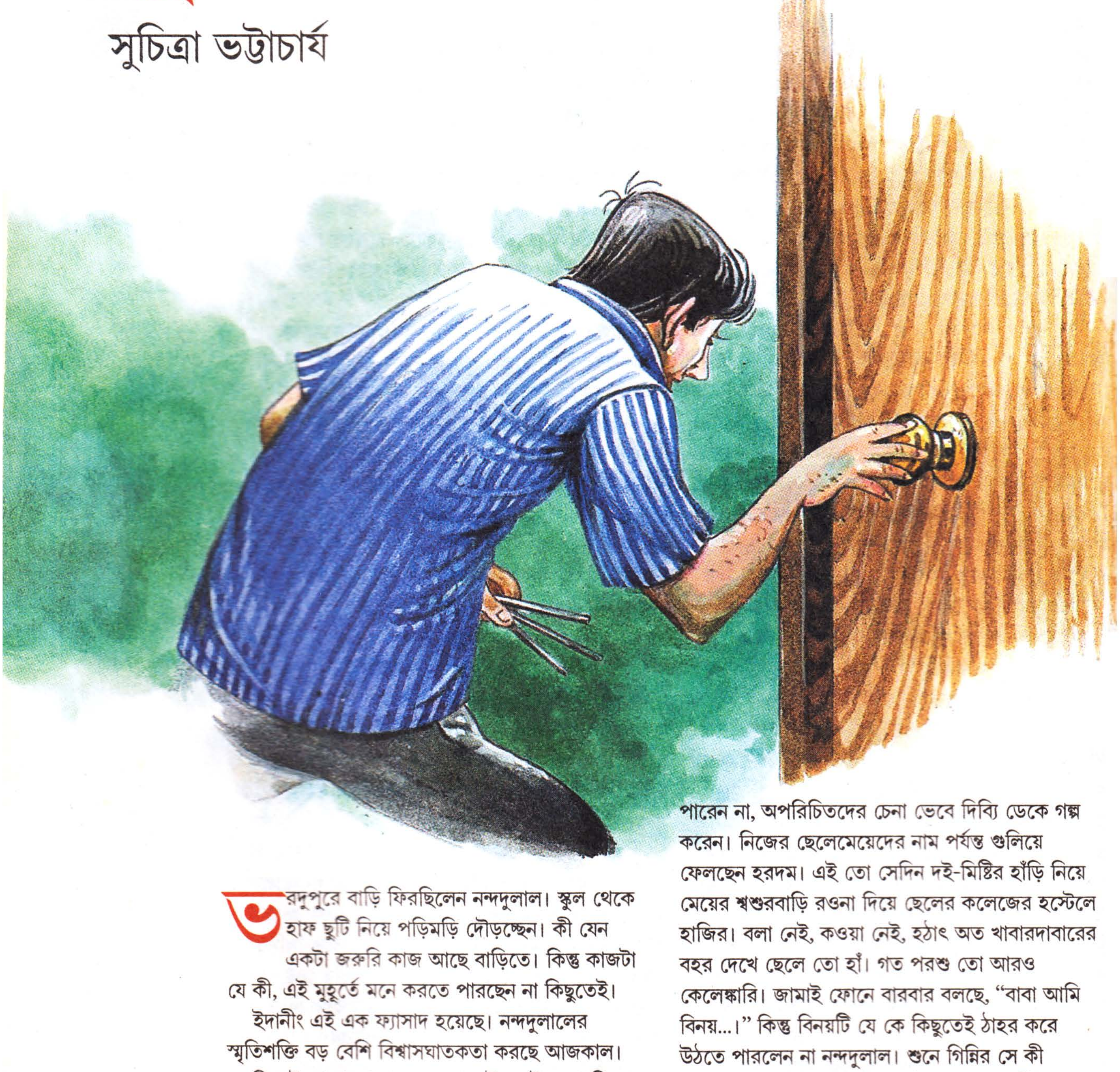
বাড়ি ফিরে এলেও আশিসরঞ্জনের কথা মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে পিসির। ময়না বলে ওঠে, "একটা গল্প শুনবে, একটা গল্প?"

ময়নার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন পিসি।

ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

ভুলের মাশুল

সুচিত্রা ভট্টাচার্য



ভরদুপুরে বাড়ি ফিরছিলেন নন্দদুলাল। স্কুল থেকে হাফ ছুটি নিয়ে পড়িমড়ি দৌড়চ্ছেন। কী যেন একটা জরুরি কাজ আছে বাড়িতে। কিন্তু কাজটা যে কী, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছেন না কিছুতেই।

ইদানীং এই এক ফ্যাসাদ হয়েছে। নন্দদুলালের স্মৃতিশক্তি বড় বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করছে আজকাল। এমনিতেই আলাভোলা বলে বরাবরই একটা অখ্যাতি আছে তাঁর। সেভেনের অ্যালজেব্রা ক্লাসে বেমালুম টেনের জিওমেট্রির কঠিন কঠিন এক্সট্রা কষাতেন, চাল আনতে বললে চালতা আনতেন বাজার থেকে কিংবা তেঁতুলের বদলে তেজপাতা। তবে সম্প্রতি বিস্মরণের অসুখটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে পরিচিতদের চিনতে পারেন না, অপরিচিতদের চেনা ভেবে দিব্যি ডেকে গল্প করেন। নিজের ছেলেমেয়েদের নাম পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলছেন হরদম। এই তো সেদিন দই-মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি রওনা দিয়ে ছেলের কলেজের হস্টেলে হাজির। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ অত খাবারদাবারের বহর দেখে ছেলে তো হাঁ। গত পরশু তো আরও কেলেঙ্কারি। জামাই ফোনে বারবার বলছে, "বাবা আমি বিনয়...।" কিন্তু বিনয়টি যে কে কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারলেন না নন্দদুলাল। শুনে গিন্নির সে কী হাউমাউ, "ছি ছি, জামাইকে আমি মুখ দেখাব কী করে!"

তা মনে না পড়লে কী করবেন নন্দদুলাল? কী-ই বা করতে পারেন? আজও তো কত কষ্ট করে দরকারি কাজটাকে গেঁথে রেখেছিলেন মগজে, স্কুলেও বারকতক ঝালিয়ে নিয়েছেন, অথচ ফ্ল্যাটবাড়ির গেটে পৌঁছনোর আগেই মস্তিষ্ক বেবাক ফরসা।

চৈত্র মাস। ঠা-ঠা রোদ্দুর। রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে নন্দদুলাল ঝুম দাঁড়িয়ে রইলেন একটুক্ষণ। আর-একবার খোঁচালেন মগজটাকে। গিন্নি আজ বাপের বাড়ি গেছেন, ফ্ল্যাট পাহারা দেওয়ার কথা ছিল কি? উঁহু, অন্য কিছু। অন্য কোনও কাজ।

গোল্লায় যাওয়া স্মৃতিশক্তিটাকে মনে মনে গাল পাড়তে পাড়তে গেট ঠেলে কম্পাউন্ডে ঢুকলেন নন্দদুলাল। কপালে ইয়া মোটা মোটা ভাঁজ ফেলে সিঁড়ি ভাঙছেন। চারতলায় পা রেখেই থমকে গেলেন আচমকা। তাঁদের ফ্ল্যাটের দরজায় কে ও?

বছর পঁচিশেকের এক যুবক ঝুঁকে কী যেন করছিল দরজায়। লিকলিকে রোগা মধুকুলকুলি আমের মতো মুখ, পরনে কুচকুচে কালো ফুলপ্যান্ট, ক্যাটকেটে সবুজ টিশার্ট। হাতে নানান মাপের স্ক্রুডাইভার।

মানুষের সাড়া পেয়ে চমকে ফিরল ছেলেটা। হাত পিছনে করে যন্ত্রপাতি লুকোচ্ছে।

কীমাশ্চর্যম! সঙ্গে-সঙ্গে নন্দদুলালেরও মনে পড়ে গেল আজ টিভির মেকানিক আসার কথা ছিল বটে। পাছে লোকটা ফিরে যায় তাই তাঁকে একটু চটপট আসতে বলেছিলেন গিন্নি।



নন্দদুলালের মুখে হাসি উপচে পড়ল, "ও, তুমি তা হলে এসে গেছ?"

ছেলেটা কেমন যেন সিঁটিয়ে গেছে। আমতা আমতা করে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ...না...মানে..."

"মানে আমি বুঝে গেছি। কেউ নেই দেখে নিজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ছিলে!" নন্দদুলালের স্বরে শিক্ষকের সুর, "তোমরা, এখনকার ছেলেরা কী বলো তো? একটু অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই?"

ছেলেটা অধোবদন। ঢোক গিলছে, "অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। এবারকার মতো মাপ করে দিন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরকমটা আর কোনও বাড়িতে গিয়ে কোরো না। স্ক্রুডাইভার দিয়ে খোঁচালে দরজার লক নষ্ট হয়ে যায়।" বলেই পকেট থেকে চাবি বের করে দিলেন নন্দদুলাল, "নাও খোলো।"

ছেলেটা চাবিতে মোটেই উৎসাহী নয়, তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। হঠাৎই সুড়ুত করে ধাঁ মারার চেষ্টা করল। ওমনিই নন্দদুলাল খপ করে তার কব্জি চেপে ধরেছেন। কড়া গলায় বললেন, "কাজ না সেরে কেটে পড়ছ যে বড়?"

"আজকের মতো ছেড়ে দিন স্যার," ছেলেটার মুখ কাঁদোকাঁদো, "দয়া করুন স্যার।"

"সিন ক্রিয়েট করছ কেন? এসেই যখন পড়েছ, কাজটা সেরেই যাও না। দরজা থেকে চলে গেলে তোমার মাসিমাকে আমি কী কৈফিয়ত দেব?"

"আ-আ-আমার মাসিমা?"

"হ্যাঁ। আমার গিন্নি। তোমার জন্যই তো তিনি আমায় চটপট আসতে বলেছিলেন।" বলতে বলতে নন্দদুলাল চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেছেন। টানলেন ছেলেটাকে, "এসো, ভেতরে এসো।"

ফ্ল্যাটে ঢুকেও ছেলেটা জড়সড় দাঁড়িয়ে। সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে নন্দদুলাল বললেন, "কী হল, বোসো।"

"ব-ব-ব-বসব?"

"অবশ্যই। যত নগণ্য কাজেই তুমি আসো না কেন, তুমি এখন আমার অতিথি। আর অতিথির সমাদর করা গৃহস্বামীর কর্তব্য।"

কী বুঝল কে জানে, ছেলেটা হাঁটু কেতরে বসল সোফায়। পিটপিট চোখ চালাচ্ছে ফ্ল্যাটময়।

নন্দদুলাল গলা ঝাড়লেন, "এবার তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ-পরিচয়টা সেরে ফেলা যাক। নাম কী তোমার?"

"আজ্ঞে, ননী। ননীগোপাল।"

"বাহ, তুমি আমি তো তা হলে একই হে। ননীগোপালও যিনি, নন্দদুলালও তিনি। ঠিক কিনা?"

"কী যে বলেন স্যার?" ননীগোপাল বেজায় লজ্জা পেয়েছে। গা মুচড়ে বলল, "কোথায় আপনি, আর কোথায় আমি!"

"নিজেকে কখনও ছোট ভাবতে নেই ননীগোপাল। দুনিয়ায় কোনও কাজই হেলাফেলার নয়। তুমিও পরিশ্রম করে খাও, আমিও খেটে খাই। তফাত এইটুকুই, আমার হাতে থাকে চক-ডাস্টার, আর তোমার হাতে স্ক্রুডাইভার। তা যে পেশায় যা লাগে।"

"বাঃ, বেড়ে বলেছেন তো," এতক্ষণে ননীগোপাল যেন অনেকটাই সপ্রতিভ, "সত্যিই তো, খেটেখুটেই তো খাই।"

"গুড। কথাটা মাথায় রাখবে।" নন্দদুলাল নড়েচড়ে বসলেন, "তা কদ্দিন আছ এই লাইনে?"

"আজ্ঞে, প্রায় বছর পাঁচেক।"

"হাত মোটামুটি পাকা তো?"

ননীগোপাল ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, "প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ পেলাম কই স্যার?"

"বটে? দাও প্রমাণ। দেখাও তোমার কেরামতি।"

তেমন একটা হেলদোল দেখা গেল না ননীগোপালের। বসে আছে গ্যাঁট হয়ে।

নন্দদুলাল তাড়া লাগালেন, "কী হল? শুরু করে দাও।"

"পারব না স্যার। সামনে কেউ থাকলে আমার হাত চলে না।"

"অ। তার মানে আমাকে ওঘরে চলে যেতে হবে?...তা বেশ। একা-একাই করো না হয়। তার আগে দু'জনেই তেতে-পুড়ে এসেছি, চলো একটু জলটল খেয়ে নিই। শরবত চলবে?"

" তা একটু হলে মন্দ হয় না। গলাটা বড্ড শুকনো মেরে গেছে।"

"আহাহা। জলজিরা খাবে? না আমের সিরাপ?"

"গরিব মানুষের অত বাছাবাছি করলে কি চলে স্যার? দিন যা হোক।"

ননীগোপালের লাজুক-লাজুক ভাব, কথা বলার ধরন বেশ উপভোগ করছিলেন নন্দদুলাল। খুশি-খুশি মুখে বললেন, "তা হলে এক কাজ করো। উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে আমের সিরাপটাই বের করো। সঙ্গে ঠাণ্ডা জলের বোতল। রান্নাঘরে কাচের গ্লাস আছে, পরিমাণমতো মিশিয়ে নিজেই বানিয়ে ফ্যালো তো দেখি। আর হ্যাঁ, যদি মানে না লাগে আমাকেও এক গ্লাস দাও।"

"এ কী বলছেন স্যার? আপনার সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

লাফিয়ে সোফা ছেড়ে বেড়ালপায়ে ফ্রিজের কাছে গেল ননীগোপাল। গ্লাস, জল, সিরাপ ঠিকঠাক খুঁজে নিয়ে দু' গ্লাস শরবত নিমেষে প্রস্তুত। একটা গ্লাস নন্দদুলালকে ধরিয়ে দিয়ে গদগদ মুখে বলল, "আপনার মতো মানুষ আমি দুটো দেখিনি স্যার। লোকে আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহারটাই না করে! আর আপনি কিনা এই দীনহীনকে তরিযুত করে শরবত খাওয়াচ্ছেন?"

"আমার চোখে সব মানুষই সমান ননী।" গর্বিত মুখে গ্লাসে চুমুক দিয়ে নাক কুঁচকোলেন নন্দদুলাল, "অ্যাহ, শরবত ঠাণ্ডা জলে বানাওনি?"

"জল শীতল হয়নি স্যার। ফ্রিজ বন্ধ।"

"বাহ, তুমি তো বেশ শুদ্ধ ভাষা বলো! পড়াশুনো কদ্দুর করেছ?"

"আজ্ঞে, ক্লাস এইট।"

"ছেড়ে দিলে কেন?"

"অভাবের তাড়নায় স্যার। জঠর-জ্বালা মোক্ষম জ্বালা।"

"তা অবশ্য ঠিক," নন্দদুলাল মাথা দোলালেন, "তো শুধু এই কাজই জানো? নাকি অন্য কিছুও শিখেছ?"

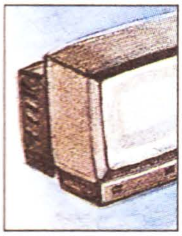
পিচিক করে একচিলতে হাসি পিছলে গেল ননীগোপালের ঠোঁটে, "আজ্ঞে, সূক্ষ্ম কাজও কিছু কিছু জানা আছে স্যার।"

" কীরকম?"

"পামিং, পামিং।... ধরুন, যে-কোনও জিনিস মুঠোয় নিলাম, দু'বার শূন্যে হাত ঘোরাব, ব্যস জিনিসটা ভ্যানিশ।"

"বলো কী হে? ম্যাজিকও জানো?"

"যে যে নামে ডাকে। কেউ বলে ম্যাজিক, কেউ বলে



ভুলের মাশুল

হাতসাফাই,” অম্লানবদনে বলল ননীগোপাল, “আমার গুরু বলেন, এসব কাজে আমি নাকি তাঁকেও টেক্কা দিয়েছি।”

“তা হলে তো একবার দেখতে হয়।”

“দেখাতেই পারি। কী সরাব বলুন?”

গ্লাস থেকে চামচখানা তুলে এগিয়ে দিলেন নন্দদুলাল, “এটাকে হাওয়া করো দেখি।”

বাঁ হাতের চেটোয় চামচ রাখল ননীগোপাল। ডান তালু দিয়ে চাপা দিল বাঁ হাত। তারপর দুটো হাত একসঙ্গে করে শূন্যে ঝাঁকাল খানিক। হঠাৎ ঝাং করে দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছে, “দেখুন স্যার, চামচ নেই।”

নন্দদুলাল শিশুর মতো উল্লসিত, “তাই তো! তাই তো! আর কী ভ্যানিশ করতে পারো? একটা থালা এনে দেব?”

“অত বড় জিনিসে অসুবিধে আছে স্যার। বললাম না, এ অতি সূক্ষ্ম কাজ। জিনিসটা ছোটখাটো হবে, দামি হবে, তবেই না হাত চলবে।”

“ছোট, অথচ দামি জিনিস?” নন্দদুলাল ভাবনায় পড়ে গেলেন, “কীরকম বলো তো?”

“এই ধরুন গিয়ে মাসিমার কানের দুলটুল। হারটার। কিংবা আংটিটাংটি।”

আঙুল থেকে সোনার আংটিটা খুলে দিলেন নন্দদুলাল। মুঠোয় চেপে মাত্র দু'বার ফুঁ দিল ননীগোপাল, মুঠো খুলতেই আংটি উধাও। উৎসাহিত হয়ে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার থেকে গিন্নির মুক্তোর দুলজোড়া এনে দিলেন, কয়েক সেকেন্ডে দুল অদৃশ্য। উত্তরোত্তর চমৎকৃত হচ্ছেন নন্দদুলাল। আলমারি খুলে বের করে আনলেন সোনার বোতাম, সোনার চেন, রুপোর খুদে সিঁদুরকৌটো। নিমেষে মিলিয়ে গেল সব। আস্ত একখানা সোনার বালাও যখন কর্পূরের মতো উবে গেল, নন্দদুলালের চোখ তখন ঠিকরে বেরোয় আর কি!

আপ্লুত স্বরে নন্দদুলাল বললেন, “তুমি তো আইনস্টাইনকেও ঘোল খাওয়ালে হে ননী। মাসকে তুমি এনার্জিতে পরিণত না করেই নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছ?”

“আইনস্টাইন?” ননীগোপাল চোখ কুঁচকোল, “তিনি কে? আমাদের লাইনের কেউ?”

“তিনি একজন মহান বিজ্ঞানী।...তবে তুমিও লা-জবাব। তোমারও তুলনা নেই।”

“আপনিই কদর দিলেন স্যার।”

“হুম। তা এবার জিনিসগুলো ফেরত এনে দাও।”

“অপরাধ নেবেন না স্যার,” ননীগোপাল ফিচেল হেসে ফেলল, “অর্ধেক বিদ্যা সবে আয়ত্ত করেছি স্যার। বাকি অর্ধেক এখনও শেখা হয়নি।”

“এ তো ভাল কথা নয়,” নন্দদুলাল অসন্তুষ্ট হলেন, “কোনও কিছু শিখতে হলে পুরোপুরি শিখবে। আধাখেঁচড়া জ্ঞান নিয়ে চক্রব্যূহে ঢুকে অভিমন্যুকে মরতে হয়েছিল, সে খবর রাখো? পরের বার যেন এমন অজুহাত না শুনি, বুঝলে?”

“যে আজ্ঞে স্যার,” ননীগোপাল উঠে দাঁড়াল, “আজ তা হলে আসি?”

“সে কী? এখনও তো আসল কাজে হাতই দাওনি! বললে একা বসে করবে, আর জিনিসে হাত না ছুঁইয়েই পালাচ্ছ?” নন্দদুলাল ধমকে উঠলেন, “আমি ওঘরে গিয়ে শুচ্ছি, তুমি ততক্ষণে টিভিটার গতি করে ফ্যালো।”

“এই টিভিটার?”

“হ্যাঁ। দামি রঙিন টিভি, সাবধানে হ্যান্ডেল কোরো। আর দেখো, গোটা ঘরে স্ক্রুটু ছড়িয়ে রোখো না, তোমার মাসিমা রাগ করবেন।”

আবার চোখ পিটপিট করছে ননীগোপাল। ঘাড় চুলকোচ্ছে। আচমকা শুঁটকো চোয়ালে কান-এঁটো-করা হাসি, “খোলাখুলির ঝামেলা না করে টিভিটা যদি নিয়েই যাই স্যার?”

“নিয়ে গিয়ে মেরামত করবে? উত্তম প্রস্তাব।... কিন্তু কাঁধে করে ধাড়ি জিনিসটিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?”

“একটা রিকশা ডাকব স্যার?”

“গুড আইডিয়া। তবে রিকশা ভাড়াটাও তো তোমাকে আমার দিয়ে দেওয়া উচিত।” ফস করে মানিব্যাগ থেকে একখানা একশো টাকার নোট বের করলেন নন্দদুলাল, “এটা রাখো। ডেলিভারি দেওয়ার সময়ে তোমার মাসিমার সঙ্গে হিসেবটা প্লাস-মাইনাস করে নিও।”

রিকশায় টিভি চাপিয়ে ননীগোপাল বিদায় নেওয়ার পর আধ ঘণ্টাও কাটেনি, দরজায় বেল। নন্দদুলালের গিন্নি ফিরে এসেছেন বাপের বাড়ি থেকে। সঙ্গে মোটাসোটা চেহারার এক বছর তিরিশেকের লোক।

অবাক মুখে নন্দদুলাল বললেন, “তুমি? এত তাড়াতাড়ি?”

“তোমার ওপর ভরসা করে সুস্থির থাকা যায়? কোনও রকমে নাকেমুখে গুঁজেই বেরিয়ে পড়েছি।” নন্দদুলাল-গিন্নি ঘাম মুছছেন, “পাড়ায় ঢুকে দেখি ইনি দোকানে গালে হাত দিয়ে বসে। তুমি নাকি ওঁর ছায়াও মাড়াওনি।”

“উনি কে?”

“ফ্রিজ মেকানিক। পইপই করে তোমায় বলে যাইনি, স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এঁকে ধরে আনবে? এই গরমে ফ্রিজ খারাপ থকলে কতটা অসুবিধে হয় সে হুঁশ তোমার আছে?”

নন্দদুলালের মাথায় হাত। এহ্, ভুলটা এবার বেশি মারাত্মক হয়ে গেছে।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

আর-একটু হলে

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ভোর ছ'টা। উদয়পুর বাসগুমটির সামনে বাবলুর চায়ের দোকান এখন জমজমাট। বাসের ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, হেল্পার এই সময়টা বাবলুর দোকানে চা খেয়ে, একটু আড্ডা মেরে যে-যার গাড়িতে ওঠে।

এই ভিড়টার মধ্যে আজ একজন নতুন লোক। বেঞ্চের কোনায় চুপটি করে বসে আছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে লুঙ্গি, সাতপুরনো কোঁচকানো জামা, মাথায় গামছা বাঁধা। চা করতে করতে বাবলু আড়চোখে তাকায় লোকটার দিকে, কেমন যেন চেনা-চেনা ঠেকছে। আগে কোথাও দেখেছে কি? সন্দেহ নিরসনে লোকটার উদ্দেশে বাবলু বলে ওঠে, "ও কত্তা, চায়ের সঙ্গে বিস্কুট লাগবে তো, কী বিস্কুট দেব?"

"আপনার যেমন ইচ্ছে একটা দিয়েন।" নিরুত্তাপভাবে বলল লোকটা। কথার ধরন, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, গ্রামের লোক। কোনও কাজে এসেছে হয়তো। কিন্তু এই সাতসকালে তার কাজটা কী। গ্রামের মানুষ উদয়পুরে আসে কোর্টের কারণে। বিচারের আশায়। কোর্ট খুলবে সেই বেলা এগারোটায়। এখন থেকে বসে আছে কেন? ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হয়।

থালার উপর মাটির ভাঁড় সাজিয়ে চা ঢালছে বাবলু। আগন্তুককে নিয়ে মাথাব্যথার কারণ, তার দোকানটা খুব সুবিধের জায়গা নয়। ইচ্ছে না থাকলেও কবে থেকে যেন দোকানটা ত্রিভঙ্গ গুণ্ডার মিটিং-এর স্থল হয়ে গেছে। কোনওভাবে ব্যানারটাকে আটকাতে পারেনি বাবলু। এখন ত্রিভঙ্গদার হয়েই তাকে কাজ করতে হয়, কোনও নতুন লোক দোকানে ঘুরঘুর করছে কি না, অন্য কোনও দল দোকানে বসে কী আলোচনা করছে, পুলিশ নজর রাখছে কি না, সব খবর দিতে হয়। এককথায় যাকে বলে ইনফর্মার। কাজটা করতে খুবই গ্লানি বোধ হয়, উপায় কী? অনথ্যা হলে ত্রিভঙ্গর মস্তানবাহিনী মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বাবলুর ছিটেবেড়ার দোকান মাটিতে শুইয়ে দেবে।

চায়ের থালা নিয়ে লোকটার সামনে যায় বাবলু। হাতে ভাঁড় তুলে দিয়ে বলে, "তা কত্তা, সক্কাল সক্কাল এখানে



কী দরকারে আসা?"

"খাটতে এয়েচি। বড় রাস্তার মোড়ে বিরিজ হচ্ছেনি, কনটাকটার বাবুর সঙ্গে দেখা করব।"

লোকটার কথায় নিশ্চিন্ত হয় বাবলু। অন্য খদ্দেরের দিকে এগিয়ে যায়। একই সঙ্গে আশ্বস্ত হন শ্রমিকের বেশধারী চিত্তদারোগা। ছদ্মবেশ, অভিনয় সবটাই তার মানে নিখুঁত হয়েছে। হাত দিয়ে নিজের পিঠটাই চাপড়ে দিতে ইচ্ছে করে, উত্তেজনাটা সামাল দিতে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরান। বেঞ্চে রাখা চায়ের ভাঁড়টা সবে মুখে তুলতে যাবেন, চোখে পড়ে তারাচরণ গোয়েন্দাকে। দোকানের সামনেটায় এসে চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে। লোকটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না চিত্তদারোগা। অযথা পুলিশের কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। তর্ক করে। কোথাও রহস্যজনক কিছু ঘটলেই, যেচে পৌঁছে যায়। লোকটা মূলত গোরু চুরি, ছেলে বখে যাওয়া, পুকুরে ফলিডল ফেলার কেসই বেশি পায়। হয়তো সেই হতাশায় বড়সড় কেসের পাশে ঘুরঘুর করে। এই যেমন লাইব্রেরির মূর্তি উদ্ধারের পর একদিন থানায় এল তারাচরণ। অভিমানী মুখ করে বলে কিনা, "স্যার, এটা কিন্তু ভাল করলেন না। আমি উদয়পুরের পুরনো গোয়েন্দা, আমাকে আড়ালে রেখে পুরো কাজটা সারলেন। আমার রেপুটেশনের কী হাল হল বলুন তো!"

তারাচরণের কথা শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন চিত্তদারোগা, কী আবদার, পুলিশ তদন্ত করবে ওর মতো একটা হাতুড়ে গোয়েন্দাকে জানিয়ে। তা ছাড়া এলাকার 'পুরনো গোয়েন্দা' মানে কী? পুরনো ডাক্তার শুনেছেন, অনেক দিনের পুরনো পুরোহিত, নাপিত, মিষ্টির দোকান, সাইকেল সারাইয়ের দোকান, কোনও অঞ্চলে 'পুরনো গোয়েন্দা' সেই প্রথম শুনেছিলেন।

তারাচরণের অভিযোগগুলোকে পাত্তা না দেওয়া সত্ত্বেও, সে কিন্তু বলতে যাচ্ছিল, "আপনার আগের বড়বাবুকে আমি কি কম হেল্প করেছি। ফোন করে একবার জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। আপনার কপাল ভাল, উদয়পুরে এসেই একটা মস্ত কেস পেয়ে গেলেন। কাগজে নাম বেরোল, চেহারা দেখাল টিভিতে, এখন আর আমায় পুছবেন কেন!"

ওই একটা কথাই ঠিক বলেছিল তারাচরণ। চিত্তদারোগাকে এখন এলাকার সবাই চেনে। সাধারণ পোশাকে থাকলেও লোকের চোখ এড়াতে পারেন না। সেই জন্যেই আজ এই ছদ্মবেশ।

তারাচরণ চায়ের অর্ডার দিয়ে চিত্তদারোগার পাশটিতে বসল। দারোগাবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানতে থাকেন। খুব একটা নার্ভাস লাগছে না। ছদ্মবেশ নিয়ে সংশয় একটু আগেই তাঁর কেটে গেছে।

চিত্তদারোগার ধারণা ভুল প্রমাণ করে তারাচরণ ফিসফিস করে বলে ওঠে, "কিছু পেলেন?"



চমকে ফিরে তাকান চিত্তদারোগা। তারাচরণ সামনের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেছে। অর্থাৎ সে চায় না দারোগাবাবু অন্য কারও চোখে ধরা পড়ুন। যদিও তার ঠোঁটে একটা মিচকে হাসি লেগে আছে।

চিত্তদারোগা চাপা স্বরে জানতে চান, "কী করে বুঝলে আমি?"

"খুব সহজ, যে ড্রেস নিয়েছেন তার সঙ্গে সিগারেট মানায় না, তাও আবার সিগারেটের ব্যান্ডটা আপনার নিজস্ব। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, হাতের ঘড়িটা খুলে আসতে পারতেন।"

অস্বীকার করার উপায় নেই, ছদ্মবেশের এগুলোই দুর্বল অংশ। আর-একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। চিত্তদারোগা পালটা প্রশ্ন করেন, "তুমি এখানে কেন?"

"আপনার যে কারণে আসা, আমারও তাই।" একই রকমভাবে চাপা স্বরে কথাটা বলে তারাচরণ।

রাগে গরগর করতে করতে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়ান চিত্তদারোগা। না, এই লোকটা দেখছি পিছু ছাড়বে না। যে কেসটা নিয়ে এখন তদন্তে নেমেছেন, আশা ছিল, সল্ভ করবেন একাই। বিশ্বস্তসূত্রে একটা তথ্য পেয়ে ভোর-ভোর বাবলুর দোকানে ঘাপটি মেরে ছিলেন। দেখা যাচ্ছে খবরটা কোনওভাবে তারাচরণও জোগাড় করেছে, তার মানে কেসটা নিষ্পত্তি হলে অর্ধেক ক্রেডিট তারাচরণের পক্ষে চলে যাবে। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এসব ভাবতে ভাবতে দোকান ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন চিত্তদারোগা। পিছন থেকে বাবলু ডেকে ওঠে, "কী হল কত্তা, পয়সা না দিয়ে চলে যাচ্ছ যে বড়!"

অত্যন্ত লজ্জায় পড়ে যান চিত্তদারোগা। বলে ফেলেন, "সরি, সরি, খেয়াল থাকে না।" 'সরি' কথাটা এই পোশাকে বেমানান।

সুযোগ বুঝে টিপ্পনী কাটে তারাচরণ, "ছেড়ে দাও বাবলু, গরিব মানুষ। দামটা না হয় আমিই দিয়ে দেব।"

কটমট করে তারাচরণের দিকে তাকান চিত্তদারোগা। ইচ্ছে করছিল দৌড়ে গিয়ে ঠাস করে একটা চড় মারেন। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে বাবলুকে গিয়ে পয়সা দেন। তারপর হাঁটতে থাকেন জিপের উদ্দেশ্যে। জিপটা দাঁড় করানো আছে সেই ধানকলের কাছে, হাঁটায় মিনিট তিনেকের পথ। অপরাধীরা যাতে পুলিশের উপস্থিতি টের না পায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

আজকের অভিযানটা ব্যর্থ হওয়ায় বড্ডই আক্ষেপ হচ্ছে চিত্তদারোগার। খবর একেবারে পাক্কা ছিল, একটু পরেই ত্রিভঙ্গ তার দল নিয়ে মিটিং-এ বসত বাবলুর দোকানে। ত্রিভঙ্গকে আগে কখনও দেখেননি চিত্তদারোগা। ওর স্যাঙাতগুলোকেও চেনেন না। আজ সুযোগ বুঝে চিনে রাখতেন। উপরি পাওনা হত, যদি মিটিং-এর কিছুটা শোনা যেত। সবটাই গোলমাল পাকিয়ে দিল তারাচরণ এসে। নিজের ছদ্মবেশের উপর ভরসা রাখতে পারলেন না চিত্তদারোগা। যে কেসটার তদন্তে নেমেছেন, ভীষণ জটিল এবং বাজে কেস। প্রায় মরা কেস বেঁচে ওঠার মতো। উদয়পুরে বদলি হয়ে আসার সময় লোকমুখে শুনেছিলেন খুবই নিরালা শান্ত জায়গা। চিত্তদারোগার মনে একটা আশা জেগে ছিল, তাঁর এই রোগা শরীরটা হয়তো এবার জল-হাওয়ার গুণে দারোগা পদের মানানসই হবে। কিন্তু কোথায় কী, গত কেসটায় একটু নামডাক হতেই আপাত শান্ত উদয়পুরের ভিতর লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন অপরাধ তাঁকে যেন ডেকে নিচ্ছে। যেমন এই কেসটার কথাই ধরা যাক না, গত দিনদশেক আগে থানায় খবর এল, মদন গুঁই তালডাঙা মাঠের এক পরিত্যক্ত মাটির বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে। লোকটা কাঠের মিস্ত্রি। রুটিনমাফিক চিত্তদারোগা দু'জন কনস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে গেলেন। ধুধু মাঠের মাঝখানে একটাই বাড়ি। কোন খেয়ালে এই নির্জন প্রান্তরে বাড়িটা করেছিল মালিক কে জানে। এখন কেউ বসবাস করে না। বাড়ির সামনে ছোটখাটো জটলা। এখনও এলাকার সব লোক খবর পায়নি।

পুলিশ-জিপ পৌঁছতেই ভিড় পাতলা হল। বডি মাটির দালানের পাশে ঝুলছে। দড়িটা দালানের ছাউনির আড়কাঠে বাঁধা। তার মানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দালান থেকে লাফিয়ে পড়েছে। খুবই সরল পদ্ধতি, নিখাদ সুইসাইড কেস। কনস্টেবল দু'জনকে বডি নামাতে বলেছিলেন চিত্তদারোগা। তখনই পাশে এসে দাঁড়ায় তারাচরণ। চাপা গলায় বলে, "স্যার, আমার কিন্তু কেসটা সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

"কীরকম?" জানতে চেয়েছিলেন চিত্তদারোগা।

তারাচরণ বলে, "কেসটা মনে হচ্ছে সুইসাইড নয়। খুন করার পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

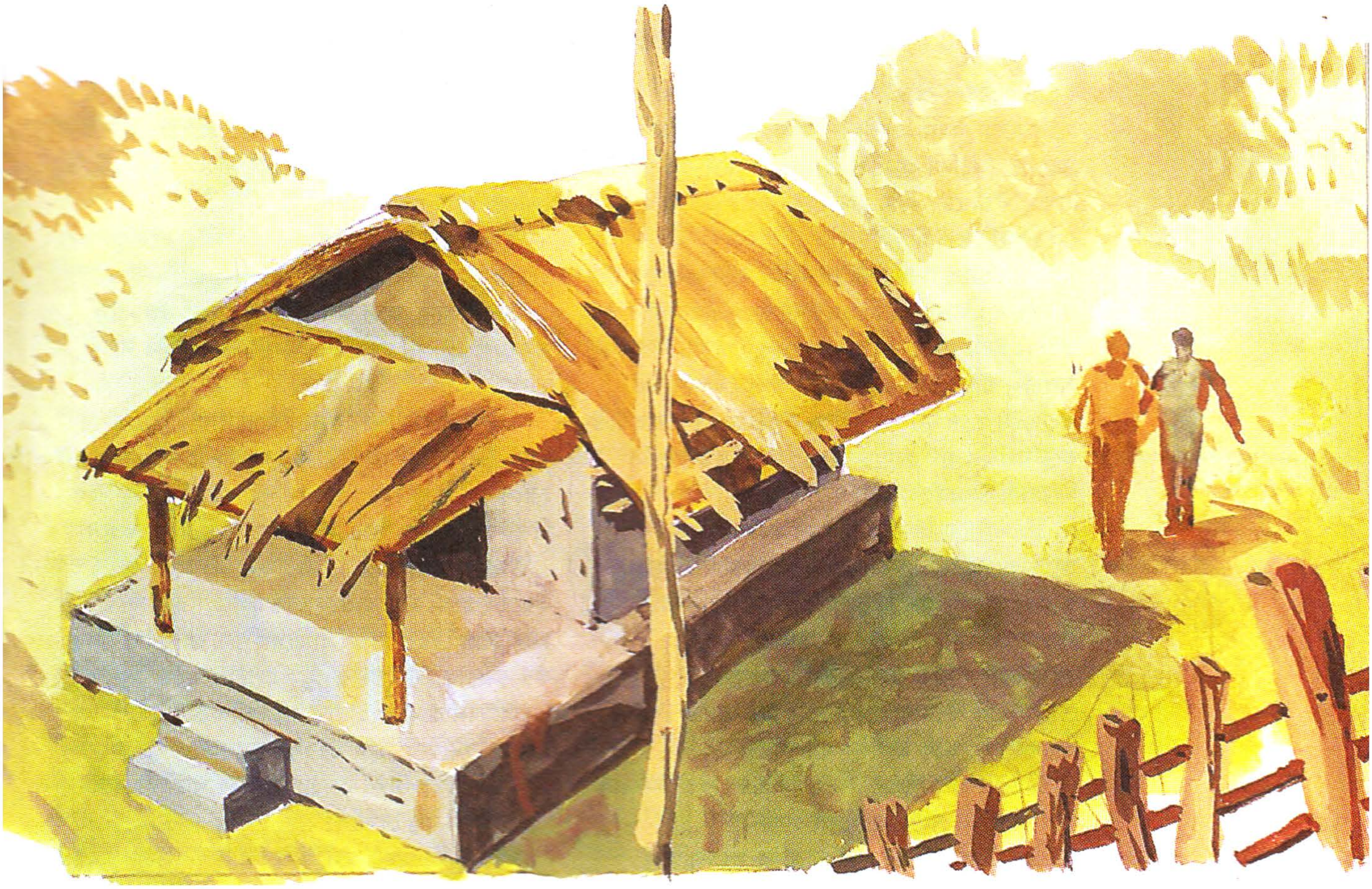
"এরকম ধারণার কারণ?"

উত্তরে তারাচরণ বলেছিল, "লোকটার সম্বন্ধে খোঁজ করে জানলাম, ভীষণ অলস প্রকৃতির কাঠের মিস্ত্রি। রাতদিন নেশাভাঙ করে পড়ে থাকে। বউ লোকের বাড়ি কাজ করে খাওয়ায়।"

"তো, এর সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক?" বিরক্তির সুরে জানতে চেয়েছিলেন চিত্তদারোগা।

তারাচরণ বলে, "বউ কাজে যায় যখন, বাড়ি ওর ফাঁকাই পড়ে থাকে। সেই লোকটা খামোকা কেন এতদূর ঠেঙিয়ে আত্মহত্যা করতে আসবে?"

"ঠিকই তো, একটা অলস লোকের পক্ষে কাজটা বেশ বেমানান।" কথাটা বিদ্রূপের স্বরে বলেছিলেন



চিত্তদারোগা।

একটু দমে গেলেও, তারাচরণ মিনমিন করে বলে, "ঠাট্টা করছেন স্যার। আমার কথাটা একটু ভেবে দেখতে পারতেন। যে লোকটা নিজেই একটা দুঃখের বোঝা, যে বোঝা মাথায় নিয়ে ওর বউ পরের বাড়ি কাজ করে সংসার চালায়, সেই লোকটা কোন দুঃখে সুইসাইড করবে?"

সামান্য হলেও কথাগুলোয় যুক্তি আছে। কিন্তু স্বীকার করা যাবে না। পাত্তা দেওয়া হয়ে যাবে তারাচরণকে। ঠোঁটে শ্লেষের হাসি ঝুলিয়ে চিত্তদারোগা বলেছিলেন, "এখন তো বডিটার ময়না তদন্ত হোক। তারপরেই বোঝা যাবে, লোকটাকে আগে মেরে ঝোলানো হয়েছে, নাকি নিজেই ঝুলে মরেছে। তুমি এক কাজ করো, দু'দিন পর থানায় এসে পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখে যেও।"

বডি জিপে তোলা হয়ে গেছে। জিপ স্টার্ট নিতে যাবে, চোখে পড়ে, একটি বউ মাঠে বসে গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে। নেশাভাঙ করা মৃত স্বামীর জন্য জোরে কাঁদতে কুণ্ঠা হচ্ছে হয়তো। পুলিশ হলেও বুকটা মুচড়ে উঠেছিল চিত্তদারোগার।

ময়না তদন্তে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। তারাচরণ এসে দেখে গেল রিপোর্ট। ওর মুখ থেকে সন্দেহের মেঘ কাটল না। যাওয়ার সময় বলে গেল, "স্যার, আপনি যাই বলুন, আমি কিন্তু এখনও মানতে পারছি না, মদন সুইসাইড করেছে। ওর বিষয়ে কিছু খোঁজখবর নিতে গিয়ে আমার তেমনটাই ধারণা হয়েছে।"

পরের দিনই তারাচরণের সন্দেহের স্বপক্ষে একজন থানায় হাজির। সে আর কেউ নয়, মদন গুঁইয়ের বউ লতা। শোক অনেকটা সামলে উঠেছে। মুখে-চোখে একরোখা ভাব। বলল, "বড়বাবু, আপনার সঙ্গে একটু একলা কথা বলতে চাই।"

চিত্তদারোগা ঘর থেকে অন্য কনস্টেবলদের সরিয়ে দিলেন। তারপর মদনের বউ যা বলল, তা এই রকম— "নেশাভাঙ করা ছাড়া মদনের আর কোনও দোষ ছিল না। বউ-ছেলেমেয়ের উপর যথেষ্ট মায়া ছিল। নেশা না করে থাকলে একদম অন্য মানুষ। মারা যাওয়ার ক'দিন আগে মদন খুব অস্থির অবস্থায় ছিল। বারবার বউকে বলত, 'আমাকে মেরে ফেলা হবে। আমি ওদের অনেক খারাপ কাজের সাক্ষী হয়ে গেছি। আমাকে দিয়েও খারাপ কাজ করাতে চাইছে ওরা। আমি কিছুতেই পারব না।' "

"ওরাটা কারা?" লতার কথার মাঝখানে জানতে চেয়েছিলেন চিত্তদারোগা।

লতা বলে, "বারবার জিজ্ঞেস করেও নামগুলো বার

করতে পারিনি। বলত, ‘ওদের চিনলে তুমিও তো সাক্ষী হয়ে যাবে।’ আমি অবশ্য ওর কথা শুনিনি, খোঁজ নিয়ে জেনেছি, কিছুদিন ধরে ত্রিভঙ্গর দলের সঙ্গে ওর খুব মাখামাখি চলছে। এখন মনে হচ্ছে ওরাই আমার স্বামীকে মেরেছে।”

চিত্তদারোগা আর দেরি করেননি। লতা থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই ত্রিভঙ্গর ব্যাপারে এন্‌কোয়ারি শুরু করেন। ইনফরমেশন যা পাওয়া গেল, লোকটা মারাত্মক অপরাধী এবং ভীষণ চতুর। তার অপকর্মের কোনও প্রমাণ সে রাখে না। আগের বড়বাবু ত্রিভঙ্গকে ধরার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন। সেই বিরক্তিতেই বদলি নিয়েছেন উদয়পুর থেকে।

চিত্তদারোগা প্রথমেই ত্রিভঙ্গর সমস্ত কুকর্মের জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে, কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেন। তারপর যান ত্রিভঙ্গর বাড়ি। যথারীতি তাকে পাওয়া যায় না। বাড়ির লোকদেরই হুমকি দেন দারোগাবাবু, “ত্রিভঙ্গকে বোলো, বেশিদিন সে পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারবে না। আমারও নাম চিত্তদারোগা, ওকে একদিন প্রমাণসহ ধরবই।”

ত্রিভঙ্গর বাবা বলেন, “আপনার মতো কত অফিসার ঘুরে গেল, আগে তো হাতেনাতে ধরুন।”

বোঝাই গিয়েছিল বাবার আন্তরিক সহযোগিতা ত্রিভঙ্গকে কুখ্যাত হতে সাহায্য করেছে।

ত্রিভঙ্গর বাবার চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন চিত্তদারোগা। তারপর থেকেই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, যে করেই হোক, ত্রিভঙ্গকে অপরাধকালীন ধরতে হবে। থানায় এনে উত্তমমধ্যম দিলেই মদন গুঁইয়ের ব্যাপারটা স্বীকার করবে। কাজটা যে বেশ কঠিন ক্রমশই মালুম পাচ্ছেন চিত্তদারোগা। তার উপর তারাচরণের মতো ছিঁচকে গোয়েন্দা এসে তাঁর কাজ আরও পণ্ড করেছে। ভাবনা শেষ হতে দারোগাবাবু খেয়াল করেন জিপটাকে তো আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। গেল কোথায়? ঝট করে পিছন ফেরেন। এইরে, অন্যমনস্কভাবে জিপ ছেড়ে অনেকটাই এগিয়ে এসেছেন।

জিপের কাছে ফিরে আসতেই পাশ থেকে কে যেন ডেকে ওঠে, “স্যার, একটা কথা ছিল।”

মুখ ঘোরাতে দেখেন, ধুলো-ময়লা পোশাকে রোগাভোগা একটা লোক। বিরক্তির সুরে চিত্তদারোগা বলেন, “তোমার আবার কী কথা?”

“মদনের ব্যাপারে স্যার।”

মনে কৌতূহল চলকে উঠলেও, যথাসাধ্য নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে দারোগাবাবু বলেন, “কোন মদন?”

“মদন গুঁই স্যার। ও আমার জিগ্‌রি দোস্ত ছিল। এখন আর বলতে লজ্জা নেই, আমরা একসঙ্গেই নেশাভাঙ করতাম। এমন বাজে পাল্লায় পড়ে গেল স্যার। মিছিমিছি প্রাণটা দিতে হল। আমি এমনই হতভাগা, চোখের সামনে ওকে খুন হতে দেখেও, কিছু করতে পারলাম না।” লোকটা হঠাৎ ফোঁপাতে শুরু করল।

চিত্তদারোগা বললেন, “তুমি জানো, কীভাবে খুন করা হয়েছে?”

“জানি স্যার, কারা করেছে তাও জানি। আপনাকে সব দেখাতে পারি। আমি সেসময় একটা ঢিবির পাশে লুকিয়ে ছিলাম।”

ক্রমশই উৎসাহিত হচ্ছেন চিত্তদারোগা। উত্তেজনার পারদ উঠছে। তবু লোকটাকে একটু যাচাই করে নিতে হয়। জিজ্ঞেস করেন, “তুমি যে পুলিশকে সব কিছু বলে দিচ্ছ, ওরা জানতে পারলে তোমাকেও তো খুন করবে।”

“জানি স্যার। কিন্তু দোস্তের জন্য এটুকু আমায় করতেই হবে। মনে বড্ড অশান্তি চলছে, রোজ স্বপ্নে মদন দেখা দেয়। বলে, ‘দোষীদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা কর ভজা, তুই না আমার বন্ধু!’ দোষীরা শাস্তি না পাওয়া অবধি মদন আমাকে ছাড়বে না। ঠিক করেছি, আপনাকে সব কিছু দেখিয়ে আমি উদয়পুর ছেড়ে চলে যাব।”

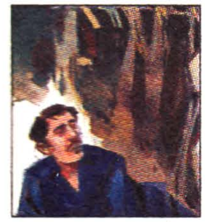
“ভাল কথা। এখন বলো, কখন, কোথায়, কীভাবে আমাকে সবকিছু দেখাবে?”

মদনের বন্ধু ভজা বলে, “বিকেল ঠিক পাঁচটার সময় আপনি সাদা পোশাকে ‘মহামায়া’ সিনেমা হলের সামনে দাঁড়াবেন। আমি রিকশা চালাই। ড্রাইভারের সিটে থাকব। আপনি কোথাও একটা যাওয়ার নাম করে উঠে পড়বেন। দেখবেন আশপাশের লোক যেন টের না পায়। ত্রিভঙ্গর চর চারদিকে ছড়ানো। এমনকী আপনার থানার অনেক পুলিশকেও ত্রিভঙ্গ হাত করে রেখেছে। কাউকে কিছু না জানিয়েই আসবেন। সঙ্গে অবশ্যই মনে করে রিভলভার নেবেন। কোনওভাবে ওরা যদি টের পায়, আচমকা অ্যাটাক করবে। তখন কাজে দেবে রিভলভারটা।

“সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা যাব কোথায়?” চিত্তদারোগার প্রশ্নের উত্তরে লোকটা বলে, “বিকেলে আসুন না, যেতে যেতে কথা হবে।”

“ঠিক আছে, তুমি থেকো, আমি আসব।” বলে জিপে ওঠেন চিত্তদারোগা।

ঘড়ির কাঁটা ঘোড়ার মতো ছুটে বিকেল পাঁচটা বাজিয়ে দিল। চিত্তদারোগা এখন ‘মহামায়া’ সিনেমা হলের সামনে। ভজাকে এখনও রিকশা সমেত চোখে পড়েনি। সহকর্মীদের না জানিয়ে একলা এই অভিযানে আসতে সামান্য দ্বিধা হচ্ছিল বটে, সংশয়মুক্ত হন ভজার চেহারার কথা ভেবে। ওই রোগাভোগা শরীরে সে ব্যাটা কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না। তা ছাড়া সঙ্গে তো গুলিভর্তি রিভলভারটা রইল। মদন গুঁইয়ের কেসটা তিনি



আর-একটু হলে

যদি একা সমাধান করতে পারেন, চতুর্দিকে নাম তো ছড়াবেই, প্রমোশনও বাঁধা। ভাবনার মাঝেই রিকশা প্যাঁ-পোঁ। মুখ তুলে দেখেন, ভজা রিকশা নিয়ে হাজির। অন্যদিকে তাকিয়ে হর্ন বাজাচ্ছে।

চিত্তদারোগা অ্যাক্টিং শুরু করেন, "ও রিকশা, ও রিকশা, কানাইপুর যাবে?"

"যাব বাবু। দশ টাকা লাগবে।"

"কেন, এত কেন? শুনেছি সাত টাকা ভাড়া।"

"রাস্তা খুব খারাপ হয়ে গেছে, গেলেই বুঝতে পারবেন।" বিরস মুখে বলে ভজা। সেও অ্যাক্টিং-এ কম যায় না।

বসতি ছাড়িয়ে ভজার রিকশা এখন তালডাঙা মাঠের দিকে চলেছে। প্যাসেঞ্জারের সিটে বসে, সামনে-পিছনে দেখে নিয়েছেন চিত্তদারোগা, না কেউ ফলো করছে না। রিকশা চালাতে চালাতে ভজা বলে যাচ্ছে, "ত্রিভঙ্গর ভেজাল ওষুধের কারবারে মদন সবে দু'-চারদিন কাজ শুরু করেছিল। সেই ওষুধ খেয়ে হাসপাতালে একটা বাচ্চা মারা যেতে, মদন কাজে যাওয়া বন্ধ করে। দু'দিন পর আমি আর মদন পালিতবাবুর বাগান পরিষ্কার করছি, ত্রিভঙ্গর চ্যালা নিতাই এসে মদনকে বলল, 'অত ভাল কাজ ছেড়ে তুই কিনা লোকের বাড়ির বাগান পরিষ্কার করছিস। ছিঃ। শোন, বস তোকে দেখা করতে বলেছে। দুপুরবেলা তালডাঙার বাড়িতে চলে আয়। খানাপিনাও হবে।'

"তখনই আমি মদনকে বলেছিলাম, 'ওদের সঙ্গে আর মিশিস না। বদসঙ্গ ছাড়।" শুনল না আমার কথা। খানাপিনার লোভটাই ওকে টানল। দুপুরবেলা আমিও মাঠ ধরে ওর সঙ্গে অনেকটা গেলাম। এক সময় ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়ি..." ভজার বর্ণনার মাঝে কখন যেন তালডাঙা মাঠ চলে এসেছে। মাঠের শেষ প্রান্তে লাল সূর্যের মাথাটুকু ডুবতে বাকি। মাঠময় হলুদ আলো। আকাশে পাক খাচ্ছে চিল। আর-একটু পরেই অন্ধকার নামবে।

সেই পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে এসে থামল রিকশা। জনমানবহীন প্রান্তর। দূরে কোথাও একটা গোরু হাম্বা হাম্বা করছে। রিকশা থেকে নেমে দু'জনেই বাড়ির মাটির দালানে এসে বসে। ভজা বলে, "সেদিন ঠিক এইখানে বসে খানাপিনা হচ্ছিল। ত্রিভঙ্গ, নিতাই কী সব বোঝাচ্ছিল মদনকে। দু'-একবার মদনের পিঠও চাপড়ে দিল। দাঁত বার করে হাসছিল মদন। এমন সময় হঠাৎ দেখি, ঘর থেকে হাতে দড়ি নিয়ে বেরোল ত্রিভঙ্গর আর-এক চ্যালা নাড়ু। ঘটনাটা ঘটছে মদনের পিছনে, ও টের পাচ্ছে না। প্রাণের ভয়ে আমিও পারছি না কিছু বলতে। নাড়ু দড়িটা টাঙিয়ে দিল দালানের আড়কাঠে।"

কথাটা শুনেই গায়ে কাঁটা দিল চিত্তদারোগার। ঝট করে মাথা তুলে আড়কাঠটা দেখে নিলেন, আজ অন্তত কিছু নেই। ভজার উদ্দেশে বললেন, "তারপর?"

কান্নাভেজা গলায় ভজা বলে, "তারপর আর কী স্যার, দড়িতে ফাঁস করাই ছিল, ধীরে ধীরে নেমে এল সেটা। কথা বলতে বলতে ত্রিভঙ্গ ফাঁসটা ওর গলায় মালার মতো পরিয়ে দিল..." বলেই, হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করল ভজা।

চিত্তদারোগা সান্ত্বনার সুরে বলেন, "কাঁদিস না, মনে জোর আন। ত্রিভঙ্গকে আমি ফাটকে পুরবই। তোকে সাক্ষী হিসেবে লাগবে।"

চিত্তদারোগার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ কানফাটা চিৎকার, "স্যার, মাথার উপরটা দেখুন।"

মুহূর্তের মধ্যে মাথার উপর চোখ তোলেন চিত্তদারোগা। আজও ফাঁসটা নিঃশব্দে নেমে আসছে। পকেটে হাত চলে গিয়েছিলই, রিভলভারটা বার করে, চিত হয়ে শুয়ে দড়ি-ধরা লোকটার পায়ে গুলি করলেন। পরক্ষণেই সোজা হয়ে বসে মাঠ ধরে দৌড়ে যাওয়া ভজাকে গুলি করলেন। এটাও ভজার পায়ে লাগল।

দু'প্রান্তে দুই আততায়ী মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। চিত্তদারোগা এখনও বুঝতে পারেননি, কে তাঁকে সতর্ক করল।

আবছা অন্ধকারে হাঁফাতে হাঁফাতে সামনে এসে যে দাঁড়াল তাকে দেখে চিত্তদারোগা তো থ। তারাচরণ গোয়েন্দা। ঢিপ করে দারোগাবাবুকে একটা প্রণাম করে নিল। চিত্তদারোগা অবাক হন। বলেন, "তুমি আমায় প্রণাম করছ কেন? প্রাণে বাঁচানোর জন্য আমারই তো তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

বিগলিত কণ্ঠে তারাচরণ বলে, "সেসব ছাড়ুন স্যার, আপনার টিপ দেখে আমি তো অভিভূত। শেখাবেন স্যার, বন্দুক ছাড়া কি গোয়েন্দা মানায়! একটা রিভলভারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে কিন্তু..." কথা বলতে বলতে পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে তারাচরণ।

একটুর জন্য বেঁচে যাওয়ার আনন্দে চিত্তদারোগার গলা আবেগে বুজে আসছে, জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে তারাচরণকে। নিজেকে সামলে চিত্তদারোগা বলেন, "সে পরে দেখা যাবে। আপাতত থানায় একটা খবর দাও তো। আমি ততক্ষণ এদের পাহারা দিই।"

আদেশ শোনামাত্র তারাচরণ উঠে দাঁড়িয়ে মাঠ ধরে ছুটতে থাকে। এখান থেকেই চেঁচাচ্ছে, "পুলিশ, পুলিশ।"

চিত্তদারোগা মনে-মনে তারাচরণকে বলেন, 'ওরে, গোয়েন্দাদের ওরকম 'পুলিশ, পুলিশ' বলে চিল্লোতে নেই, একদম মানায় না।'

ছবি: অনুপ রায়

ফেস্ট, নতুন কোর্স, অনুষ্ঠান, এক্সকারশন, খেলাধুলো সবই থাকবে এই পাতায়

ক্যাম্পাস

পাঠভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন



আমাদের বিদ্যালয়

কোনও এক শুভক্ষণে, খোলা আকাশের নীচে, চারপাশ সবুজে ঘেরা এই জায়গায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন এই বিদ্যালয়। সারা বছর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এখানে, যেমন, গুরুদেবের তিরোধান দিবস, বৃক্ষরোপণ, রাখীপূর্ণিমা, স্বাধীনতা দিবস, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি। মহালয়ার দিন সন্ধেবেলা গৌরপ্রাঙ্গণে বসে একটি মেলা। ছাত্রছাত্রীরা নিজের হাতে নানা জিনিস ও খাবার তৈরি করে বিক্রি করে। তারপর প্রাপ্ত অর্থ দুঃস্থ মানুষদের সাহায্যার্থে স্কুলের তহবিলে দান করা হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

আমাদের স্কুল থেকে প্রতিবছর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একদিনের এবং সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কিছুদিনের জন্য শিক্ষামূলক বার্ষিক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনও কোনও দিন আমরা সবাই মিলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি আউটিং-এ। একটা বেলা কেটে যায় ছুটোছুটি, খেলাধুলো, হইহই করে। আর শীতের রোদ্দুরমাখা



সকালে পিকনিক—সে যে কী আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

সাহিত্যসভা ও কবিতা পাঠের আসর

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তিনটি বিভাগে বিভক্ত—শিশুবিভাগ, মধ্যবিভাগ ও আদ্যবিভাগ। এই তিনটি বিভাগেই বসে সাহিত্যসভার আসর। এখানে আমরা স্বরচিত রচনা, ছড়া ও কবিতা পাঠ করি। এ ছাড়া থাকে গান ও নাচের অনুষ্ঠান। বর্ষাকালে আর বসন্তকালে আলাদা আলাদাভাবে বর্ষা ও বসন্তের কবিতা পাঠের আসর বসে। সেখানে শিক্ষক আর ছাত্ররা মিলেমিশে রবীন্দ্র-কবিতা পাঠ করা হয়।

গ্রাম পরিদর্শন ও দান সংগ্রহ

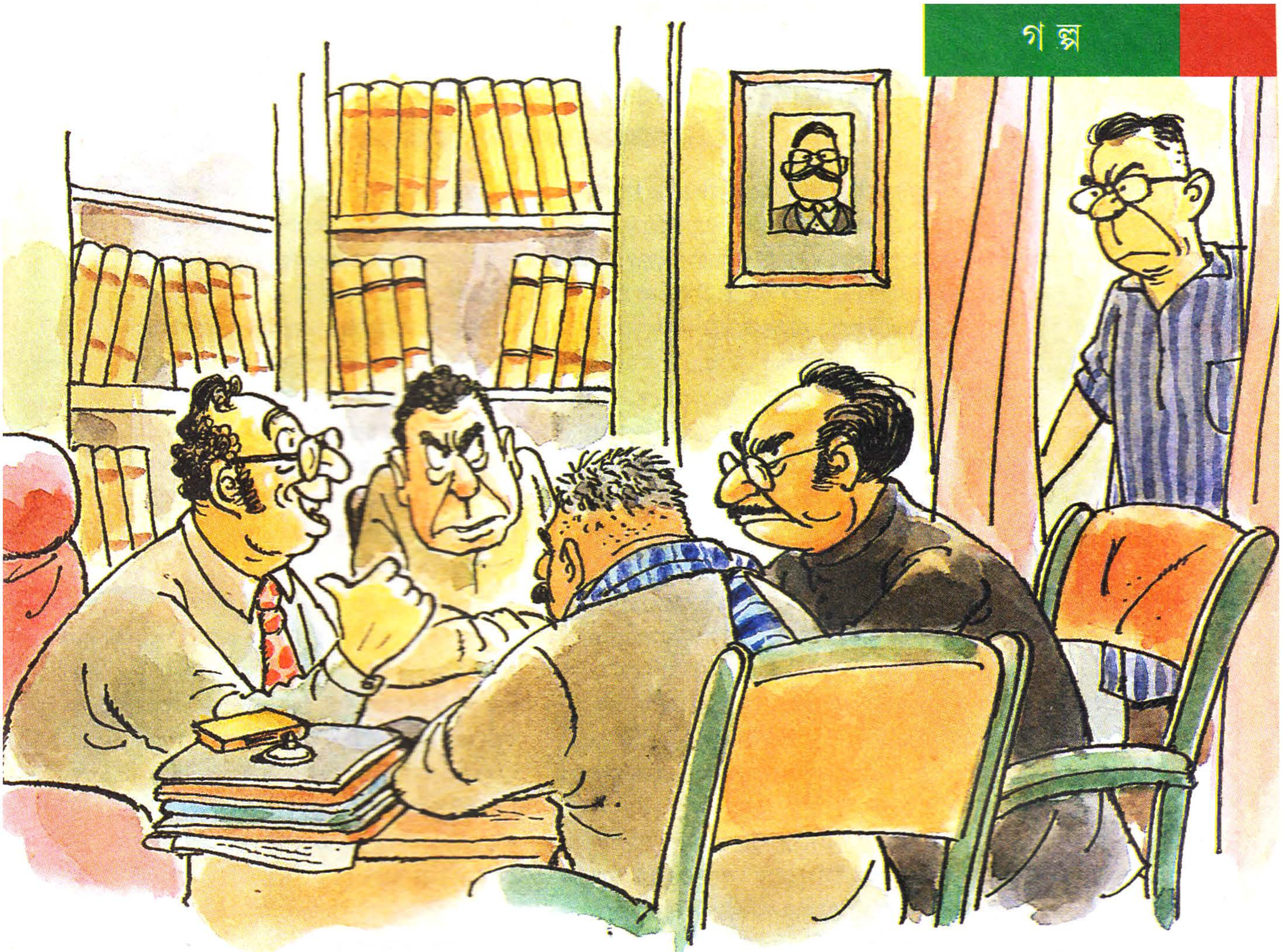
স্কুল থেকে নিয়ম করে ছাত্রছাত্রীদের গ্রাম পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা শুনে আমরা চেষ্টা করি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। এই সাহায্যের জন্য আমরা দান সংগ্রহ করতে যাই বিভিন্ন পাড়ায়। তারপর সংগৃহীত অর্থের সাহায্যে আমরা চেষ্টা করি গ্রামের মানুষজনদের উন্নতিসাধনে।

মঞ্জিমা গঙ্গোপাধ্যায় ও মধুছন্দা জানা

দু'জনেই নবম শ্রেণীর ছাত্রী

পড়াশোনার বাইরে কী কী হচ্ছে তোমাদের স্কুলে

ছোটদের আনন্দমেলার এই বিভাগে কলকাতা ও অন্যান্য জেলা স্কুলের ছেলেমেয়েরা পাঠাতে পারো স্কুলের একস্ট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বিষয়ক নানা খবর। একটি স্কুল থেকে অন্তত চারটি খবর আমাদের হাতে আসা চাই। সঙ্গে থাকা চাই রঙিন ফোটো। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'আনন্দমেলা ক্যাম্পাস বিভাগ' কথাটি।



মামলা মকদ্দমা

সিদ্ধার্থ ঘোষ

"আঃ রতন, তুই কি আমায় শান্তিতে থাকতে দিবি না! প্রত্যেক দিনই একটা না একটা ঝামেলা পাকিয়ে আমার এখানে এসে নাকিকান্না কাঁদতে শুরু করে দিবি, 'ডাক্তারবাবু আমায় বাঁচান। মহা বিপদে পড়ে গেছি। এবার আমাকে পুলিশে থানায় পুরবে, ভাড়াটে গুণ্ডায় রাস্তায় ধরে ঠ্যাঙাবে, যা হয় একটা কিছু করুন।' "

সকাল আটটায় ডাক্তার বিরিঞ্চি সেন নিজস্ব চেম্বার খুলতে না খুলতেই তাঁর কম্পাউন্ডার রতন দুঃসংবাদ দিল যে, সে তার বাড়িওয়ালা হিরুবাবুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ঘুসি মেরে হিরুবাবুর নাক ফাটিয়ে দিয়েছে। এখন বাড়িওয়ালা রতনের নামে মামলা ঠুকে দিয়েছে।

"ব্যাপারটা এতদূর গড়াল কী করে?" ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"মাসখানেক আগে এক সন্ধেবেলা বাড়িওয়ালা জল বন্ধ করে দিয়েছিল।"

"কেন?"

" গত ছ'মাস ধরে হিরুবাবু বলছিলেন, 'হয় ঘর দু'টো খালি করে দে, না হলে এক হাজার থেকে ভাড়া বাড়িয়ে মাসে দু'হাজার টাকা করে দে।' "

"তারপর?"

"কী আর বলব ডাক্তারবাবু, প্রায় প্রত্যেক দিনই সন্ধেবেলাই হিরুবাবু আমাকে দেখলেই খুব খারাপ খারাপ কথা বলতেন। তার উপর গতমাসে এক রাত্রে হিরুবাবু ওঁর বড়বাজারের দোকান থেকে ফিরে ছাদের জলের রিজার্ভারের স্টপকক বন্ধ করে দিয়ে আমাকে হাতে মারতে না পেরে জলে মারার ব্যবস্থা করে দিলেন।"

"তুই হিরুবাবুকে কী বললি?"

"বললাম, 'সেই মান্ধাতা আমলের উত্তর কলকাতার গলির গলি তস্য গলিতে একতলার দু' খানা ঘর, জলের

কোনও ডিরেক্ট লাইনও নেই, ঘরে ভাল করে আলো-হাওয়া খেলে না, পাম্পের জল আর রাস্তার কর্পোরেশনের পানীয় জলের উপর ভরসা করে বেঁচে আছি। মাসে হাজার টাকা করে ভাড়া দিই, এক বছর আগেই ভাড়া বাড়িয়েছি, আবার এর উপর ভাড়া চাইতে আপনার লজ্জা করা উচিত।'

"উনি বললেন, 'বাজে বকবক বন্ধ কর। তোর মতো ভাড়াটে কী করে উচ্ছেদ করতে হয় তা আমি জানি। তোকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে নতুন ভাড়াটে বসিয়ে আমি কুড়ি হাজার টাকা সেলামি আর মাসে মাসে তিন হাজার টাকা ভাড়া ওই ঘর দু'টো থেকেই আদায় করব, বুঝলি?'

"বললাম,'আমার বাবা তিরিশ বছর আগে ১৫০ টাকায় এ-বাড়ির একতলায় ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর আমি যতদূর সম্ভব ভাড়া বাড়িয়েছি, আপাতত মাসে হাজার টাকা দিচ্ছি। এই মুহূর্তে আর বাড়াতে পারব না। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে 'টেন্যান্সি অ্যাক্ট' চালু আছে। আইন মোতাবেক আপনি আমায় অত সহজে উচ্ছেদ করতে পারবেন না।'

" 'কী বললি রে গর্দভচন্দ্র, তুই আমাকে 'টেন্যান্সি অ্যাক্ট' শেখাতে আসছিস? তোর মতো ভাড়াটেকে আমি কর্পোরেশনের ময়লা ফেলার গাড়িতে তুলে ধাপার মাঠে ফেলে দিয়ে আসতে পারি, তা জানিস!'

"একে তো এই প্রচণ্ড গরম, তার উপর সেদিন আপনার চেম্বার থেকে ফিরে সারা শরীর ঘামে, দুর্গন্ধে চিটচিট করছে, আর আপনার বউমা নাতি এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করছে। এই রকম অবস্থায় মাথা গরম হয়ে গেল, কথা না বাড়িয়ে দিলাম ঝেড়ে হিরুবাবুর নাকের উপরে একখানা আপার কাট। উনি আঁক করে একটা শব্দ ছেড়ে সামনের রাস্তার উপর শিবনেত্র হয়ে শুয়ে পড়লেন। চারদিক ভিড় করে পাড়ার ছেলেবুড়ো যারা মজা দেখছিল, তারা দেখলাম হাসি-ঠাট্টা বন্ধ করে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল, হাওয়া আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পর হিরুবাবুর উকিল একখানা মারাত্মক চিঠি দিয়েছেন। এই দেখুন, সেই চিঠি। চিঠিতে যা বলা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধী, তার ফলে আমার অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, ফাঁসি এমনকী শূলদণ্ড পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এই সমূহ বিপদ থেকে আপনি আমায় বাঁচান। পাশের বাড়ির ভাড়াটে হৃদয়বাবুকে এই চিঠিটা দেখিয়েছিলাম।তিনিই বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধে হিরুবাবু সিভিল ও ক্রিমিনাল দু'টো সুটই ফাইল করেছেন। তাড়াতাড়ি কোনও উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। কারণ, দেরি করলে কোর্ট থেকে শমন এসে গেলে মুশকিল হবে।' আরও বললেন যে, 'হিরুবাবু এবার আপনাকে বাগে পেয়েছেন, সাক্ষী-সাবুদ জোগাড় করে আপনাকে বাড়িছাড়া করবেন।' "

বিরিঞ্চিবাবু দেখলেন, এর মধ্যে চার-পাঁচজন রোগী এসে গেছে। তিনি চেম্বারে ঢুকে চেয়ারে বসে ড্রাইভারকে ডাকলেন। সে ডাক্তারবাবুর ব্যাগ, স্টেথো, ব্লাড-প্রেশার মাপার যন্ত্র রেখে চলে গেল। রতন রোগীদের নাম-ধাম লেখা চার-পাঁচটা স্লিপ টেবিলের উপর রেখে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল। একজন সুবেশ স্মার্ট মেডিকেল সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভ চেম্বারে ওষুধের স্যাম্পেল হাতে চেয়ারে এসে বসল।

ডাক্তার সেন রতনকে বললেন, "একে তো তুই একনম্বরের মাথামোটা, তার উপর হঠাৎ হঠাৎ মাথা গরম হওয়া ব্যাপারটা আর গেল না। যাক, যা করে ফেলেছিস তার তো আর চারা নেই, চিন্তা করিস না। আমার বিশেষ বন্ধু অরুণের কাছে চলে যা। ওঁকে আর্লি আওয়ার্সে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পেয়ে যাবি। বেশ নামকরা উকিল। এখন সাড়ে আটটা, ঠিক দশটায় কোর্টের বার লাইব্রেরিতে ওঁর সঙ্গে দেখা কর। আমি অরুণকে একখানা চিঠি লিখে তোর হাতে দিচ্ছি। তুই তো অরুণকে চিনিস না, এটা নিয়ে যা, কাজে দেবে। এখন ওকে ফোনে পাব না, ও সকাল সকাল কোর্টে বেরিয়ে যায়।"

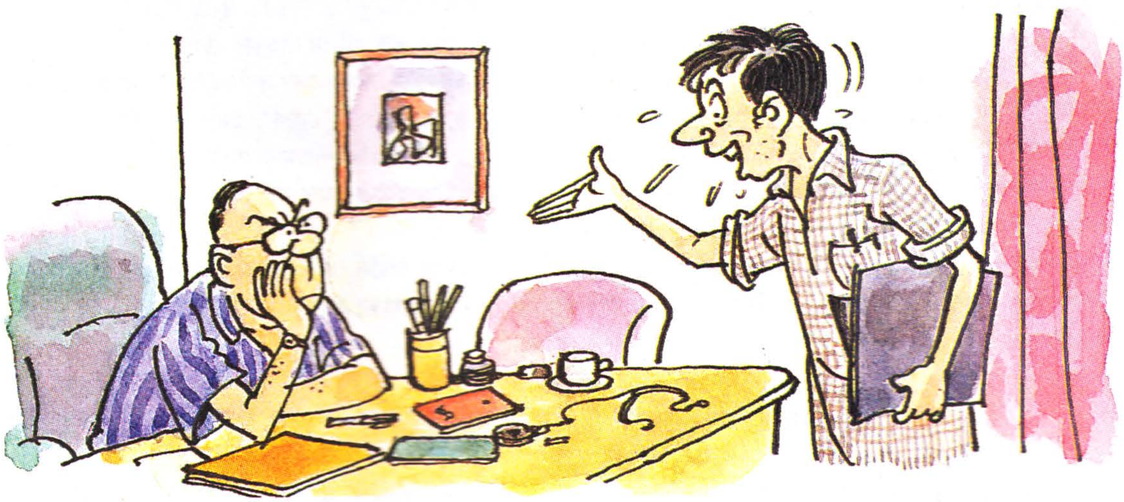
"আমি এখনই যাচ্ছি ডাক্তারবাবু।"

"হ্যাঁ ঠিক আছে, চলে যা, আর শোন, কোর্টে অনেকরকম লিগ্যাল খরচা-খরচ আছে। যেমন, স্ট্যাম্প পেপার কেনা, ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে এফিডেভিট করানো, রেজিস্ট্রেশন ফি, পেশকার, কোর্টবাবুদের পাওনা, আরও কী সব ছাই আছে। এই সব খরচের জন্য টাকা আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি, এই হাজার টাকার নোটটা রেখে দে। ওর থেকে কোর্ট-খরচা বাদ দিয়ে যা বাঁচবে, সেটা তুই ড্রাইভারজিকে দিয়ে দিবি। আমার গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেছে, তেল কিনতে হবে। অরুণ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আগেও কয়েকবার আমার মামলা-মকদ্দমার কাজ ও বিনা পয়সায় করে দিয়েছে, মানে ওর নিজস্ব ফি-টি গুলো আমার কাছ থেকে চার্জ করেনি। কিন্তু তোর ব্যাপারে কোর্ট সংক্রান্ত সব খরচ আমাকেই বিয়ার করতে হবে। এখন আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা, আর কোর্ট থেকে ফিরে কী হল, সব জানাবি।"

রতন ফিরল একটায়, হাতের ফাইলে কিছু কাগজপত্র। এসেই ডাক্তার সেনের চেম্বারে ঢুকে বললে, "আপনার বন্ধু অরুণবাবু দারুণ ভাল লোক, যাকে বলে দেবতুল্য ব্যক্তি। সমস্ত কাজ, স্ট্যাম্প পেপার কেনা,

পিটিশন টাইপ, এফিডেভিট করে ফর্ম ফিলাপ, কোর্ট ফি জমা দেওয়া সব কাজ করে তবে ছাড়লেন। খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল, মাঝে কোর্টের ক্যান্টিন থেকে মাখন-টোস্ট, অমলেট, মিষ্টি, চা খাওয়ালেন, আর আপনার খুব প্রশংসা করে বললেন, 'বিরিঞ্চি হচ্ছে আমার নিজের লোক, এত ভাল ডাক্তার এখন কলকাতায় আর ক'জন আছে? তোমার কোনও চিন্তা নেই, অ্যায়সা প্যাঁচে

"কী পাগলের মতো কথা বলছিস রতন, এই সামান্য মামলার খরচের জন্য অরুণটা হাজার টাকা ঝেড়ে দিলে। দাঁড়া, অরুণের চালাকি বার করে দিচ্ছি। সন্ধেবেলায় ভবানীপুরে ওর বেলতলার বাড়ির চেম্বারে আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আটটার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাব, সামনাসামনি কথা হবে। এখন তো আর ফোনে অরুণকে পাওয়া যাবে না। কোন জজের এজলাসে বসে মক্কেলের



তোমার ওই বাড়িওয়ালা হিরুবাবুকে ফেলে দেব যে, তিনি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নাকখত দিয়ে ভাড়া ঘর দু'খানা তোমায় দানপত্র করে দিয়ে তবে নিস্তার পাবেন। হুঁ হুঁ বাবা, হিরুবাবু এবার অরুণ উকিলের পাল্লায় পড়েছেন।"

"বোঝা গেল, ওসব বড় বড় কথা এখন থাক। এখন আমাকে বুঝিয়ে বল, কত কী কোর্টে খরচপত্র হল, আর তুই কত টাকাই বা ড্রাইভারজিকে পেট্রল কেনার জন্য দিলি? হিসেবটা দিয়ে বিদেয় হ, বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে মাথা ঠাণ্ডা করে রাত আটটায় আমার চেম্বারে আসবি। বিকেলে আমায় তিন-চারটে প্রাইভেট কল অ্যাটেন্ড করে শ্যামবাজারের 'মেডিকোস'-এ আজ ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত রুগি দেখার ডেট আছে।"

"ডাক্তারবাবু টাকা তো কিছুই ফিরল না। অরুণবাবু বললেন, 'পুরো হাজার টাকাই খরচ হয়ে গেছে। তোমার সামনেই তো আমি কোর্টের পেশকারবাবু থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় খরচা করে ফেললাম। জেনে রেখো, অনেক কম করচে খুব ভালভাবে কাজটা হয়ে গেল। আমার নিজস্ব ফি, মুহুরির টাকা তো কিছুই নিলাম না। ডাক্তারবাবুকে বলবে, খুব সুষ্ঠুভাবে কাজ হয়েছে। এরপর মামলার যেদিন ডেট পড়বে, আমি বিরিঞ্চিকে আগে থেকেই ফোনে জানিয়ে দেব। তখন আবার কিছু টাকা নিয়ে আমার এখানে এসে দেখা কোরো।' "

ঘাড় ভাঙছে, কে জানে!"

একবার বিরিঞ্চিবাবুর মনে হল, রতন মিথ্যে কথা বলছে না তো! হয়তো রতন ভেবেছে, বাবু কি আর অত ভেরিফাই করতে যাবেন! ধাপ্পা দিয়ে বাকি টাকাটা গাপ করে দিলে বাবু আর ধরতে পারবেন না। যদিও মাত্র মাস ছয়েক হল রতন চাকরিতে লেগেছে, বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ ভোঁতা, কথার ভেতরের মানে বুঝতে বেশ সময় লাগে। কিন্তু এর মধ্যেই কয়েকবার তিনি রতনের সততা ও নির্লোভ স্বভাবের প্রমাণ পেয়েছেন। যেমন, একবার একজন পেশেন্ট তাড়হুড়োয় তিনশো টাকা ভিজিট রতনের হাতে দিয়েছিল। কিন্তু রতন নিজে থেকেই ভদ্রলোককে বাড়তি একশো টাকা ফেরত দেয়। আর-একবার একজন পেশেন্টের সঙ্গী ভদ্রলোক তাঁর মানিব্যাগটি চেম্বারের একটা চেয়ারে মনের ভুলে ফেলে গিয়েছিলেন, দু'-তিন ঘণ্টা পরে ভদ্রলোক ফিরে এসে রতনের কাছ থেকে মানিব্যাগ ফেরত পেয়ে টাকা গুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রতনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। এ ছাড়া বিরিঞ্চিবাবু লক্ষ করেছেন যে, সেল্‌স রিপ্রেজেন্টেটিভরা ফ্রি মেডিসিন স্যাম্পেল দিয়ে গেলে রতন তাঁকে দেখিয়ে যত্ন করে তুলে রাখে ও পরে তাঁকে জানিয়ে গরিব রুগিদের তাঁর সামনেই দান করে দেয়। সুতরাং রতন যে এইভাবে তাঁর টাকা মেরে দেবে, এ ব্যাপারটা তিনি মন থেকে সায় দিতে



মামলা মকদ্দমা

পারছিলেন না। তবুও একটা খটকা মনের মধ্যে রয়ে গেল, কে না জানে কথায় বলে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। আর রতনের সংসারে তো অভাব দিন-রাত লেগেই রয়েছে।

সন্ধে সাতটায় ডাক্তার সেন রতনকে নিয়ে বেলতলায় অরুণ উকিলের চেম্বারের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। গাড়িতে বসে রাগে ডাক্তারবাবু নিজের মনেই গজগজ করতে লাগলেন, "অরুণের এতদূর অধঃপতন হয়েছে, এতটা ধূর্ত হয়ে গেছে। একটা সামান্য মামলার কাজের জন্য হাজার টাকা মেরে দিলে। এই কাজটা অন্য যে কোনও উকিল শ'তিনেক টাকার মধ্যে করে দিত।" অথচ তিনি বিনা পয়সায় সারাবছর অরুণের পরিবারবর্গকে বিভিন্ন অসুখে চিকিৎসা করে দেন, কই তখন তো ডাক্তারের ভিজিটের কথা স্বপ্নেও ভাবেন না।

অরুণ উকিলের বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি রতনকে বললেন, "তুই গাড়িতে চুপচাপ বসে থাক, আগে আমি অরুণের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিই, তারপর তোকে ডেকে পাঠাব।"

বেলতলায় অরুণ উকিলের একতলার চেম্বারে রাগে জ্বলতে জ্বলতে ঢুকে দেখলেন মক্কেলদের ভিড়, ভিজিটার্স রুমে অন্তত দশ-বারোজন বসে। পাশের ঘরে অরুণবাবু তিনজন মক্কেলের সঙ্গে কনসালটেশনে ব্যস্ত। সামনে টেবিলে ল রিপোর্ট, বেয়ার অ্যাক্ট ও আইনের সব বই খোলা, চেয়ারের পিছনে বইয়ের র‍্যাকে দামি দামি আইনের বই সাজানো রয়েছে। অরুণের বাঁ পাশে বসে টাইপিস্ট কানাইবাবু শর্টহ্যান্ডে ডিকটেশন নিচ্ছেন। ঘরে ঢুকতেই চশমা ভাল করে এঁটে মুখ তুলে অরুণবাবু বললেন, "আরে বিরিঞ্চি, হঠাৎ কী মনে করে এলি? আমাদের বাড়িতে এখন তো কারও অসুখবিসুখ নেই। যাই হোক, এসে গেছিস, বেশ করেছিস। বাড়ির ভিতরে চলে যা। ওখানে গিয়ে চা-টা খা। আমি এই ডিকটেশনটা দিয়েই বাড়ির ভিতরে গিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলছি।"

বিরিঞ্চি সেন বললেন, "ঠিক আছে, তুই কাজ সেরে ভেতরে আয়, তোর সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।"

একটু বাদে ভেতরের ঘরে অরুণ ঢুকতেই ডাক্তারবাবু বললেন, "তুই ব্যাটা আজকাল এত নীচে নেমে গেছিস তা আমার জানা ছিল না।"

"মানে, তুই শুধুমুদু আমার উপর এত খেপে গেলি কেন? তুই কী বলতে চাইছিস আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ডাক্তার সেন এবার খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না, তাই না? তুই বলতে চাস, আজ সকালে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আমার কম্পাউন্ডার রতন তোর সঙ্গে দেখা করেনি এবং আমার চিঠি তোকে দেখায়নি? তুই বলতে চাস একটা সামান্য এফিডেভিটের জন্য তুই আমার কম্পাউন্ডার রতনের কাছ থেকে একহাজার টাকা নিসনি? তুই শুধু মিথ্যুক নোস, তুই একটা টেররিস্ট।"

রাগে উত্তেজনায় ডাক্তারবাবু কাঁপতে লাগলেন।

"দ্যাখ বিরিঞ্চি, তুই বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস, তখন থেকে সমানে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছিস। হয় তোর মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে, না হলে তুই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে গেছিস। আমার সঙ্গে তুই চল, তোকে আমি সাইকিয়াটিস্ট সুশান্ত সাঁতরার কাছে নিয়ে যাই।"

"ফের তুই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিস। এই সামান্য ক'টা টাকার জন্য সবকিছু অস্বীকার করছিস। ঠিক আছে, আমি এখনই মোক্ষম প্রমাণ এনে হাজির করছি, তোর ওই উকিলি প্যাঁচমারা আমি বার করছি। আমার কম্পাউন্ডার রতন আর যাই হোক, সে তোর মতো মিথ্যেবাদী নয়।"

এবার সশব্দে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বিরিঞ্চি সেন কোনও দিকে না তাকিয়ে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গাড়ি থেকে রতনকে নামিয়ে অরুণের চেম্বারের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, "সকাল থেকে আজ যা যা ঘটেছিল অরুণের সামনে সব খুলে বলবি, মোটে ভয় পাবি না। দ্যাখ না ওর সব চালাকি আমি ভেঙে দিচ্ছি।"

অরুণ উকিল বাড়ির ভেতরের ঘরে হতবাক মুহ্যমান হয়ে বসে আছেন। সেইখানে ডাক্তার সেন রতনের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে সত্যি কথাটা এবার তুই বলে দে।"

রতন আর অরুণবাবু দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে আবার ডাক্তার সেন বললেন,"অবাক হয়ে কী দেখছিস? এই বাবু তোর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছেন, সেটা এবার বলে ফ্যাল।"

রতন আমতা আমতা করে বললে, "এঁর সঙ্গে তো কোর্টে আমার দেখা হয়নি, এঁকে তো আমি চিনি না।"

ডাক্তার সেন বললেন, "তবে কোর্টে কার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল?"

রতন বললে, "আপনাকে একটা কথা ওবেলা বলতে আমার ভুল হয়ে গেছে। সেটা হল, কোর্টের সেই উকিলবাবু কাজ শেষ হয়ে যাবার পর বিদায় নেবার ঠিক আগে, তাঁর মুহুরি এবং আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'বুঝলে হে রতনচন্দ্র, দরকার পড়লে আমি শুধু অরুণবাবু কেন, বরুণবাবুও হয়ে যাই। আবার খুব আর্জেন্ট ব্যাপারে কারও যদি মহিলা উকিলের প্রয়োজন পড়ে, তবে এই কালো কোট আমি ঘোমটার মতো মাথায় দিয়ে কিরণমালাও হয়ে যাই।' "

ছবি: দেবাশিষ দেব

পৃথিবীর সবুজ-সেনানী

আজ ৩৩ বছর ধরে দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার কাজটি করে চলেছে 'গ্রিনপিস'। লিখেছেন বেদদ্যুতি চক্রবর্তী



পরিবেশ

নিউ দিল্লির পরিবেশ মন্ত্রকের অফিসের সামনে গ্রিনপিসের সদস্যরা

অসীমের বুকে প্রাণে পরিপূর্ণ একমাত্র গ্রহটাকে কিছুতেই ধ্বংস হতে দেবে না পরিবেশ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় সংগঠন 'গ্রিনপিস'। এদের শাখা এখন গোটা বিশ্বের ৪০টি দেশে ছড়ানো।

এদের চার লক্ষ সদস্যের কাছে নিজের দেশের চেয়েও দামি স্বপ্নের এই পৃথিবী। ওরা জানে, দূষণ দেশের গন্ডি মানে না। আফগানিস্তান-ইরাকে বিস্ফোরিত টন-টন বোমার ধোঁয়া ঢুকে পড়ে প্রতিবেশী দেশগুলিতে। কিংবা অতলান্তিক সাগরে ফাটানো অ্যাটম বোমার তেজস্ক্রিয়তার বিষ ঢেউয়ে ঢেউয়ে আছড়ে পড়তে পারে ইউরোপ, আমেরিকা কিংবা এশিয়ার বালুতটে।

১৯৭১ সালে 'কোরম্যান' নামের একটি জাহাজ নিয়ে, গ্রিনপিসের সদস্যরা প্রতিবাদ করতে ঢুকে পড়েছিল আলাস্কা-সন্নিহিত সমুদ্রে, যেখানে আমেরিকা নিজেদের তৈরি পরমাণু বোমার ক্ষমতা যাচাই করার জন্যে শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সারা পৃথিবীকে সেদিনই গ্রিনপিস জানান দিয়ে দিয়েছিল, 'আমরা এসে গেছি।'

মাটি থেকে ২০-৩০ কি.মি. উপরে যে ওজোন গ্যাসের বর্ম পৃথিবীর জীবজগৎকে সূর্য থেকে বাঁচাচ্ছে, রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত 'ক্লোরোফ্লুরোকার্বন' গ্যাস সুযোগ পেলেই হাওয়ায় উড়ে সেই বায়ুস্তরকে শেষ করে দেয়। পৃথিবীতে নির্বিঘ্নে চলে আসে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি। এর ব্যাপক ছোঁয়ায় চামড়ায় ফুটে ওঠে ক্যানসারের লক্ষণ।



'আর্থ ডে' উদযাপনের দিনে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে স্কুলের ছেলেমেয়েরা

গ্রিনপিসের বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বাঁচাতে ক্লোরোফ্লুরোকার্বনকে হটিয়ে দিয়েছেন। নিজেদের আবিষ্কৃত ওজোন-নিরাপদ বিকল্প রাসায়নিক দিয়ে গ্রিনপিস তৈরি করেছে দূষণহীন গ্রিনফ্রিজ। ১৯৯৮ সালে, ভারত-পাকিস্তানের বোমা ফাটানোর সময় — নীরব প্রতিবাদে গ্রিনপিস বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাজমহল চত্বরে উড়িয়ে দিয়েছিল প্রতিবাদী লেখায় সমৃদ্ধ অহিংস বেলুন। ওঁদের ছ'টি জাহাজ, যখন যেমন দরকার ভিত্তিতে, ছুটে যায় সমুদ্রে তেলদূষণ কবলিত এলাকায় তেলসিক্ত পাখিদের রক্ষায় কিংবা বর্শাধারী শিকারিদের হাত থেকে শ'য়ে শ'য়ে তিমিমাছ বাঁচাতে। কখনও বা 'পৃথিবীর ফুসফুস', ব্রাজিলের আমাজন জঙ্গলের গাছকাটা রুখতে। ১৯৮৫ সালে, এমনই এক অভিযানে, পরমাণু বোমা পরীক্ষার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ফ্রান্সের সরকারি ঘাতকবাহিনীর হাতে খুন হয়ে যায় নাবিকসহ গ্রিনপিসের শান্তি জাহাজ 'রেইনবো ওয়ারিয়র'।

১৯৭০ সাল থেকে ২২ এপ্রিল দিনটি 'আর্থ ডে' বা 'পৃথিবী দিবস'। পৃথিবী, পরিবেশ, প্রকৃতি বাঁচাতে সেদিনের স্লোগান ছিল 'গিভ আর্থ এ চান্স'। গত ৩৩ বছর ধরে গ্রিনপিস সেই কাজটাই করে যাচ্ছে।

ইসাবেলার বাজুবন্ধ রহস্য



শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেপ্টেম্বরের এক মনোরম বিকেল। বসে আছি কার্জন পার্কের ঘাসের উপর, একটা গাছে হেলান দিয়ে। চারপাশে এন্তার লোক হাঁটছে, বসে আছে, গল্প করছে। হাতে এখন কোনও কাজ নেই। অনেকের ভিড়ে এই একাকিত্ব উপভোগ করতে মন্দ লাগছে না। বাচ্চাদের মতো হাতের মুঠোয় একটা আইসক্রিমের কোন। মাত্র দু'বছর আগে পাশ করা ডাঃ রাজর্ষি রায়কে এখানে কেউ চিনে ফেলবে এ সম্ভাবনা নেহাতই কম। অতএব নিশ্চিন্তে আইসক্রিমের গতি করছি।

এগারো-বারো বছর বয়সী ময়লা পোশাক পরা একটি রোগা মতো ছেলে এসে সামনে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই থাকল। ফেরিওয়ালা নয়।

"কী চাই?" আমি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করি।

"সাব চিঠ্‌ঠি, বলে একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরল।

"চিঠি?" আমি রীতিমত অবাক। "কে দিয়েছে?"

ছেলেটি দূরে তর্জনী তুলে দেখাল। ওর আঙুল অনুসরণ করে বেশ অনেকটা দূরে দৃষ্টি চালিয়ে মনে হল, কোনও এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোকের এক হাত উপরে তোলা। হাত নাড়লেন একবার দু'বার। অর্থাৎ বোঝাতে চাইছেন, উনিই চিঠিটি পাঠিয়েছেন। আশ্চর্য ব্যাপার।

ছেলেটির হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিলাম। একটা জুতোর দোকানের ক্যাশমেমো। পেছনের পাতায় ইংরেজিতে লেখা গোটা চার-পাঁচ বাক্য। হাতের লেখা জঘন্য। বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, "দয়া করে আপনার ঠিকানাটা জানালে খুব উপকার হয়। আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। আমার খুব বিপদ। আমার কাছাকাছি এখন আসবেন না।" শেষে অতিরিক্ত দু'বার 'প্লিজ' শব্দ যোগ করা। নীচে নাম — নিকোলাস হার্টলে।

ফাঁপরে পড়লাম। মাথার মধ্যে শুরু হয়ে গেল দ্বৈরথ যুদ্ধ। একটা মন বলছে, 'সাবধান, ইনভলভড্ হোয়ো না। চারদিকে ফ্রড আর ফ্রড।' আর-এক মন বলছে, 'ছি কাপুরুষ, ভয় পেয়েছ। হতেও তো পারে মানুষটা সত্যিই



কোনও গাড্ডায় পড়েছে।’ ছেলেটি তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

“দাঁড়িয়ে আছিস কেন?”

“সাব নে বোলা, জবাব লিয়ে যেতে। তব পাঁচ রুপেয়া মিলেগা।”

বিদ্যুৎঝলকের মতো বুদ্ধিটা মাথায় এল। খসখস করে প্রশান্তর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে দিলাম। রাত দশটায় টেলিফোন করতে বললাম। টক্কর যদি দিতেই হয়, সেটা হোক তবে সেয়ানে সেয়ানে।

ছেলেটা চলে গেল। একটু নজর করে দেখবার চেষ্টা করলাম। পিঙ্ক রঙের জামা গায়ে দূরের সেই লোকটাকেও আর দেখতে পেলাম না। আরও আধঘন্টা ওখানে কাটিয়ে ট্রামে চেপে রওনা দিলাম ডিকসন লেনে প্রশান্তর উদ্দেশে।

আসল কথা বলার আগেই মজা শুরু করে দিল ও।

“অ্যাঁ! কার্জনে! নির্জনে তুমি কার্জনে। কার জন্যে?”

একটু থামতে, আমি আবার কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার কি জো আছে!

“মাই গড! সার্জন কার্জনে ড্রিমিং। একা একা আইসক্রিমিং!” বহুক্ষণের চেষ্টায় আমার গোয়েন্দা বন্ধুটিকে ব্যাপারটা শোনাতে পারলাম।

“ও.কে ও.কে, রাত দশটায় তিনি টেলিফোন করবেন, এই তো? ঠিক আছে, খবর পাবে।”

ঘড়িতে দশটা বেজে দশ। শেষ রুগি চলে গেছে আধঘন্টা হল। উসখুস করছি। টেলিফোন বাজল। তুললাম। ওপারে প্রশান্তর গলা।

“কাল সকালে নো ডাক্তারি। এগারোটায় আমার বাসায়। কথা ফাইনাল।” ফোন নামিয়ে রাখল প্রশান্ত। ওর রহস্যাবৃত ‘মুড’-এ আমি ধাতস্থ হয়ে গেছি। এখন হাজার টেলিফোন করেও জানা যাবে না, তথাকথিত নিকোলাস ফোন করেছিল কি না।

পাক্কা এগারোটায় পৌঁছে গেলাম প্রশান্তর ১০২ নম্বর ডিকসন লেনের ডেরায়। ও তখন বাথরুমে। লক্ষ্মীমাসি চা দিয়ে গেল। সোফার উপর রাখা আছে খবরের কাগজ

থেকে কেটে নেওয়া কয়েকটা অংশ, ক্লিপ দিয়ে আঁটা। প্রশান্ত ওর দরকারের খবরগুলো এভাবেই কেটে কেটে রাখে। তারপর অবসর সময়ে সেগুলোকে আবার তারিখটারিখ দিয়ে ফাইল-বন্দি করে। কাগজের টুকরোগুলোতে চোখ বোলাতে লাগলাম। এই বাঞ্চে সব ক'টাই দেখছি গয়নাগাঁটি চুরি সংক্রান্ত।

প্রশান্ত এসে ঘরে ঢুকল।

"বুঝলে ডাক্তারসাহেব, হালে গয়নাটয়না চুরির ব্যাপারটা খুব বেড়েছে। সম্ভবত ছোট একটা গ্যাং। কিন্তু খুব চালাক আর খুব অ্যাকটিভ। ডেসপারেটও। ভিডিও ক্যামেরা ফিট করা দোকান থেকেও স্মার্টলি হাতসাফাই করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কখনও আবার বাড়ির কাজের লোককে পাঠিয়ে, নয়তো কাজের লোকের ভেক ধরে অপারেশন সারছে। মহিলাও আছে দলে।"

"তাই বলো। সেইজন্যে এই স্পেসিফিক কাগজের কাটিংগুলো।"

"অ্যাকচুয়ালি পল্লবীর কেসটা হাতে নিয়েছি দিন কয়েক আগে। তারই হোমওয়ার্ক আর কি!"

"কে পল্লবী?"

"তুমি চেন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। হেদুয়ায় বাড়ি। রমেশের বোন।"

"রাইট, মনে পড়েছে। কী প্রবলেম ওর?"

"পল্লবীর মামাতো বোন কৃষ্ণার বিয়ে হয়েছে বিখ্যাত মল্লিকবাড়িতে। কৃষ্ণার শ্বশুরবাড়িতে দিন পনেরো আগে বিরাট চুরি হয়ে যায়। ওর শ্বশুরের ঘরের সিন্দুক থেকে পূর্বপুরুষের আমলের দামি দামি সব গয়না চুরি হয়ে যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল একখানা কেয়ূর। দাম মিনিমাম পঞ্চাশ লাখ। কৃষ্ণার শ্বশুরের প্রপিতামহের আমলের।"

"কেয়ূর কী?" এ নাম আমার অজানা। প্রশান্তর ঠোঁটের কাছে একটা দুষ্টু হাসির রেখা।

"কেয়ূর ইজ কেয়ূর। মে বি দ্য কাজিন অব কোহিনূর!"

শুরু হয়ে গেল ফিচলেমি। আমি বিরক্ত, "থাক, বলতে হবে না।"

"চটছ কেন রাজ, এ হচ্ছে ভেরি মূল্যবান হাতকড়া। অন্দরমহলের জেলখানায় সুন্দরী স্ত্রীকে আজীবন বেঁধে রাখার মন্ত্রগুপ্তি।"

বুঝলাম, এখন আর কথা বার করা মুশকিল। আসল প্রসঙ্গে আসা যাক। জিজ্ঞেস করলাম, "নিকোলাস সম্বন্ধে কিছু বলবে?"

"বলব মানে! তিনি আসছেন সাড়ে এগারোটায়।" বলতে বলতেই হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শোনার চেষ্টা করল প্রশান্ত, উঠে জানলার ধারে গেল এবং ফিরে এল আমার কাছে। আমার দিকে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল, "তোমার তিনি প্রায় দ্বারে উপস্থিত। অতিথি রিসিভ করার ব্যাপারটা আমি সারছি। তুমি ওঘরে গিয়ে চুপটি করে বসো। ও পাবলিক ড্রয়িং রুমে ঢুকে এলে তুমি ওঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট বাইরে ঘুরে বেড়াবে। তারপর এমনভাবে এসে এই ঘরে ঢুকবে যেন এটাই তোমার বাড়ি। আমি তোমার বন্ধু, তোমার অপেক্ষাতেই বসে আছি। ও.কে?" ডোর বেল বাজল।

পনেরো মিনিট তো নয়, যেন পনেরো ঘণ্টা। সময়টা কাটিয়ে উপরে উঠে ডোর বেল বাজালাম। দরজা খুলে দিল লক্ষ্মীমাসি। ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল প্রশান্ত। রীতিমত চেঁচিয়ে উঠল, "এই প্রশান্ত, গুড মর্নিং। তোমার জন্য হাফ অ্যান আওয়ারের উপর অপেক্ষা করে বসে আছি। কোথায় ছিলে?"

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলেও সামলে নিলাম। সত্যিই তো, এ যখন আমারই বাড়ি, প্রশান্ত রায় তো তবে আমার নামই হওয়া উচিত। আমিও তালে তালে ঠেকা দিলাম, "গুড মর্নিং। একটু জরুরি কাজ ছিল।"

"তুমি মিস্টার হার্টলেকে টাইম দিয়েছ সাড়ে এগারোটা, আর তুমিই পনেরো মিনিট লেট। ভেরি ব্যাড।" এই কথাগুলো ও ইংরেজিতেই বলল। ও বলে যেতে থাকল, "আমি ওঁর সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাচ্ছিলাম।"

"ইনি নিকোলাস হার্টলে। ডাকনাম 'নিক'। বাড়ি নিউ ইয়র্ক। টুরিস্ট। ভারত সম্বন্ধে খুব আগ্রহ। বিশেষত শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে। আর এ হচ্ছে আমার খুব ভাল বন্ধু, প্রশান্ত। কাল এর কাছেই চিঠি পাঠিয়েছিলে। জুতোর ব্যবসা। জাস্ট শুরু করেছে।"

অভিবাদন জানাব কী নিকোলাসকে, জুতোর ব্যবসা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম। সাতপুরুষে আমার কেউ জুতোর ব্যবসা করেনি। প্রশান্ত ততক্ষণে আমার কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে সোৎসাহে গলা চড়িয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বলল, "আমি নিককে অলরেডি আমাদের ডুয়ার্সের চা-বাগানে দু'টো দিন কাটিয়ে আসতে বলেছি। নিক, তুমি ঘেঁটু বোসের এই অফারটাকে ইগ্‌নোর করছ না তো?"

"শিওরলি নট ঘ্যাটু। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি বর্তমান বিপদ থেকে রেহাই চাই, তোমাদের হেল্‌প চাই।"

মনে মনে বললাম, 'শ্রীযুক্ত ঘেঁটু বোস, তোমার তল পাওয়া ভার।' নিকোলাসকে একটু জরিপ করার সুযোগ পেলাম। বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। হাইট পাঁচ ফুট আট-নয় হবে। গায়ের রং ফরসা কিন্তু উজ্জ্বল নয়।



ইসাবেলার বাজুবন্ধ রহস্য

একটু ফ্যাকাসে ভাব। চেহারা তাগড়াই। সোনালি চুল। মুখে বিস্তর সরষে দানা সাইজের বাদামি ছোপ। পরনে সাদা রঙের গোল গলা সুতির গেঞ্জি আর নীল জিন্‌স। চোখে ফোটোক্রোমোটিক চশমা। পায়ে কিটো গোছের স্যান্ডাল। হাতে ছোট একটা ফোল্ডার।

"নাও নাও নিক। প্রশান্ত এসে গেছে, এবার তোমার সমস্যার কথা বলে ফ্যালো।"

প্রশান্তর হাবভাব কেমন একটু অন্যরকম। একটু বেশি প্রগল্‌ভ। একটু বোকা বোকা চাউনি। নিকোলাসের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। যেন ভয় পাওয়া হরিণছানা, বাঘে তাড়া করেছে।

নিক এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেল। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোদ্দ ফুট বাই কুড়ি ফুটের ড্রয়িংরুমটাকে আর-একবার মেপে নিয়ে একটু স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করল বোধ হয়। তারপর বলল, "তোমাদের কাউকে চিনি না, জানি না। কোন বিশ্বাসে ওই ভিড়ের মধ্যে ব্লাইন্ডলি এই প্রশান্তের কাছে সাহায্য চেয়েছি, তার কোনও ব্যাখ্যা আমারও জানা নেই। গতকাল ওকে চিঠিটা পাঠানোর একটু আগে আমি ওর পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি। ও নোটিস করেনি। একা একা রেলিশ করে আইসক্রিম খাচ্ছিল। আমার হার্ট তখনই বলল, দিস জেন্টলম্যান ইজ দ্য রাইট পার্সন। যাই হোক, আজ একটা সিক্রেট তোমাদের বলব। ইন ফ্যাক্ট, বাধ্য হয়েই বলব। আর কোনও উপায়ও নেই। একটা শুধু অনুরোধ, আমার বিশ্বাসকে তোমরা মর্যাদা দেবে। হেল্প করতে যদি না-ও পারো, কাকপক্ষীকে গোপন কথাটা জানাবে না। ও.কে?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, তুমি বলো।" আমি গার্জেনের মতো হাবভাব দেখালাম।

নিকোলাস বলতে শুরু করল, "আমার সমস্যা এবং সেন্টিমেন্ট বুঝতে হলে তোমাদের একটা ঐতিহাসিক সত্যি ঘটনা শুনতে হবে। আমি সংক্ষেপে বলছি।"

লক্ষ্মীমাসি এসে চায়ের কাপ সাজিয়ে দিয়ে গেল। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে নিকোলাস বলতে থাকল, "তোমরা জানো, কলম্বাসের মতো গ্রেট এক্সপ্লোরার হয় না। ওঁর চোখে স্বপ্ন ছিল কিন্তু টাকা ছিল না। কেউ ওঁকে স্পনসর করতেও রাজি ছিল না। এই সময় স্পেনের রানি ইসাবেলা এগিয়ে এলেন। সান্তা মারিয়া ও আরও দু'টো জাহাজ নিয়ে কলম্বাসের যাত্রা শুরু হল। প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টো অভিযানই ছিল চমৎকার। হিসপানিওলা, ভার্জিন আইল্যান্ড, পুয়েরতো রিকো, এসব জায়গা আবিষ্কার তো হলই, উপরন্তু নতুন উপনিবেশ থেকে পাওয়া সোনাদানায় স্পেনের শূন্য রাজকোষ ভরে গেল। রাজা ফার্দিনান্দ আর রানি ইসাবেলা তো আনন্দে আত্মহারা। পুরস্কার হিসেবে এক রাজকীয় অনুষ্ঠানে রানি কলম্বাসের হাতে পরিয়ে দিলেন এক অসামান্য বাজুবন্ধ। হিরে আর দামি দামি রত্নে ঠাসা সে গয়না। কৃতজ্ঞচিত্তে মাথা নুইয়ে সে উপহার নিলেন কলম্বাস। শোনা যায়, সবসময় নাকি সেটা নিজের বাজুতে পরে থাকতেন।"

প্রশান্ত বাচ্চা ছেলের মতো থুতনিতে হাত রেখে চোখ বড় বড় করে শুনে যাচ্ছে। নিক বলে চলল, "তৃতীয় অভিযানে গিয়ে সব অঙ্ক ওলটপালট হয়ে গেল। প্রথমত, আবহাওয়া প্রতারণা করল। দ্বিতীয়ত, কলম্বাসের শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। তৃতীয়ত, গত অভিযানে তৈরি করে যাওয়া উপনিবেশ সান্টো ডোমিঙ্গোতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। সোনাদানা আদায় একেবারে কমে গেল। এদিকে একদল কুচক্রী রাজা-রানির কানে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করল। কলম্বাস নাকি রাজা-রানিকে কেয়ার করেন না। বোবাডিলা নামের এক নিষ্ঠুর সেনাপতি রানির ফরমান নিয়ে সান্টো ডোমিঙ্গোতে পৌঁছেই কলম্বাসকে বন্দি করল। এদিকে এই তিন নম্বর অভিযানের সময় ত্রিনিদাদ আবিষ্কার করার পর বার্বারিকো নামে এক ধীবরের সঙ্গে কলম্বাসের সখ্য গড়ে ওঠে।"

"তাই নাকি! তারপর, তারপর?" প্রশান্ত বাচ্চাদের মতো গল্প শুনছে, অদ্ভুত।

"হ্যাঁ, খুব ভাল বন্ধুত্ব। বন্দি হবার পর একদিন লুকিয়ে জেলখানায় আসে বার্বারিকো। কলম্বাসের সঙ্গে দেখা করতে। ওর হাতে সেই মহামূল্য বাজুবন্ধটা তুলে দেন কলম্বাস। অনুরোধ করেন, এটার যত্ন নিতে। বার্বারিকো কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নেয়। অবশ্য এরপর রাজা-রানি আর কলম্বাসের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। চার নম্বর অভিযানও করে ছিলেন কলম্বাস। এসব অবশ্য তোমরা জানোই।"

"হ্যাঁ, একটু একটু কোথায় শুনেছি যেন।" দাঁত বার করে বলে ওঠে প্রশান্ত।

"এই বার্বারিকোর বংশধর আমি। পুরুষানুক্রমে কলম্বাসের দেওয়া বন্ধুত্বের পবিত্র স্মারকটা বুক দিয়ে আগলে রেখেছি। গল্প অনেক লম্বা। তোমাদের নির্যাসটুকু বলছি। আমাদের এক পূর্বপুরুষ জোনাথনের কাছ থেকে বুবনটা একসময় চুরি হয়ে যায়।"

"বুবন কী?" আমি প্রশ্ন করি।

"ওটা ওই স্মারকের নাম। জোনাথনের পৌত্র অর্থাৎ আমার ঠাকুরদা পল অনেক টাকার বিনিময়ে সেটাকে উদ্ধার করেন এক কিউরিও শপ থেকে। হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক হিসেবে তোমরা আমার ঠাকুরদার নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।"

" শুনেছি বইকী।" প্রশান্তর একেবারে বিগলিত ভাব। ওর হল কী?

"এক মাস আগে নিউ ইয়র্কের এক সাপ্তাহিক কাগজে

বুবনের উপর একটা লেখা বার হয়। কী করে যে ওরা জানল, জানি না। ব্যস, আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।"

"কেন কেন?" আমার গোয়েন্দাবন্ধু উদ্‌গ্রীব।

"কেন আবার কী? শুরু হয়ে গেল উৎপাত। প্রথমে রয়েসয়ে, পরে মরিয়া হয়ে উঠল ওরা। বুবনটা আমরা কখনও ভল্টে রাখিনি। সংস্কার বলতে পারো। আজ থেকে ঠিক সতেরো দিন আগে, একই রাতে গুন্ডাদের হাতে আমার বাবা আর ছোট ভাই খুন হয়ে যায়।"

গলা ভারী হয়ে যায় নিকোলাসের। একটু সময় মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে। খানিকটা পরে আবার বলতে থাকে, "বুবনটা ওরা খুঁজে পায়নি। মাত্র দু'দিনের জন্য আমি শহরে ছিলাম না। প্রাণে বেঁচে গেলাম।"

"এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।" আমি বলি।

"হ্যাঁ। বাবার এক বন্ধু উপদেশ দিলেন, বুবনটা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে। কোনওক্রমে তোমাদের দেশে পালিয়ে এলাম। বাবা ও ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক পালন করারও সুযোগ পাইনি।"

নিক বলে যেতে থাকে, "কলকাতায় এসে নেমেছি জাস্ট সাতদিন আগে, পাঁচই সেপ্টেম্বর। পেয়িং গেস্ট হিসেবে উঠেছি কিড স্ট্রিটের কাছে এক পার্শি মহিলার আস্তানায়। সাত তারিখে স্ট্র্যান্ড রোডের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। তিনটে লম্বা-চওড়া ছেলে আমার ঝোলা ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। পাসপোর্ট, অল্প কিছু ডলার আর আর্মলেটটা ছাড়া সবই ছিল ওই ব্যাগে। ভাবলাম ছিঁচকে ছিনতাইবাজদের কাজ। ভুল ভেঙে গেল পরের দিন। পরদিন আমার অনুপস্থিতিতে আমার আস্তানার ঘর কেউ বা কারা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে পালিয়েছে। বালিশের তুলোটুলো বার করে একাকার। আমার গৃহকর্ত্রী অবাক। গত তিরিশ বছরে ওখানে নাকি কোনও চুরির ঘটনা ঘটেনি। বুঝলাম, এ যে-সে জিনিসের সন্ধান নয়।"

প্রশান্ত ফোড়ন কাটল মাঝপথে, "নিশ্চয়ই তোমার আর্মলেটটা হাতাতে এসেছিল।"

"অবশ্যই।"

"পুলিশকে কিছু জানাচ্ছ না কেন?" আমি বললাম।

"তা হলে আর রক্ষে আছে? পুলিশ মানে, মিডিয়া জানবে। একজন হলে ম্যানেজ করা যায়। একশো জনকে কীভাবে এড়াব?"

"তোমার তো দেখছি ভারী বিপদ।" প্রশান্তর কেমন ন্যাকা ন্যাকা গলা।

নিক ডান হাতের মুঠি শক্ত করে বলে, "সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যাব আপাতত। ওখানে আমাদের বড় এস্টাবলিশমেন্ট আছে। তোমরা আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবে? আই মিন, যদি টাকার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার ধার দাও, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।"

"ধার! পঞ্চাশ হাজার!" বুঝতে পারি, আমার গলা থেকে যে ফ্যাসফেসে আওয়াজটা বেরোল, তার মানে দাঁড়ায় 'না'।

"ওয়েল স্যার, টাকা ধার চাইছি বলে ঘাবড়ে যাচ্ছ? রিল্যাক্স, আমারই অনেক বেশি চিন্তায় থাকার কথা। আমি আর্মলেটটা তোমাদের কাছে সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে রেখে যেতে চাই। এর বাজার দর জানো? মাত্র পাঁচ লক্ষ ডলার।"

"অ্যাঁ!" আমার ভিরমি খাবার জোগাড়। আর প্রশান্ত? ওর চোখ দুটো লোভে চকচক করছে।

"কিন্তু সাহেব, আমরা তো জিনিসটা চোট করেও দিতে পারি। কী বিশ্বাস আমাদের?" প্রশান্ত আগের মতোই ন্যাকা ন্যাকা গলায় প্রশ্ন করে।

"এই পয়েন্টেই তো ভারতবাসী এখনও বিশ্বের কাছে নমস্য। ভারতীয়দের সততার কথা সারা পৃথিবী জানে। আমার বিশ্বাসটা সেখানেই।"

দারুণ তোল্লাই দিচ্ছে তো বিদেশিটা! মোটেই ভাল ঠেকছে না আমার। বলেই ফেললাম, "বেচে দিচ্ছ না কেন?"

একেবারে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো চোখমুখ রাঙিয়ে হিসহিস করে উঠল নিকোলাস, "হাউ ডেয়ার ইউ! তুমি একথা বলার সাহস করো কী করে? এই পবিত্র স্মারক বিক্রি করার কথা আমার একজন পূর্বপুরুষও ভাবেনি, আমিও ভাবছি না। বংশ পরম্পরায় এ জিনিস আমাদেরই।"

নিকোলাসের রণং দেহি মূর্তি দেখে আমি একটু সিঁটিয়ে গেলাম। কিন্তু প্রশান্ত কি পাগল হয়ে গেল? দু' হাত-পা এলোপাতাড়ি নাচাতে নাচাতে ও বলল, "কিছু ভেবো না। আমাদের দেশের অতিথি তুমি। তোমাকে সাহায্য করা আমাদের ধর্ম। আমি প্রশান্তকে বোঝাব। তুমি আজ সন্ধে সাতটায় একবার আসতে পারবে? প্রশান্ত যদি অ্যাকসেপ্ট না-ও করে, আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডেফিনিটলি দিয়ে দেব।"

প্রশান্তর এখনকার চোখ দু'টোকে হায়েনার চোখের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সৃষ্টিছাড়া লোভ ওকে গ্রাস করেছে।

"কী বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাব ঘাটু..." প্রশান্তর হাত দুটো চেপে ধরে নিক।

আমার ভেতরটা তখন রাগে ফুঁসছে প্রশান্তর কথাবার্তায়, আচরণে। নিকের দিকে তাকিয়ে আমি অনেকটা রাগতস্বরেই বললাম, "কিন্তু তোমার গ্রেট সুভেনির, আই মিন পবিত্র আর্মলেটটা তো একবার



দেখালেই না।"

প্রশান্তও হঠাৎ যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল, "ঠিকই তো। রানি ইসাবেলার জিনিস বলে কথা, একবারটি দেখাও না প্লিজ!"

"আই গট ইউ প্রশান্ত। তোমার সন্দেহটা আমি বুঝি। আমি তো ফ্রড হতেই পারি।" নিকের চোখেমুখে বিদ্রূপ মেশানো হাল্কা হাসি। কথা বলতে বলতেই প্যান্টের কোনও এক চোরাপকেট থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করে আনল নিক। মোড়ক খোলা হল। যা ভেবেছিলাম, তেমন কিছু আহামরি নয়। একটা বাজুবন্ধ বটে। ম্যাটমেটে, অনুজ্জ্বল। মনে মনে ভাবলাম, এর দাম পাঁচ লাখ ডলার!

"ওই ফ্যাকাসে চেহারাটা কৃত্রিম। লোকের চোখ এড়ানোর জন্য। আসলটা দেখতে চাও?" উত্তরের অপেক্ষা না করে পকেট থেকেই একটু তুলো আর একটা কী যেন লোশনের শিশি বার করল। তুলোটা লোশনে ভিজিয়ে গয়নাটায় দু'-চারবার ঘষতেই সে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। হিরে, জহরত একযোগে ঝকমক করে উঠল।

"মাই গড! দেখি, দেখি..." বলেই প্রশান্ত একেবারে হামলে পড়ল। নিকের হাত থেকে তুলোটা নিয়ে ঘষঘষ করে ঘষতেই লাগল, "কী দারুণ, কী দারুণ!" প্রশান্তর পাগলের মতো আচরণে আমার বিরক্ত লাগছিল।

সন্ধে সাতটায় আসছে জানিয়ে নিক বেরিয়ে গেল।

"মার দিয়া কেল্লা," বলে দু'হাত আকাশের দিকে তুলে শরীরটা বার দুয়েক ঝাঁকিয়ে নিল প্রশান্ত। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "এখন নো বাড়ি যাওয়া। আজ এখানেই লাঞ্চ সারবে। আমি আসছি একটু।" বলেই লক্ষ্মীমাসিকে কী নির্দেশ দিয়ে তিড়িং করে এক লাফে ঘর থেকে সোজা রাস্তায়।

দুপুরে প্রশান্তর ঘরেই পরিপাটি ঘুম দিলাম। বন্ধুবর সেই যে বেরিয়েছে এখনও দেখা নেই। দরজায় ঘণ্টা পড়ল। ঘড়িতে পাঁচটা বেজে দশ। গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। একটি বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়সের স্বাস্থ্যবান ছেলে দাঁড়িয়ে।

"স্যার, আপনিই ডাঃ রাজর্ষি রায়?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"স্যার, প্রশান্ত রায় আপনাকে এই চিঠি আর এই প্যাকেটটা দিয়েছেন। চিঠিতে সব লিখে দিয়েছেন। আমি

আসছি স্যার। গুড ডে।”

ছেলেটি চলে যেতে চিঠি খুললাম। সংক্ষিপ্ত চিঠি প্রশান্তর, “আটকে গেছি। টাকাটা পাঠালাম। নিককে দিয়ে জিনিসটা নিয়ে রেখো। দরজার ছিটকিনি খোলা রাখবে।”

বুকের ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেল। যে ঝামেলা এড়াতে প্রশান্তর ঠিকানা দিলাম, সেই ঝামেলাই। কিন্তু ছিটকিনি খোলা রাখব কেন? ভগবানকে ডাকছি, ওই নিকোলাস যেন এ-মুখো আর না হয়। ওর বাবা মরেছে, ভাই মরেছে, আরও কত মরবে কে জানে! তা ছাড়া যদি শহরের গয়না-চোরদের কৃপাদৃষ্টি পড়ে! আর ভাবতে পারছি না।

ঘড়ির কাঁটা সাতটা ছাড়িয়ে গেছে পনেরো মিনিট আগে। বাঁচা গেছে, হার্টলেসাহেব তা হলে নট কামিং। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে ডোর বেল বেজে উঠল। ভয় ভয় করছিল। দরজা খুলে দিলাম। দরজার ওপারে নিক। ঘরে ডেকে নিলাম।

“একটু দেরি হয়ে গেল জ্যামের জন্য। ঘাটু নেই?”

“না।” আমার না শুনে মনমরা হয়ে গেল নিক।

“দেন? তোমাদের হেল্প তা হলে পাচ্ছি না?”

“না, না, তা কেন? ঘাটু আটকে গেছে। ওর বন্ধুর বাবার হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। টাকা রেখে গেছে। এই নাও।” প্যাকেটটা ওর হাতে তুলে দিলাম।

“ইজ ইট?” সহসা নিকের মুখময় হাজার ওয়াটের আলোর দ্যুতি। আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, “তোমরা বাঁচালে আমাকে।” প্যাকেটের ভিতরটা একবার দেখে নিয়ে বলল, “শান্তিনিকেতন দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখানে একটি ঘন্টা থাকাও এখন বিপজ্জনক। যাই হোক, বুবনটা আর-একবার দেখে নাও।” তিন-চারটে আস্তরণ পরপর খুলে আবার দেখাল সেই গয়না। সকালেই দেখেছি। হিরের আলোয় চোখ ঠিকরে যাচ্ছে।

“ঠিক আছে? প্যাক করছি!” আমি সায় দিতেই ও বাঁধাছাঁদা সারল। হয়ে গেলে ওর ব্যাগ থেকে একটা সাদা কাগজ আর সেলোটেপের রিল বের করল। ব্যাগের মধ্যে আঁতিপাতি করে কী যেন খুঁজল।

“একটা পেন দাও না। কোথায় যে রাখলাম।”

আমি প্রশান্তর টেবিলের কাছে গিয়ে ওখান থেকে একটা কলম এনে ওর হাতে দিলাম।

“সই করে, এই ট্রান্সপারেন্ট টেপ দিয়ে প্যাকেটের মুখটা এঁটে দিয়ে যাচ্ছি। যত্ন করে ভল্টে রেখে দেবে। খুলবে না। আমি ডেফিনিটলি এক বছরের মধ্যে এসে তোমাদের টাকা ইন্টারেস্ট সুদ্ধ দিয়ে এটা ফেরত নিয়ে যাব। আর যদি এক বছরের মধ্যে না আসি, বুঝবে মার্ডার হয়ে গেছি। তখন...আমি আর ভাবতে পারছি না,” হঠাৎই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নিকোলাস।

“কী ব্যাপার!” আমি অবাক।

“বার্বারিকো বংশের আমি কুলাঙ্গার। জেনেশুনে ছেড়ে যাচ্ছি আমাদের বংশের বুবন।” আমার হাতে প্যাকেটটা ধরিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে উঠে পড়ল নিক।

নিকোলাসের বেরিয়ে যাওয়া হল না। প্রশান্ত এসে ঘরে ঢুকেছে।

সঙ্গে আরও দু'জন লম্বা-চওড়া যুবক। একজনকে চিনি, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর সমীর সরকার। দ্বিতীয়জনকে চিনি না। প্রশান্তর উচ্ছ্বাস চরমে।

"ডিয়ার নিকোলাস, তোমাকে ভুলব না। বাড়ি বয়ে এসে কী জিনিসই না দেখালে। টাকা পেয়েছ?"

"অশেষ ধন্যবাদ ঘাটু। আমিও তোমাদের সারল্যের কথা ভুলব না। আমার তাড়া আছে, আজ আসি।"

"শেষ রক্ষাটা করতে পারলে না মিস্টার নিকোলাস হার্টলে ওরফে ফ্রাঙ্ক গ্রে ওরফে রঘুনাথ সেহ্‌গাল ওরফে লম্বা লিস্ট," প্রশান্তর চোখেমুখে আশ্চর্য গোবেচারা হাসি। আমি তো হতভম্ব। এসবের মানে কী?

হঠাৎই গর্জে উঠল নিকোলাস, "কী যা-তা বলছ?"

সে গর্জনকে পাত্তা দিল না প্রশান্ত। আমার দিকে চেয়ে বলল, "যদিও মিস্টার নিকের বারণ আছে, তথাপি ওই প্যাকেটটা একটিবার খুলে দ্যাখো, পঞ্চাশ হাজারের বদলে কোন সাম্রাজ্য তুমি বন্ধক রাখলে।"

"আমি দেখে নিয়েছি ভাল করে," আমি বললাম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।

"তবুও দ্যাখো।"

আবার চেঁচিয়ে উঠল নিক, "ইউ কান্ট ডু দ্যাট।"

"শাট আপ," ইনস্পেক্টর সরকারের রিভলভারের নল তখন যুবকের নাক থেকে বিঘতখানেক দূরে।

সেলোটেপ ছিঁড়ে একের পর এক আস্তরণ খুলতে থাকলাম আমি। শেষ কভারটা খুলতেই... মাই গড, অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি! সাদামাটা স্টিলের একটা বালা মাত্র। বাজারে হেসেখেলে একশো টাকায় পাওয়া যায়। প্রশান্ত আমার পর্যুদস্ত অবস্থা দেখে কাঁধে চাপড় মেরে বলল, "কলম্বাসের স্পেশ্যাল আর্মলেট এখন নিকোলাস সাহেবের ঝোলাব্যাগের মধ্যে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে।"

"কিন্তু কখন হল এসব?" প্রশ্ন না করে আমি পারি না।

"কলম আনার ফাঁকে," প্রশান্ত হেসে বলল। ওর মুখ এখন নিকোলাসের দিকে ঘোরানো, "জাদুকর হবার অনেক গুণই ছিল তোমার মধ্যে, কিন্তু কপাল দোষে হয়ে গেলে ক্রিমিনাল।"

এখন রাত আটটা বেজে কুড়ি মিনিট। প্রশান্তর ঘরে বসে আছি। সমীর সরকারও রয়েছেন। নিককে যথাস্থানে চালান করে দেওয়া হয়েছে। প্রশান্ত এই কেসটার ব্যাপারেই ব্যাখ্যা করছিল। বলছিল, "খটকা প্রথমেই লেগেছিল। জুতোর দোকানের ক্যাশমেমোর তারিখের জায়গাটা কালি দিয়ে বিশ্রিভাবে কাটা কেন? বেশি চালাকরা মাঝে মাঝে আশ্চর্য বোকার মতো কাজ করে। দেখা হতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। জুতোটি বিদেশের নয়, আনকোরা নতুনও নয়। উচ্চারণেও গোলমাল। আমেরিকান ছেলেরা বলবে চিকানো ইংলিশ অর্থাৎ জর্জ বুশ মার্কা ইংরেজি। অথচ এ বলছে টনি ব্লেয়ার ঘেঁষা ইংলিশ। চোখের চশমা নতুন নয়। ওর ফ্রেমের ভিতরপিঠে ডালহৌসি পাড়ার 'কুণ্ডু অপটিক্যালস'-এর নিশান। চশমা টেবিলে রেখে মুখ মোছার সময় দেখে নিয়েছি। তুলো দিয়ে আর্মলেটটা আরও ঝকঝকে করার ভান করে দেখে নিলাম ওটার ডিজাইন আর হাতের কাজ পুরোদস্তুর ভারতীয়।"

"তার মানে ইসাবেলা কলম্বাসের গল্প-টল্প পুরোটাই ঢপ?" জানতে চাইলাম।

"আজ দুপুরে বেরিয়ে কত কাজ সেরেছি। নিক জানতে পারেনি, পিছু ধাওয়া করে ওর ডেরা দেখে এসেছি। সরকার সাহেব, আপনার লোকজন ওখানে এতক্ষণে ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছে আশা করি। পাঁচ তারিখ নিকোলাস হার্টলে নামের কেউ দমদম এয়ার পোর্টে ল্যান্ড করেনি।"

আমি মাঝপথে প্রশান্তকে থামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করি, "আর কলম্বাসের গল্পটা?"

হাত তুলে আমাকে নিবৃত্ত করে প্রশান্ত, "আমার ইতিহাসপাগল বন্ধু মনোজ তালুকদারকে পাকড়াও করেছিলাম। ও কনফার্ম করল, ইসাবেলা, ফার্দিনান্দ, কলম্বাস, সান্টো ডোমিঙ্গোতে বোবাডিলার হাতে কলম্বাসের বন্দি হওয়া, এসবই সত্যি। তবে ওই ইসাবেলার দেওয়া বাজুবন্ধ, বার্বারিকো সমাচার, এগুলো নিট গল্প বই আর কিছু নয়।"

আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম, "তা হলে ওই আর্মলেটটা? যেটা দেখে... "

"যেটা দেখে আমি খানিকটা হায়েনার মতো হয়ে গিয়েছিলাম?"

প্রশান্তর এই আর-এক বিটকেল ক্ষমতা। মনের কথা অক্ষরে অক্ষরে পড়ে ফেলতে পারে। ও বলে চলল, "ওটুকু ভড়ং না করলে পাখি পালিয়েও যেতে পারত। তা ছাড়া ওই বস্তুটাই তো আমি ক'দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।"

"তার মানে?" এবার সমীর প্রশ্ন করলেন।

"ওটাই পল্লবীর বোনের বাড়ি থেকে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান কেয়ূর ওরফে বাজুবন্ধ ওরফে আর্মলেট।"

আমার এবার হাসি পেয়ে গেল। বললাম, "এ কেয়ূর তো তা হলে যে-সে বস্তু নয়। ঘুঘু গয়নাচোরদেরও জেলখানার অন্দরমহলে বেঁধে রাখার যোগ্য মন্ত্রগুপ্তি!"

"দারুণ বলেছ," বলে আমার কাঁধে একখানা দশাসই চাপড় লাগিয়ে হো হো করে হেসে উঠল প্রশান্ত। সমীরও যোগ দিল সেই হাসিতে।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল



ইসাবেলার বাজুবন্ধ রহস্য

২০০৩ সালে দুষ্কৃতীদের হামলার পর জল থেকে ক্রেনের সাহায্যে তুলে আনা হচ্ছে পৃথিবীবিখ্যাত লিট্‌ল মারমেড মূর্তিটি



নব্বই-এ পা দিল কোপেনহেগেনের
লিট্‌ল মারমেড মূর্তি

রয়্যাল থিয়েটারের তখনকার নামী নর্তকী এলেন প্রাইসের চেহারার আদলে তৈরি হয়েছিল রূপকথার সেই মৎস্যকন্যার মূর্তি। লিখেছেন অভিজিৎ সুকুল

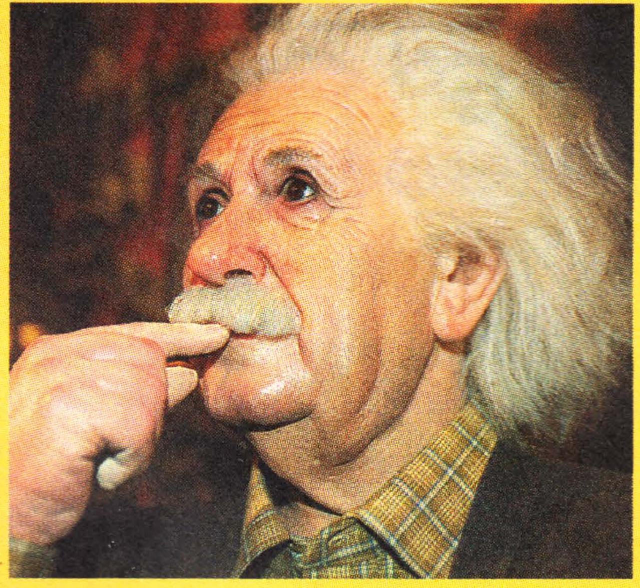
একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না তার দিক থেকে। গোলাপের পাপড়ির মতো নরম তার ত্বক। সমুদ্রের সবচেয়ে নীল জলের চেয়েও নীল তার চোখের রং। হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন ঠিক এভাবেই বর্ণনা করেছিলেন লিট্‌ল মারমেড-এর। গভীর সমুদ্রে মৎস্য-মানুষদের রাজার ছোট্ট মেয়ে সে। রংবেরঙের মাছেরা তার বন্ধু। ওদের নিয়েই ছোট্ট মারমেড তোলপাড় করে বেড়ায় জলের সাম্রাজ্য। তার অসীম কৌতূহল শুধু জলের ওপরের জগৎটাকে জানবার। চোদ্দ পেরিয়ে যেদিন সে পনেরো বছরে পা দিল, সেদিনই প্রথম সে অনুমতি পেল জলের ওপরের জগৎটা দেখবার। আর ওপরে উঠেই সে দেখতে পেল ফুটফুটে এক রাজপুত্তুরকে। তারপর...। অ্যান্ডারসনের 'দ্য মারমেড' গল্প এগিয়েছে এভাবেই।

আগ্রা মানেই যেমন তাজমহল, প্যারিস বলতেই যেমন বোঝায় আইফেল টাওয়ার, ঠিক তেমনই ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লিট্‌ল মারমেডের নাম। এখানেই ল্যাঙ্গেলিনির সমুদ্রসৈকতে দেখা মেলে চার ফুট লম্বা ব্রোঞ্জের তৈরি মারমেড মূর্তির। এখানে বেড়াতে এলে 'দ্য সিম্বল অফ ডেনমার্ক'-এর কোনও মেমেন্টো নিয়ে ফেরেন না, এরকম মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যায়।

হান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন জন্মেছিলেন কোপেনহেগেনের শহরতলিতে, ওডেন্সে। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে সেখান থেকে রাজধানীতে চলে আসেন। এখানে রয়্যাল থিয়েটারের ছাত্র ছিলেন তিনি। প্রথমে কবিতা লিখতেন। তিরিশ বছর বয়সে লেখেন প্রথম রূপকথার গল্পটি। আর এইসব গল্পই তাঁকে অমর করে রেখেছে সাহিত্য জগতে। অ্যান্ডারসনের এইসব গল্পের মধ্যে ভীষণই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে মৎস্যকন্যার গল্পটি। পরে ডেনমার্কের এক শিল্পপ্রেমী শিল্পপতি কার্ল জ্যাকবসন প্রথম মারমেডের মূর্তি স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। দায়িত্ব দেওয়া হয় ভাস্কর এডওয়ার্ড এরিকসেনকে। রয়্যাল থিয়েটারের তখনকার নামী নর্তকী এলেন প্রাইসের চেহারার আদলে মূর্তিটি গড়ে তোলেন এরিকসেন। ১৯১৩-র ২৩ অগস্ট মূর্তিটি উন্মোচিত হলেও এটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে বছর পঞ্চাশেক পর। ১৯৬৪ সালে কে বা কারা মূর্তিটির মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পরে অবশ্য সেটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। এর পরেও বেশ কয়েকবার লিট্‌ল মারমেডের মূর্তির ওপর হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

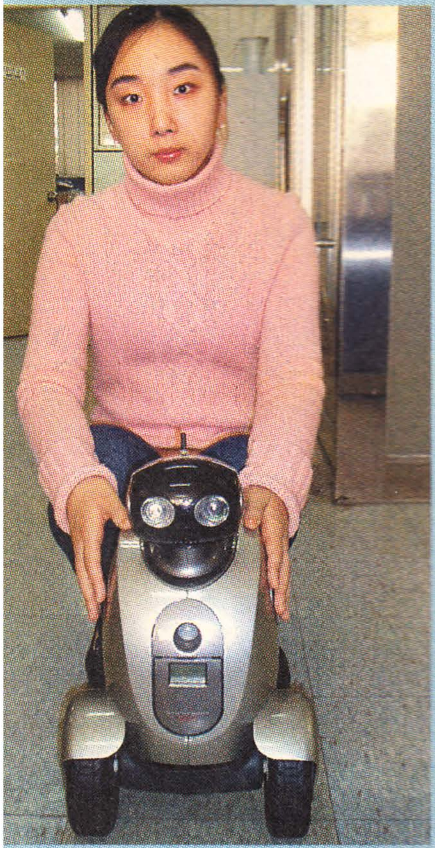
নব্বই-এ পা দেওয়া ড্যানিশ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই মূর্তির সম্মানে সম্প্রতি হয়ে গেল বিভিন্ন অনুষ্ঠানও। ড্যানিশ রয়্যাল ব্যান্ড, ড্যানিশ নেভির ব্যান্ডের অনুষ্ঠান আর চোখ-ধাঁধানো আতশবাজির প্রদর্শনীর মধ্যে অবশ্য সকলের নজর কেড়ে নিয়েছিল মারমেডের সাজে নব্বই জন মেয়ের জলকেলি।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা



সেই ১৯৫৯ সাল থেকে 'গ্র্যাভিটি প্রোব বি'-কে মহাকাশে উৎক্ষেপণ নিয়ে চলছে টালবাহানা। বারবার যাত্রা বাতিল, নানা কারিগরি ত্রুটির ফলে এতদিন পৃথিবী থেকে রওনা হতে পারেনি এই স্পেসক্র্যাফটি। বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন সফল হল এতদিন পর, নাসার চালকবিহীন এই যানটি ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যান্ডেনবার্গ এয়ারফোর্স থেকে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। মহাশূন্যে কী করবে গ্র্যাভিটি প্রোব বি? আইনস্টাইন তাঁর জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটিতে বলেছেন যে, পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্র এবং ব্ল্যাকহোল তার আশপাশের স্পেস এবং টাইমকে (দেশ এবং কাল) দুমড়ে-মুচড়ে দেয়। এইসব মহাজাগতিক বস্তুর মহাকর্ষীয় বলই এর কারণ। আইনস্টাইনের এই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করবে গ্র্যাভিটি প্রোব বি। পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করবে এই স্পেসক্র্যাফটি, আর এর ভেতরের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চুলচেরা অঙ্ক কষে আমাদের জানাবে আইনস্টাইনের তত্ত্ব ঠিক না ভুল?

বাড়ি পাহারা দেবে যন্ত্রমানব



সত্যি, গার্জিয়ানের কোনও তুলনা নেই। হোক না সে রোবট, মানুষের চেয়ে কীসে কম সে? তার গুণের কথা শুনলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। বাড়িতে হয়তো কেউ নেই অথবা থাকলেও ঘুমিয়ে আছে বা ব্যস্ত আছে কোনও কাজে, হঠাৎ আগুন লেগে গেল বাড়ির কোনও জায়গায়। কিংবা গ্যাস লিক হতে আরম্ভ করল অথবা ফাঁক বুঝে সবার নজর এড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল কোনও চোর—ব্যস, নিমেষের মধ্যে তা বাড়ির মালিককে জানিয়ে দেবে গার্জিয়ান। সুন্দর ছোটখাটো এই যন্ত্রমানবের শরীরে ফিট করা আছে ক্যামেরা, মোশন ডিটেকটর আর হিট অ্যান্ড গ্যাস চেম্বার। গার্জিয়ানের দৃষ্টিপথের সামনে যাই নড়েচড়ে বেড়াক না কেন, নিমেষের মধ্যে গার্জিয়ানের ক্যামেরায় তার ছবি উঠে যাবে। সাউথ কোরিয়ার 'এস কে টেলিকম' এই রোবটটির আবিষ্কর্তা।

প্রস্তরযুগের বিড়াল

সাইপ্রাসে মাত্র ৪০ সেন্টিমিটার গভীর একটি সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন একটি বিড়ালের কঙ্কাল। ন'হাজার পাঁচশো বছর আগে মাত্র আট বছর বয়সে মারা যায় এই প্রাণীটি। সাড়ে ন'হাজার বছর আগেকার এই মার্জারটির সঙ্গে ফেলিস সিলভাস্ট্রিস পরিবারের বন-বিড়ালের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন গবেষকরা। আফ্রিকায় এখনও বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায় এই বিড়ালরা (সঙ্গের ছবি)। প্রস্তরযুগে বিড়ালদের পোষ মানাত মানুষ, অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে মানুষের কাছাকাছি থাকত এই স্তন্যপায়ী প্রাণীরা। এতদিন ধারণা ছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মের ১৯০০ বছর আগে প্রথম বিড়ালরা গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে মানুষের পাশেপাশে থাকতে শুরু করেছিল। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে পালটে গেল সেই ধারণা।



জয় সেনগুপ্ত

লুব্ধকের পৃথিবী

প্রসূন মজুমদার

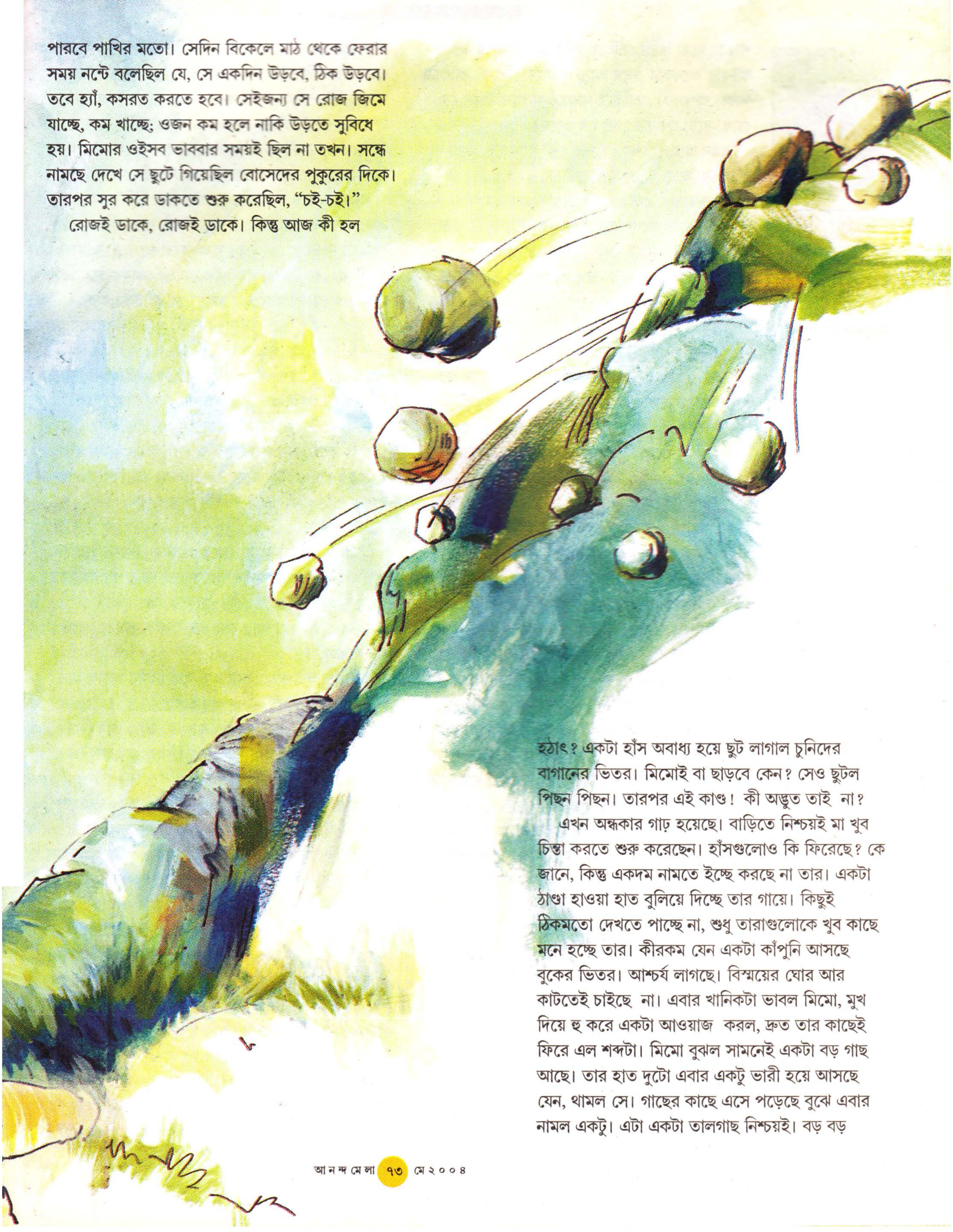
সমস্যা হল যে, মিমো দূরে ভাল দেখতে পায় না। যখন সে হাঁসটার পিছনে ছুটছিল, তখনই বিকেল প্রায় নিভতে বসেছে, আর এখন তো গাঢ় অন্ধকার। মিমো প্রথমে খানিকটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল কিন্তু এখন সে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে, ল্যাতপেতে হাত দুটোকে সে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিল, তারপর ঝাপটা মারল জোরে। অমনি একটা বাদুড় শাঁ করে বেরিয়ে গেল তার কানের পাশ দিয়ে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল মিমো, সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভারী অদ্ভুত অনুভূতি হল তার। মনে হল সামনে কোনও বড় গাছের মাথা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের মতো। মনে হতেই একটু ডান দিকে কাত হল মিমো আর শাঁ করে বেরিয়ে গেল গাছ এড়িয়ে। অবাক কাণ্ড!

হাঁসটার পিছনে ছুটতে ছুটতে কখন যে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়েছিল খেয়াল নেই। প্রথম ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় লেগেছিল তার। যখন টালটা সামলাল তখন সে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। কী করে কী হল জানে না মিমো। সে তো কোনওদিন ইচ্ছে করেনি যে সে উড়তে



পারবে পাখির মতো। সেদিন বিকেলে মাঠ থেকে ফেরার সময় নন্টে বলেছিল যে, সে একদিন উড়বে, ঠিক উড়বে। তবে হ্যাঁ, কসরত করতে হবে। সেইজন্য সে রোজ জিমে যাচ্ছে, কম খাচ্ছে; ওজন কম হলে নাকি উড়তে সুবিধে হয়। মিমোর ওইসব ভাববার সময়ই ছিল না তখন। সন্ধে নামছে দেখে সে ছুটে গিয়েছিল বোসেদের পুকুরের দিকে। তারপর সুর করে ডাকতে শুরু করেছিল, "চই-চই।"

রোজই ডাকে, রোজই ডাকে। কিন্তু আজ কী হল



হঠাৎ? একটা হাঁস অবাধ্য হয়ে ছুট লাগাল চুনিদের বাগানের ভিতর। মিমোই বা ছাড়বে কেন? সেও ছুটল পিছন পিছন। তারপর এই কাণ্ড! কী অদ্ভুত তাই না?

এখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। বাড়িতে নিশ্চয়ই মা খুব চিন্তা করতে শুরু করেছেন। হাঁসগুলোও কি ফিরেছে? কে জানে, কিন্তু একদম নামতে ইচ্ছে করছে না তার। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার গায়ে। কিছুই ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছে না, শুধু তারাগুলোকে খুব কাছে মনে হচ্ছে তার। কীরকম যেন একটা কাঁপুনি আসছে বুকের ভিতর। আশ্চর্য লাগছে। বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতেই চাইছে না। এবার খানিকটা ভাবল মিমো, মুখ দিয়ে হু করে একটা আওয়াজ করল, দ্রুত তার কাছেই ফিরে এল শব্দটা। মিমো বুঝল সামনেই একটা বড় গাছ আছে। তার হাত দুটো এবার একটু ভারী হয়ে আসছে যেন, থামল সে। গাছের কাছে এসে পড়েছে বুঝে এবার নামল একটু। এটা একটা তালগাছ নিশ্চয়ই। বড় বড়



লুব্ধকের পৃথিবী

পাতার মধ্যে দিব্যি সেঁধিয়ে গেল সে। তারপর এক ঝটকায় অনেকটা নেমে আসা তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকল অপলক। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল কে জানে?

যখন জাগল তখন কোথায় সেই তালগাছ, কোথায় তারাভরা আকাশ, কোথায় সেই রহস্যময় রাত্রি! সে দেখল চারদিকে লোহার গরাদেওলা একটা ঘুপচি অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে আছে সে। ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার আগেই সেই জেলখানার ছোট্ট আর নিচু দরজাটা খুলে গেল ঘটাং শব্দ করে। পেয়াদার মতো একটা লোক ঢুকল ঘরের মধ্যে।

"ঘুম ভাঙল, শেষ পর্যন্ত?"

"এটা কোথায়?" জিজ্ঞেস করল মিমো।

কোনও উত্তর দিল না লোকটা। হাত বাড়িয়ে দিল খালি। হাতে একটা বড় পাথরের থালা, সেখানে নানারকমের ফল আর একটা বড় ডিমভাজা। "খেয়ে নাও," বলল লোকটা, "তারপর আমাদের রাজার কাছে যেতে হবে।"

সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল মিমোর। এখন বেশ তাজা লাগছে। লোকটা একটা বিশাল বাড়ির মধ্য দিয়ে এঘর ওঘর পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে মিমো। তার হাত দুটো বাঁধা। লোকটা তাকে টেনেই নিয়ে যাচ্ছে প্রায়। কিন্তু কেন বন্দি হল মিমো, কীভাবেই বা সে এল এখানে, কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। বুঝেও কোনও লাভ নেই। এর মধ্যে সে অনেকবার অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু কোনও উত্তর পায়নি। হয় এই লোকটা বধির আর তা না হলে তার উপর নির্দেশ আছে চুপ করে থাকার।

লোকটা শেষমেশ একটা বড় হলঘরের মধ্যে এসে ঢোকাল তাকে। সেখানে একটা টাকমাথা, আবলুস কাঠের মতো কুচকুচে লোক উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে। আর তাকে ঘিরে একদল ষণ্ডামার্কা ছেলে, দেখে মনে হবে যেন রাজা তাঁর দরবারে বসেছেন। তবে কোনও দেবরাজ নয়, মনুষ্যরাজ নয়, এ নেহাতই রাক্ষসরাজ।

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, " নাম কী?"

মিমো নাম বলল।

রাজা কান খাড়া করে শুনতে চাইলেন, বোধ হয় শুনতে পেলেন না। বললেন, "কী? আবার বলো।"

মিমো আবার নাম বলল।

রাজা এবার খুব অসন্তুষ্টভাবে ঘাড় নাড়লেন, "বোবা নাকি!"

"কী নাম?" ঝাঁঝিয়ে উঠলেন রাজা।

মিমোরও আঁতে ঘা লেগেছে। তার তো অন্যরকম সন্দেহ হচ্ছে, কাল সন্ধে থেকে যা সমস্ত কাণ্ড ঘটছে, নিশ্চয়ই বধিরদের রাজ্যে এসে হাজির হয়েছে সে। না হলে এত লোকের কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছে না, এমন হয় নাকি? চিৎকার করে উঠল মিমো। আর অমনি রাজার রিভলভিং চেয়ার বনবন করে ঘুরতে লাগল। তাঁর হাতঘড়ি ফেটে ছিটকে পড়ল। জামাপ্যান্টের বোতামগুলো কটকট করে ছিঁড়ে যেতে লাগল। রাজা চিৎকার করতে শুরু করলেন, "এ কী হচ্ছে সব?"

হতভম্ব হয়ে গেল মিমো। প্রায় তিন মিনিট বনবন করে ঘোরার পরে যখন চেয়ার থামল, রাজার তখন জিভ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। ঘাড় হেলে পড়েছে, জামা-প্যান্টের সবক'টা বোতাম খুলে গেছে। কোনওক্রমে তিনি সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, "তোমরা যাও, আর ওকে ওর ঘরে রেখে এসো। দেখো, ওর খাবারদাবার যেন ঠিকমতো দেওয়া হয়।"

ব্যাপারটা বেশ ভাল লাগল মিমোর। এইরকম নাকানিচোবানি খাওয়ার পরেও রাজামশাই যে তাকে খাতির করে খাওয়াবেন, শোয়াবেন, এ ভাবতেই পারেনি মিমো। তবে কিনা ঘরটা ঠিক জুতসই হয়নি, দেখলেই মনে হয় বড় একটা পাখির বাসা। কাল এই বিষয়ে রাজামশাইকে বলতে হবে, যদি শুনতে পান।

"প্রতিভা বুঝলে গাছ থেকে পড়ে না, দিনের পর দিন কঠিন তপস্যা করে অর্জন করতে হয়। কিন্তু অলৌকিক! সে সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। সে যার মধ্যে আসে সে একদিন রাজা হয়। আর সেই অলৌকিক ক্ষমতা আছে তোমার মধ্যে।"

রাজার কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন অবাক হয়ে যাচ্ছিল মিমো। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়েছে সে, থুড়ি, একটা নয়, দুটো অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু তাই দিয়ে রাজা হবে এমনটা তো সে ভাবেনি। বরং এতক্ষণ সে ভেবেছে বাড়ি ফিরবে। মা অপেক্ষা করছেন বাড়িতে। তাকে দেখতে না পেয়ে না জানি কী করছেন এতক্ষণে। না, রাজাটাজা হওয়ার ইচ্ছে কখনও হয়নি তার। তবে হ্যাঁ, সেদিন টিভিতে সৌরভকে দেখার পর থেকে ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন হওয়ার ইচ্ছেটা খুব চাগাড় দিয়ে উঠেছে, সত্যি। আচ্ছা, এই যে সে আকাশে উঠতে পারছে, তারপর চিৎকার করে এরকম বীভৎস কাণ্ড ঘটাতে পারছে, এইটা কাজে লাগিয়ে সে ক্যাপ্টেন হতে পারে না সৌরভের মতো? রাজাকে জিজ্ঞেস করতে পারলে বেশ ভাল হত, কিন্তু উপায় নেই। হাতের মতো তার এখন মুখও বাঁধা। সেদিন অমন গড়বড় হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রাজা তার কথা বলার পথ বন্ধ করেছেন। যা খুশি করো, খাও-দাও, সুন্দর বিছানায় নরম গদিতে শুয়ে থাকো কিন্তু কথাটি বোলো না, এই হল রাজার আদেশ। ও হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা ঘর তাকে দিয়েছেন রাজামশাই।



লুব্ধকের পৃথিবী

কিন্তু তাকে যে কেন এমন খাতির-যত্ন করছে এরা তা কিছুতেই বুঝতে পারছে না মিমো।

রাজা এখন মিমোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখের পলক পড়ছে না। হঠাৎ তিনি বললেন, "চলো।" সেই পাহারাদার লোকটা মিমোর হাতের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল। রাজা চলেছেন আগে-আগে, মিমোরা পিছনে-পিছনে। প্রাসাদের মতো বাড়ির ফটক পেরোল তারা। ওঃ কী শান্তি! কী আনন্দ! তার সামনেই বিশাল মাঠ, মাঠ থেকে দূরে তাকালে নদী, আর নদীর পিছনেই একের-পর-এক টিলা, টিলার মাথায় লুব্ধক। ভারী ভাল লাগল মিমোর। না হোক তার গ্রামের সেই রাস্তা, কিন্তু ফাঁকা তো, মাঠ তো, আর ওই টিলা? পারত সে এমন জায়গায় কখনও আসতে! রাজা গাড়িতে উঠলেন, মিমোকেও ওঠানো হল। গাড়ি থামল বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ের গায়ে। চারদিকে ধুধু মাঠ, তার এককোণে পাহাড়। রাজা বললেন, "ওর মুখের বাঁধন খুলে দাও।"

লোকটা মিমোর মুখের বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে উঠল মিমো। কিন্তু এ কী! কী হল হঠাৎ, পাহাড়ের পাথর খসে পড়তে লাগল কেন? রাজা তাকে নিয়ে ছুটে সরে এলেন। পাহাড়ের বেশ খানিকটা ধসে পড়ল এক ধাক্কায়। রাজা লাফাতে লাফাতে হাততালি দিচ্ছেন, ফাঁকা মাঠের মধ্যে ডিগবাজি খাচ্ছেন আর বলছেন, "মার দিয়া কেল্লা!"

কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে মিমো।

গতকাল রাতে শুতে যাওয়ার সময় ব্যাপারটা মাথায় আসে হাবুলের। আর আসা থেকে সে চিন্তাটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। না, ব্যাপারটা একবার জানাতেই হবে। কাউকে না বলে মিমোর মাকেই বলবে সে।হোক ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু এখন তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, দিনের শেষে আলো-আঁধারিতে যে বিশাল ছেলেটাকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখল, সেটাই মিমো। দেখে মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু তখন আমল দেয়নি। ভেবেছিল নিশ্চয়ই ফালতু চিন্তা করছে সে। ভূত দেখার মতোই অদ্ভুত ব্যাপারটা। কাল যখন শুনল, মিমো ওই দিন ওই সময় থেকেই বেপাত্তা, তক্ষুনি ব্যাপারটা তাকে আবার ভাবাতে শুরু করেছে। ভীষণ গুমোট রোদ পেরিয়ে মিমোদের বাড়িতে এসে পৌঁছল হাবুল।

"শোনো, তুমি এখন যেখানে রয়েছ, সেটা তোমাদের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। সৌরজগৎ বোঝো, সৌরজগৎ?"

ঘাড় নাড়ল মিমো, ভূগোল বইয়ে পড়েছে সে সূর্যের বিশাল পরিবারের কথা।

"তোমাদের পৃথিবীটা যদি সৌরজগতের গ্রহ হয় তা হলে আমাদের এই গ্রহটা 'লুব্ধক জগৎ'। কালপুরুষের পায়ের কাছে থাকে লুব্ধক। হ্যাঁ, পৃথিবী থেকে তো সেরকমই মনে হয়। লুব্ধককে পৃথিবীর আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল লাগে, কিন্তু এটা আসলে পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আর আমাদের এই গ্রহ 'বিপিথি' বনবন করে ঘুরছে লুব্ধকের চারদিকে ঠিক তোমাদের পৃথিবীর মতো। এই যে আমাদের দেখছ, আমাদের পূর্বপুরুষরা আসলে মানুষই। পৃথিবীতে প্রলয় যখন নামল তখন তাঁরা এক দ্রুতগামী মহাকাশযান চড়ে পৌঁছলেন এই গ্রহে। তারপর এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিতে সময় লাগল ১০০ কোটি বছর। এই গ্রহের সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে শেষমেশ আমরা জিতলাম, কিন্তু যুদ্ধ যে এত ভয়ঙ্কর হবে আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের এখানে ছিল চারটে ভয়ঙ্কর প্রাণী। বিশাল তাদের চেহারা, অনেকটা তোমাদের গ্রহের হারানো ডাইনোসরদের মতোই। তাদের হারিয়ে এই গ্রহের দখল নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু আমাদের ছিল উন্নত মস্তিষ্ক; আমরা একে-একে অসাধারণ সব যুদ্ধাস্ত্র বানালাম। এই যে অস্ত্রটা দেখছ, এটা হার্টকার্ট, ২০০ কেজি ওজনের কাউকে লক্ষ করে চালালে মুহূর্তের মধ্যে তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলবে ৩০ কিলোমিটার দূরে। আর এই যে যন্ত্রটা, এটা আবিষ্কর ফসিলস, কোনও জনবহুল অঞ্চলে একটা ফেলতে পারলেই ব্যস, মুহূর্তে ধোঁয়া হয়ে যাবে সবকিছু। আর ওইটা... যাক, এসব তোমাকে দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ এগুলো কোনওটাই তোমার মতো শক্তিশালী অস্ত্র নয়।"

এবার বেশ ভয় পেয়ে গেল মিমো। লোকটা তার মানে তাকে যুদ্ধে পাঠাতে চাইছে। ঠেলে দিতে চাইছে সেইসব দৈত্যের মতো প্রাণীর সামনে। কী সাঙ্ঘাতিক! কেন যে এমন হল, হল তো হল, তারই কেন হল। অন্য কারও তো হতে পারত এমনটা। চোখ ফেটে জল এসে গেল মিমোর।

সকালের কাগজে খবরটা বেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে শহর জুড়ে সাড়া পড়ে গেছে। ট্রেনে, বাসে, অফিসে, বাজারে ব্যাপারটা নিয়ে নানা গুজব, নানান জল্পনা। বিজ্ঞানীরা শোনামাত্রই ঘটনাটা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। এক সন্ন্যাসী ঘটনার সত্যতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বইয়ের তথ্য দিয়ে। সাধারণ লোকেদের মধ্যে যারা প্যান্ট-শার্ট পরে আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখে, তারা ভুরু কুঁচকে সংশয়ের ভঙ্গিতে বলছে, "খবরের কাগজওলারা



লুব্ধকের পৃথিবী

কি আর খবর পাচ্ছে না লেখবার?" তবে মন্টুর পিসিমাই একমাত্র যথার্থ কথাটা বলে ফেললেন, "কেন বাবা, আজকালকার ছেলেরা তো সবাই উড়ছেই, এ না হয় একটু উপরে উঠেছে, তা নিয়ে এত নাচার কী আছে বাপু?" 'সাফ কথা'য় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন, "এটা স্রেফ একটা গুজব, তবে এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" শুধু একজন এদের কারও মধ্যে নেই, কোনও কথাই তাঁর কানে পৌঁছয়নি। খবরের কাগজটা পাওয়ার পর থেকেই 'মামাবাবু' তাঁর নিজের তৈরি টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়েছেন, সহজে নামাবেন বলেও মনে হচ্ছে না। এ ব্যাপারটা যখন একবার তাঁর মাথায় ঢুকেছে তখন ওই উড়ন্ত ছেলেটাকে আকাশে খুঁজে বের না করে তিনি ছাড়বেন না।

"যুদ্ধ আজ আমাদের জয়ী করেছে ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা নিজেরা একটা গভীর গণ্ডগোলে পড়ে গেছি। শোনো, আমাদের এই গ্রহে একসময় ছিল বিশাল বিশাল ম্যামথের মতো প্রাণী। তাদের আমরা বলতাম 'ফিয়ার'। এই ফিয়ার সাধারণত আমাদের আক্রমণ করত অসতর্ক অবস্থায়। যুগের পর যুগ গবেষণা করে আমাদের বিজ্ঞানী উইশ বানালেন অদ্ভুত এক অস্ত্র, যার নাম 'স্টেংথ দ্য থেন্টাল'। এই অস্ত্রে ফিয়ারদের হত্যা করলাম আমরা। কিন্তু তাদের দেহের অংশগুলো এই গ্রহের উত্তরদিকে সঞ্চিত হতে লাগল। তারপর তৈরি করল এক বিশাল পাহাড়। নাম 'মাউন্ট ফিয়ার', উচ্চতায় ১২ লক্ষ ফুট, ভাবতে পারো? শুধু এখানেই শেষ নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিমদিকেও ঠিক একই রকম ভাবে গড়ে উঠল আরও তিনটে পাহাড়। হ্যাঁ, আরও তিনটে রাক্ষুসে প্রাণীর টুকরো দিয়ে। এদের নাম 'মাউন্ট এম ভি', 'মাউন্ট গ্রিড' আর 'মাউন্ট বন্ডেজ'। পাহাড়গুলো উচ্চতায় বিশাল হলেও, ওদের পেরিয়ে যাওয়া আমাদের কাছে তেমন শক্ত হয়নি। কিন্তু মুশকিল হল, এই তিনটে পাহাড় থেকে ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে বিষাক্ত জৈব-রশ্মি। যার প্রভাবে আমাদের গ্রহের টানুসরা মানে এই আমরা অবলুপ্ত হতে পারি যে কোনও সময়। আমাদের গ্রহের এক-তৃতীয়াংশ টানুস অন্ধ হয়ে গেছে শুধু ওই রশ্মির প্রভাবে। ওই রশ্মি আমাদের চরিত্রের আমূল বদল ঘটিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মাউন্ট গ্রিড থেকে আসা রশ্মির কারণে আমাদের টানুসরা ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে। বাঁচার জন্য যে যুদ্ধ আমরা শুরু করেছিলাম একদিন, আজ সেই যুদ্ধ পরিণত হয়েছে এক টানুসের উপর অন্য টানুসের প্রভুত্বের লড়াইয়ে। মাউন্ট সুপারস্টিসাসের বিষরশ্মি আমাদের কৌতূহল কেড়ে নিচ্ছে, নতুনকে জানার আগ্রহ চলে গিয়ে ক্রমশ কর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছি আমরা। এই মারাত্মক অভিশাপ থেকে তুমি আমাদের মুক্ত করো। তুমি কে আমি জানি, কোথা থেকে এসেছ তাও! সব ধরা আছে এই ছোট্ট যন্ত্রটার মধ্যে। আর ওই বিশাল মাকড়সার মতো আটপেয়ে যন্ত্রটা দেখছ, ওটা বানানো হয়েছে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু বাড়ি ফেরার আগে তোমাকে আমাদের একটা উপকার করে দিতে হবে। তোমাকে আমি এক এক করে নিয়ে যাব পাহাড়গুলোর সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে তোমায় চিৎকার করতে হবে যত জোরে সম্ভব। তোমার আছে অলৌকিক শক্তি। তোমার শব্দ আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে, একে বলে সুপারসনিক ওয়েভ। এই শব্দ দিয়ে পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে তুমি, আর আমরাও মুক্তি পাব। চলো, এটা যুদ্ধ নয়, কেবল ভালভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। তুমি করবে সাহায্য?"

মিমো সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

রাজা বললেন, "তবে যাও, তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। ওড়ো আমাদের গ্রহের সর্বত্র, দ্যাখো সবকিছু, তা হলে নিজেই বুঝবে কোথায় আমাদের কষ্ট। যাও, মুক্ত তুমি। কিন্তু শোনো, নগর ভ্রমণের সময় টুঁ শব্দটি কোরো না ভুলেও, বুঝলে!"

এই গ্রহে সকালটা ভারী সুন্দর। দূরে মেঘের উপর লুব্ধক। লুব্ধকের আলোয় ঝকমক করছে বরফঢাকা পাহাড়। পাহাড়ের পায়ের তলায় কত সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট ফুল মিটমিট করে হাসছে। মিষ্টি হাওয়ায় হেঁটে যেতে বেশ ভাল লাগছিল মিমোর। পথের বাঁক ফিরতেই সে দেখতে পেল অনেক ছোট-বড় বাড়ি। তার মানে ওটা একটা শহর, গ্রামের অত্যন্ত কাছের শহর, কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই এতটুকু। মিমো হাত দুটো ছড়িয়ে দিল হাওয়ায়। বাজারের কাছেই একটা নির্জন জায়গা দেখে নামল মিমো। তারপর এগিয়ে গেল বাজারের দিকে। কত রকমের দোকান, তাতে কত রকমের ক্রেতা। হঠাৎ দেখল একটা বাচ্চা দৌড়ে আসছে তার দিকে। তার মা তাকে পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকছিলেন। মিচকি হাসল মিমো। তারপর পালাতে যাতে না পারে এই ভাবে দু' হাত দিয়ে রাস্তা আটকে দাঁড়াল বাচ্চাটার। বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাকে দেখেই মুহূর্তে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বাচ্চাটার। সে ধীরে ধীরে পিছোতে লাগল। মিমোর বেশ পছন্দ হয়েছে খেলাটা। সেও এগিয়ে যাচ্ছে বাচ্চাটার দিকে, হঠাৎ তার মা চিৎকার করে উঠলেন ভয়ে, "রাক্ষস! দানো! ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল গো!"

মায়ের চিৎকারে মিমোর চারদিকে জড়ো হতে লাগল



লুব্ধকের পৃথিবী

লোকজন। তারা বড় বড় পাথরের চাঁই হাতে তুলে নিয়েছে, মিমোকে মারার জন্য। কেন যে তাকে দেখে ভয় পেয়েছে এরা, বুঝছে না মিমো। চেহারায় এদের সঙ্গে মানুষের প্রায় কোনও পার্থক্যই নেই, ভাষাতেও পার্থক্য খুব কম। এরা সকলেই বোধ হয় অনেক ভাষা জানে, আর কার সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতে হবে সেটা লোক দেখলেই বুঝতে পেরে যায় এরা। তা হলে তাকে দেখে ভয় পেলেন কেন ভদ্রমহিলা, কেনই বা তাকে মারার জন্য পাথর তুলেছে সবাই! অবশ্য এসব ভাবার সময় এখন নেই, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মিমো ভুলে গেল যে সে উড়তে পারছে আজকাল। ভুলে গিয়ে ছুট লাগাল সে যত জোরে সম্ভব। লোকেরাও তাড়া করেছে, পাথর ছুড়ছে তার দিকে। কয়েকটা পাথর তো সে কোনওক্রমে বাঁচাল। ছুটতে ছুটতে প্রায় হাঁপিয়ে যাচ্ছে মিমো। লোকগুলো খুব কাছে চলে এসেছে তার। হঠাৎ একটা পাথর এসে লেগেওছে পিঠে। যন্ত্রণা হচ্ছে প্রচণ্ড। হঠাৎ কে যেন হ্যাঁচকা টান মেরে পথ থেকে সরিয়ে নিল তাকে, তারপর সব অন্ধকার।

মামাবাবু যখন দূরবিন থেকে চোখ নামালেন তখন প্রায় দু'টো। আমি শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছি। গত কাল রাত্তির থেকে আজ দু'টো পর্যন্ত কিচ্ছুটি মুখে দেননি তিনি। এখন তাঁকে দেখে খুব একটা প্রসন্ন লাগল না। শুধু মুখে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ!" তারপর আর কোনও কথা বললেন না। আমি কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলাম না। কারণ এই সময় কিছু জিজ্ঞেস করলে যে উলটো ফল হওয়ার আশঙ্কা বেশি, সেটা আমি বিলক্ষণ জানতাম। আসলে মামাবাবু হলেন প্রোফেসর 'কিউরিয়স ক্লার্ক'। এঁকে আমি আবিষ্কার করি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। আমাদের তখন ফোর্থ ইয়ার চলছে। ভদ্রলোক যে নিজেই একজন বিখ্যাত আবিষ্কারক, সেটা আমি জানতে পারলাম পরিচয়ের দিন দুই পরে, কাগজ পড়ে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এই কৃতী মানুষটির সন্ধান পাওয়ার পর থেকেই আমার জীবনের ধারাটাও বদলে গেল। পড়তাম কম্পিউটার সায়েন্স। কাজ শুরু করলাম নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে। প্রবাদপ্রতিম এই অধ্যাপকটির সঙ্গে। মামাবাবু এখানেই থাকতে শুরু করলেন। গড়ে উঠল তাঁর নিজের তৈরি গবেষণাগার। বাংলাকে ভালবেসে সম্পূর্ণ বাঙালিত্ব গ্রহণ করলেন আমাদের আদরের 'কিউরিয়স'।কিন্তু কীভাবে যে তিনি মিঃ ক্লার্ক থেকে একদিন সকলের মামাবাবু হয়ে গেলেন, তা আজ আর মনে পড়ে না। যাই হোক, আমি অতি ভাগ্যবান যে, এমন একজন ব্যক্তিত্বকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সবচেয়ে কাছ থেকে, কারণ আমিই তাঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

মামাবাবু চুপচাপ খাওয়া শেষ করলেন। তারপর মুখটা একটু উপরে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কাজ কতদূর?"

"ঠিকঠাকই চলছে, সামান্য বাকি আছে। দিন কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে।"

"এই মেশিনে এসো।" ঘরের কোণের দিকের একটা কম্পিউটারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। যন্ত্রটা চালাতেই একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। মামাবাবু বললেন, "কী মনে হচ্ছে?"

"মানুষের নিশ্বাস।" একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল আমার মধ্যে।

"কাল সারারাত ক্যালকুলেশন করেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা আসছে প্লুটো থেকে। তারপর দেখলাম, না, ওটা লুব্ধকের কাছাকাছি কোনও গ্রহ থেকে আসছে। আমার মনে হচ্ছে ওটা লুব্ধকের কোনও গ্রহ। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপটাও এই গ্রহের খোঁজ পাচ্ছে না।"

"তবে?"

"তবে আবার কী? যেতে হবে।"

"কোথায় যাবেন?"

"এত কষ্ট, এত পরিশ্রম যেখানে যাওয়ার জন্য, সেখানেই।"

"কিন্তু কীভাবে? আমাদের মহাকাশযান তো এখনও সৌরজগৎই পেরোতে পারেনি। সেখানে লুব্ধক?"

"দ্যাখো, ব্যাপারটা আমি এখনও কোথাও প্রকাশ করিনি, তবে আমি আশাবাদী, আমার সঙ্গে এসো।"

আমরা ঢুকলাম গবেষণাগারের গুপ্তকক্ষটিতে। এটি মাটির তলায়, প্রায় চারতলা নীচে। এই ঘরে এতদিন একমাত্র মামাবাবুই ঢুকতে পারতেন। আজ প্রথম পা দিয়ে আমার সারাগায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বিশাল পাখির মতো একটা স্পেসশিপের মডেল। মামাবাবু সেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। "ডানা দুটো দেখছ? ভাল করে লক্ষ করো। এই কুঠুরিগুলোকে কী মনে হচ্ছে?"

"এগুলো তো সোলার সেল। আচ্ছা এগুলোই তো আমরা বানাচ্ছি, তাই না?"

"ঠিক। একদম ঠিক। আর এই যে চোঙের মতো যন্ত্রটা দেখছ, এটার কাজই কাল শুরু হয়েছে। এটা একটা কনভার্টার। তোমাকে যে পেপারগুলো দিয়েছিলাম পড়েছ?"

"হুঁ। তবে বেশিরভাগটাই বুঝিনি।"

"সেটাই স্বাভাবিক। তুমি তো আমার কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট। তোমার কাছে কম্পিউটার সম্পর্কে যা সাহায্য দরকার, সমস্ত পেয়েছি। কিন্তু তার মানেই এই



লুব্ধকের পৃথিবী

নয় যে, তোমাকে সবজান্তা হতে হবে। তবে মূল ব্যাপারটা বুঝেছ কি?"

"কিছুটা।"

"ঘটনাটা যে সম্ভব, সেই পরীক্ষা আমি করেছি এই খুদে পাখির একটা মডেল দিয়ে। পাখিটা আলফা সেন্টৌরি গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসতে পারেনি।"

"কেন?"

"সেটাই ভয়, সেটাই অসম্পূর্ণতা," কিউরিয়াস উদাস হয়ে গেলেন।

"আচ্ছা, আপনি এটা প্রকাশ করছেন না কেন?"

"গবেষণা এখনও সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ কী, এখনও প্রায় কিছুই হয়নি। আমরা এই বিরাট পাখিটাকে এবার মহাকাশে পাঠাব। যদি সত্যি সেটা পেরোতে পারে সৌরমণ্ডল, তবে আমরা পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যজনক এবং যুগান্তকারী আবিষ্কারের সাক্ষী থাকব, বুঝলে।" মামাবাবু আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলেন আর নিজে সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগলেন, "এই সোলার সেল দিয়ে তৈরি ডানা সূর্যের ফোটন কণিকার শক্তি সংরক্ষণ করছে তারপর ওই সরু বাসের মধ্য দিয়ে সেই শক্তি এসে পড়ল এই কনভার্টারে। পড়তেই ঘটে গেল ম্যাজিক। কোয়ান্টাম শক্তি রূপান্তরিত হল মহাকর্ষে, আর সেই শক্তি চালু করল মোটর। ডানা মেলল পাখিটা। একবিংশ শতাব্দীর নতুন মহাকাশযান!" মামাবাবু বলে চলেছেন যেন ঘোরের মধ্যে আর তাঁর মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে আমি ক্রমেই ডুবে যাচ্ছিলাম আসন্ন স্বপ্নের মধ্যে।

অন্ধকারের মধ্যে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে এটা একটা গুহা। হঠাৎ বাঁক নিল ওরা, আর সঙ্গে-সঙ্গেই নীল আলোয় ভরা একটা ঘর দেখতে পেল মিমো। সামনেই বসে আছে একটা যন্ত্র। মাথার জায়গায় পরিষ্কার একটা টিভি, তার দু'দিক থেকে বেরিয়ে আছে দুটো অ্যান্টেনা। হাত-পাগুলো নীল রবারের নলের মতো, শরীরটা যেন রকেটের খোল। লম্বায়-চওড়ায় খুব একটা আহামরি কিছু নয়, কিন্তু চোখ-দুটো মারাত্মক। সেই চোখ থেকে দুটো লাল আলোর ফোকাস এসে পড়ল মিমোর উপর। তারপর মাথার মাঝখান থেকে একটা বেগুনি রঙের সার্চলাইট ঘুরে বেড়াল মিমোর সমস্ত শরীর। আলো নিভলে যন্ত্র বলল, "স্বাগতম।" এক সঙ্গে অন্য যন্ত্রগুলোও বলে উঠল, "স্বাগতম, স্বাগতম।"

বড় যন্ত্রটা এবার বলল, "বোসো।" অন্যরাও বলল, "বোসো, বোসো।"

মিমোর কিছু বোঝার আগেই একটা সিংহাসনের মতো নরম গদিওয়ালা চেয়ার চলে এল তার পাশে। ম্যাজিক নাকি! চুপচাপ বসে পড়ল মিমো।

যন্ত্র শুরু করল, "আমি যন্ত্রগোনাম। এখানকার এক বিজ্ঞানী তৈরি করেছিল আমাকে। কিন্তু ওখানে থাকতে পারলাম না, ওরা আমায় শেষ করে দিতে চেয়েছিল। নিষ্ঠুর টানুস! পালালাম। পালাতে পালাতে এই মাটির ভিতরে। নিজে তৈরি করেছি এই ঘর। এই যে যন্ত্রদের দেখছ, এরা সব তৈরি হয়েছে আমার শরীর থেকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, আমিই এদের প্রভু, দ্য গ্রেটেস্ট যন্ত্রগোনাম।" চিৎকার করে উঠল সে। তারপর বলল, "আমরা ওদের ছাড়ব না। আমাদের চাই 'বিপিথি' গ্রহের উপর সম্পূর্ণ অধিকার। আমরা চাই যুদ্ধ।" নিষ্ঠুর হাসি মুখে নিয়ে সে এবার এগিয়ে এল মিমোর দিকে। তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল সে। তারপর বলল, "আর সেই যুদ্ধে তুমি হবে আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র।" উল্লাস! সঙ্গে সঙ্গে সহস্র যন্ত্র অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে লাগল, আর শুরু হল গান —

এইবার জিতে নেব বিপিথি
এসে গেছে আমাদের অতিথি—
কে কাকে বানায় আর কে মারে
রণে ঠিক হয়ে যাবে এবারে।
হোঃ হোঃ
কে চাস লড়াই তোরা কারা চাস
সকলে সমস্বরে, উল্লাস!
উল্লাস! উল্লাস! উল্লাস!

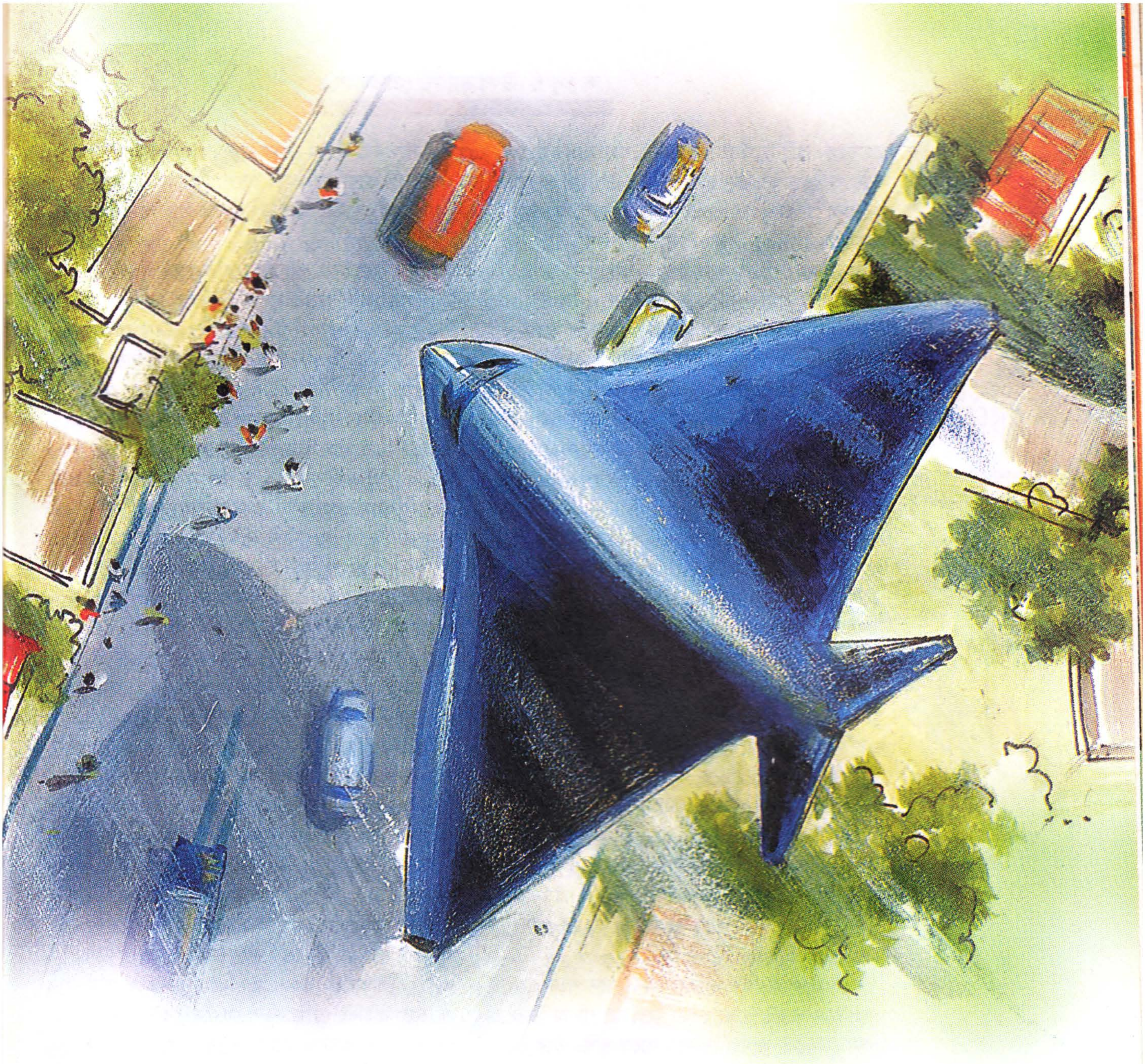
তারা চিৎকার করে নাচতে শুরু করল। মিমো এতক্ষণ কেমন হতভম্ব হয়ে গেছিল। এইবার তার ভয় করছে। সে যুদ্ধ চায় না, যুদ্ধটুদ্ধকে চিরকাল ভয় করে সে। এই জন্য বন্ধুদের কাছে মারও খেয়েছে প্রচুর, খেয়ে পালিয়েছে, তবু উলটে কোনও আঘাত করেনি সে, করতেই পারেনি। ভয়ে ভাবনায় এবার সে চিৎকার করে উঠল, "না, আমি যুদ্ধ করব না।"

মুহূর্তে থেমে গেল উল্লাস। তার চিৎকারে এদের কোনও অসুবিধা হল না। তখন পিনপতনের স্তব্ধতা। যন্ত্রগোনাম ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। মিমোর চিবুক ধরে তুলে আনল চোখের কাছে। তারপর জোরালো সার্চলাইট ফেলল তার চোখে। প্রায় দু'মিনিট। চোখ ধাঁধিয়ে গেছে মিমোর। যন্ত্রগোনাম আস্তে আস্তে কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। তারপর চিৎকার করে বলল, "যুদ্ধ।"

লাফিয়ে উঠল মিমো, "কোথায়? কোথায়? কোথায়?"

"রাজপ্রাসাদ।"

সম্মোহিত মিমো দ্বিগুণ উৎসাহে বলল, "রাজপ্রাসাদ!"



রাত্রির প্রথম প্রহরে যখন সবে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরছে সবাই, ঠিক সেই সময়ে কোনওরকম পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল সবচেয়ে উঁচু মিনারটা। হুলুস্থুল পড়ে গেল গোটা শহরে। চতুর্দিকে ত্রস্ত মানুষের হাহাকার আর প্রাণ বাঁচানোর জন্য মরিয়া দৌড়ের মধ্যেই কিছু দূরে এসে পড়ল একটা পাখির মতো বিরাট স্পেসশিপ। তার থেকে বেরিয়ে এল চাকা, গুটিগুটি সেটা ঢুকে গেল পাশের বনের মধ্যে, সন্তর্পণে কিন্তু দ্রুত।

বিপিথি গ্রহের রাজা প্রমাদ গনলেন, মিমোকে যারা গায়েব করেছে এটা যে তাদেরই কাজ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এরা কারা? কারণ মিনার ধ্বংস করার মতো সন্ত্রাসবাদী কোনও কাজ টানুস জাতির ইতিহাসে নেই। এমনিতে এই গ্রহ খুব ছোট নয়। কিন্তু এ গ্রহে মহাদেশ, দেশ, রাজ্য এমন কোনও বিভাজন নেই, কোনও কাঁটাতার আজ পর্যন্ত টানুসে টানুসে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে কি মিমোর সঙ্গে-সঙ্গে এই বিষটাও পৃথিবী থেকে উড়ে এল? তবে কি আর কেউ এসে পৌঁছেছে, পৃথিবীর আর কোনও মানুষ? না কি কোনও রাসায়নিকের প্রভাবে সৃষ্টি হল এই মহামারী? যাকে গবেট মানুষগুলো নাম দিয়েছে 'সম্পর্ক দূষণ'। রাজা তাঁর



লুব্ধকের পৃথিবী

গ্রহসুরক্ষা বাহিনী, গুপ্তচর, বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদদের ডেকে পাঠালেন এক জরুরি সভায়। সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হল তাত্ত্বিক আর বিশ্লেষকদেরও। কিন্তু অনেক আলোচনার পরেও বোঝা গেল না যে, এমন সন্ত্রাসের পিছনে কাদের মস্তিষ্ক কাজ করছে। অবশ্য সেনাপ্রধান এই ব্যাপারে একটা ভাল প্রস্তাব দিলেন, প্রথম এবং সর্বপ্রথম খুঁজে বার করতে হবে মিমোকে, তা হলেই তারা পৌঁছে যেতে পারবে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে। আর-একবার তাদের ধরতে পারলে এমন বিধ্বংসী কার্যকলাপের মোটিভটাও আর অজানা থাকবে না। তার কথা মতোই রাজা চতুর্দিকে গুপ্তচর নিয়োগ করলেন। তৈরি হল স্পেশ্যাল টাস্কফোর্স—'অপারেশন এক্স'।

মিমো যখন ঘুম থেকে উঠল তখন বেশ বেলা হয়েছে। সারা শরীরটা ভীষণ ভারী লাগল মিমোর। একটা ঘুপচিমতো ছোট্ট ঘরে বন্দি সে। সামনের খাবারের প্লেটে অজস্র সুন্দর খাবার। কিন্তু খেতে একদম ভাল লাগছে না মিমোর। কী যেন একটা সর্বনাশ ঘটিয়েছে সে, মুখটা তেতো হয়ে রয়েছে তার। মনে করতে চাইছে ঠিক কী করেছে। কিন্তু পারছে না। হ্যাঁ, আবছা মনে আসছে তার, জঙ্গলের ওপারে একটা ঝকঝকে ককপিট, হেলিকপ্টার, মিমো উড়ছে, তারপর... তারপর... নীচে বিশাল একটা মিনার—যন্ত্রগোনাম চিৎকার করল, মিমোও চিৎকার করল। কিন্তু? ওসব মনে পড়েছে মিমোর—সমস্ত। খুব লজ্জা হচ্ছিল তার। সে খুপরির মতো ছোট্ট জানলাটার কাছে গেল। কী হল যে মিমো বাধ্য হল এটা করতে, তবে কী সবটাই পালটে গেল তার? তবে কী...?

ঝনঝন করে কোথাও কিছু একটা খসে পড়ল যেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের দরজা খুলে যন্ত্রগোনাম ভিতরে ঢুকল। "মিমো, আমরা তোমার কাজে খুশি। তবে হ্যাঁ, আজ আমাদের সবচেয়ে বড় কাজগুলোর মধ্যে প্রথমটা শুরু হবে। আজ আমরা ভেঙে ফেলব ওদের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুরো বিচ্ছিন্ন করে দেব ওদের। অন্ধকারে ডুবে যাবে বিপিথি।" যন্ত্রগোনামের অদ্ভুত সার্চলাইটের মতো চোখ ক্রমে সবুজ হয়ে যেতে লাগল।

মিমো ক্ষোভে হতাশায় চিৎকার করে উঠল, "না, শুনুন...।"

যন্ত্রগোনাম অট্টহাস্য শুরু করল, "এই নাও কালকের কাজের জন্য তোমার পুরস্কার।"

একটা বিশাল রত্নের মালা। কী রত্ন জানে না মিমো, তবে ছেলেবেলায় সে একবার মামার বাড়িতে একটা হিরে দেখেছিল। এই মালাটা যেন তার চেয়ে শতগুণ উজ্জ্বল, মালাটা নিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মিমো। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতে শুরু করল তার। হঠাৎ সব আলো নিভে গেল আর যন্ত্রগোনাম মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেল তার সামনে থেকে।

টনির অ্যান্টেনায় পর পর দু'বার স্পার্ক হল। টানুসদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'লস্টেন' টনিকে তৈরি করেছেন কিছুটা অন্যরকমভাবে। টনি একেবারে টানুসদের মতোই কিন্তু টানুস নয়, বাড়তি বলতে টনির মাথায় আছে দুটো ল্যাতপেতে অ্যান্টেনা। এই দুটোয় আসা সঙ্কেত থেকেই এখন বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহভাবে জানতে পারেন গ্রহের অবস্থা। টনির সঙ্গে লিঙ্ক করা হয়েছে একটা বিশাল মাপের স্যাটেলাইট। গ্রহের যে কোনও কোণ থেকে আসা তরঙ্গের সঙ্কেত আসে টনির অ্যান্টেনায়। আর সেই তরঙ্গের তীব্রতা মেপে টনি আধ সেকেন্ডের মধ্যে বলে দিতে পারে গ্রহের কোন অঞ্চলে, কোন অস্বাভাবিক জিনিস রয়েছে। অথবা কোথায় কোন বিশেষ বস্তুটা আছে তাও। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন যে, টনিই বলে দেবে মিমো কোথায় আছে। কিন্তু না, টনি পারেনি। ঠিক যখন তারা মনে করছেন যে, মিমো তার অলৌকিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আবার মহাকাশে হারিয়ে গেছে যা টনির তরঙ্গসূত্রের এক্তিয়ারের সম্পূর্ণ বাইরে তখনই ঘটল এই বিধ্বংসী ঘটনা। মিনার ধ্বংস হওয়ার দু'ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞানীদের জরুরি বৈঠকে স্থির হয় যে, মিমো এই গ্রহেই রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ এমন নিঃশব্দ ধ্বংস তার ওই সুপারসনিক চিৎকার ছাড়া অসম্ভব, কিন্তু সে অদ্ভুতভাবে এড়িয়ে যেতে পেরেছে টনিকে।

কীভাবে এটা সম্ভব হল তা না জানতে পারলেও, এটা পরিষ্কার যে, এই ঘটনার পিছনে মিমো ছাড়াও অন্য কারও হাত আছে। প্রথম যখন মিমো এই গ্রহে এসে পড়ে তখন টনিই দেখিয়েছিল যে, সে একটা বেন্থল গাছের মাথায় আটকে রয়েছে টাদুড় পাখির মতো সে সময় টনিই মিমোর সাড়া পেয়েছিল অ্যান্টেনায়। অথচ এখন। সুতরাং বিজ্ঞানীরা মিঃ লস্টেনের নেতৃত্বে বসে গেছেন টনিকে আরও শক্তিশালী করার কাজে। আর তারই ফলস্বরূপ পাওয়া যাচ্ছে এই নতুন দুটো স্পার্ক। কিন্তু স্পার্ক দুটো এতই ক্ষীণ যে, সেটা চোখে দেখা যাচ্ছে সেকেন্ডের জন্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে অঙ্ক কষে কিছুতেই স্পার্ক দুটি সম্বন্ধে সামান্য সূত্রও বের করা যাচ্ছে না। সবচেয়ে আশ্চর্য হল স্পার্ক দুটির রঙের পার্থক্য। এদের একটা গাঢ় লাল রং যেটা দিচ্ছে দুরূহ বিপদ সঙ্কেত, আর অন্যটা হালকা গোলাপি অর্থাৎ অদ্ভুত সুন্দর নতুন কিছু একটা এসে পৌঁছেছে বিপিথি গ্রহে। কিন্তু কোথায় সে, আর কোথায়ই বা ঘটতে চলেছে সাঙ্ঘাতিক বিপদ, বিজ্ঞানীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, খুঁজে



লুব্ধকের পৃথিবী

বের করার।

খুব ধীরে ধীরে স্পেসশিপের দরজা খুলে গেল। মামাবাবু নামলেন অতি সন্তর্পণে। তারপর কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন। নামলাম, চারিদিকে একটা অদ্ভুত সবুজ ম্লান আলোর ভেসে যাওয়া। প্রথমে মনে হল গ্রহটায় প্রাণের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব। চারিদিকে জঙ্গল, দূরে নদী আর নদীর পাশ থেকে যেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে বিশাল দৈত্যের মতো পর্বত। মামাবাবু কী সমস্ত ভাবছিলেন, হঠাৎ টান মেরে গ্যাসমাস্কটা খুলে ফেললেন মুখ থেকে। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, "কী করছেন? মারা পড়বেন যে।" কিন্তু সেই চিৎকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মামাবাবুর মুখ শান্তিতে ভরে উঠল।দু'-তিনবার জোরে জোরে শ্বাস টেনে তিনি বললেন, "খুলে ফ্যাল, মুখোশের কোনও দরকার নেই।"

ধীরে ধীরে আমিও খুলে ফেললাম মুখোশ। হ্যাঁ, এই গ্রহেও রয়েছে অক্সিজেন মণ্ডল, দূরে নদী বইছে, জল। তার মানে প্রাণ আছে, আছেই গ্রহটিতে। আমরা এবার মহাকাশ ভ্রমণের যাবতীয় পরিচ্ছদ ছেড়ে ফেললাম। মামাবাবুরগুলো আমার সঙ্গে নিয়ে ছুড়ে দিলাম শিপের মধ্যে। অটোমেটিক দরজা বন্ধ হল নিঃশব্দে। আর সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বাঁধা ল্যাপটপটা টিকটিক করে উঠল দ্রুত। মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলছে ল্যাপটপ?"

দেখলাম ডান কোণের কাছে স্পষ্ট ইঙ্গিত আসছে মানুষের নিশ্বাস। বাঁ দিকের নীচে রয়েছে আরও অনেক এমন সঙ্কেত কিন্তু আরও উজ্জ্বল।

"মানে এই গ্রহে মানুষ বা মানুষের চেয়েও উন্নত প্রাণীরা রয়েছে, বুঝলে মিঃ কুসুম।" আদর করে মামাবাবু ওই নামেই ডাকেন আমাকে। বুঝলাম মুডটা তাঁর বেশ ভাল।

"মানুষ যে রয়েছে তা স্পষ্ট কিন্তু মানুষের চেয়েও উন্নত জীব নাও হতে পারে। উজ্জ্বল সঙ্কেত মানে সাঙ্ঘাতিক কোনও জীবও থাকতে পারে এখানে, তাই নয়?" বললাম খুব ধীরে ধীরে।

মামাবাবু শান্তভাবে এগোচ্ছেন, চতুর্দিকে দৃষ্টি সজাগ। আমি পাশে পাশে চলেছি। হঠাৎ বললেন, "হু, হতে পারে, সাঙ্ঘাতিক কিছু। দ্যাখো, ওই যে দূরে জ্বলছে আলো।"

দেখলাম দূরে তারার মতো ছোট্ট ছোট্ট প্রচুর আলোকবিন্দু, বোধ হয় কোনও শহর। আমরা কাছেই একটা গাছের পাশে বসলাম। তারপর ল্যাপটপ থেকে জানা গেল ওই শহরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিমি। তবে কি মাঝখানে শুধু ফাঁকা মাঠ। কী করব এখন?

মামাবাবু বললেন, "যেতে হবে।"

"কিন্তু যদি ওরা দেখে ফেলে? ফাঁকা মাঠে হেঁটে যাওয়া একটু রিস্কি হয়ে যাবে না?"

"হোক, তবু যেতে হবে। দ্যাখো, আমাদের এই অভিযান সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে। সম্পূর্ণ গোপন এই অভিযানে যে করেই হোক আমাদের সফল হতে হবে। ভয় পেও না, আমরা পারব।"

"কিন্তু যদি আর ফিরতে না পারি তবে তো সমগ্র পৃথিবীর কাছে একটা বিশাল বিস্ময় অজানা থেকে যাবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

মামাবাবু হাসলেন, "অসম্ভব, তুমি কী মনে করো? আমাদের মতো প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আর একজনও নেই বা ভবিষ্যতেও হবে না? আমরা যা পেরেছি তা অচিরেই অন্যান্য দেশও পারবে, বুঝলে। বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট না করে চলো গুছিয়ে নাও।"

কিছু খাবার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর বেশ খানিকটা জল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। শিপে থেকে গেল আকাশ। ও আমাদের সঙ্গে শিপের আর শিপের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ রক্ষা করবে। আত্মরক্ষার জন্য মামাবাবু আমাকে যে যন্ত্রটা দিলেন, সেটা আমরা অনেকদিনের চেষ্টায় বানিয়েছি। এই যন্ত্র থেকে একটা গ্যাস বেরোয়, যা মানুষের মস্তিষ্কে সরাসরি ক্রিয়া করে সবকিছু ভুলিয়ে উন্মাদ করে দিতে পারে মুহূর্তে। আমরা এগোতে শুরু করলাম। বড় বড় উলুঘাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। কোমর পর্যন্ত ডুবে গেছে জঙ্গলে। সাধারণত এইরকম ঘাসের জঙ্গলেই বাঘ থাকে আমাদের ওখানে, কী জানি এখানেও কিছু ওঁত পেতে আছে কিনা! হঠাৎ থপ করে পা ডুবে গেল কাদায়। মামাবাবু পিছিয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে এখন দেখাও যাচ্ছে না। খুব জোরে তুলতে চেষ্টা করলাম কিন্তু কাদা যে প্লাস্টার অফ্ প্যারিসের মতো সেঁটে গেছে। কী করব? পকেট থেকে বার করলাম ছুরি। শক্ত হয়ে যাওয়া কাদা কেটে কেটে তুলতে লাগলাম পা থেকে। মামাবাবুও এগিয়ে এসেছেন। দু'জনেই হাত লাগালাম আমরা। কিন্তু কোনও লাভ হল না। একটু করে কাদা উঠলেই পাশ থেকে আরও কাদা এসে ক্ষুধার্ত কুমিরের মতো কামড়ে ধরতে লাগল পা। আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, পুরো অঞ্চলের কাদা নদীর মতো চলেছে। উপর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা শুকনো ডোবা। কিন্তু পা দিলেই সর্বনাশ। নীচের স্তরে বহমান থকথকে পাঁক, যা এখন জোঁকের মতো কামড়ে ধরেছে আমার ডান পা। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে, ক্লান্ত হয়ে বসে রইলাম সেই কাদাডোবার পাশে। মামাবাবুর কপালে অনেক ভাঁজ, চোখ ক্রমশ ঘোলাটে হতাশায় হলুদ হয়ে আসছে। বললাম,



লুব্ধকের পৃথিবী

"ভোজালি বের করুন। কেটে ফেলুন পা-টা। আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই।"

মামাবাবু হাসলেন, বললেন, "ব্র্যাভো, এই তো চাই। কিন্তু কেটে ফেলার পর কী হবে? এই সম্পূর্ণ অজানা গ্রহে অভিযানের শুরুতেই একটা পা চলে গেলে ফিরব কী করে?"

বললাম, "তা হলে আমার কথা ভুলে যান। ডোবার পাশ দিয়ে এগিয়ে যান আপনি। আমি এখানে আছি।"

"তা হয় না। আমরা দু'জন নেমেছি মাত্র, আর উপরে রয়েছে আকাশ। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করো, দ্যাখো কী হয়।"

বললাম, "তা হলে ওকে নামিয়ে নিন শিপ থেকে। তারপর দু'জনে এগিয়ে যান।"

মামাবাবু আবার মৃদু হাসলেন, "তা হলে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগটা রাখবে কে?"

"একটা কাজ করুন, আমার পা-টা কেটে নিয়ে চলুন শিপে। আমি ঠিক যোগাযোগ রাখব আর আকাশ বেরোবে আপনার সঙ্গে, রাজি?"

মামাবাবুকে দেখে মনে হল বেশ অবাক হয়েছেন। বেশ খানিকক্ষণ কোনও কথা বললেন না। এদিকে আকাশ ঘনঘন বার্তা পাঠাচ্ছে। আমাদের অবস্থা জানতে চাইছে ও। মামাবাবু মাউথপিস অফ করে দিয়েছেন। আমরা কোনও উত্তর পাঠাচ্ছি না। ওদিক থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে আকাশের, "এক্সপ্লয়েটস, আর ইউ ও. কে? এক্স প্লয়েটস্..."

মামাবাবু আমার কাছে এসে বসলেন। তারপর শান্ত আর হাড়হিম করা কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "পারবে?"

আমি বললাম, "কী?"

"যা বলছ। মানে পা কেটে ফিরে যাওয়ার মতো মনের জোর তোমার আছে?"

বললাম, "না কাটলে তো উপায় নেই।"

মামাবাবু ব্যাগ থেকে ভোজালি বের করলেন। আমি হঠাৎ ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘটে গেল অঘটনটা। একটা আকাশ ফাটানো হুঙ্কার আমাদের হতচকিত করে দিয়ে জেগে উঠল খুব কাছে। হঠাৎ এমন চিৎকারে মামাবাবু টাল সামলাতে পারলেন না। হাতের অস্ত্র পড়ে গেল পাঁকের মধ্যে। পড়েই যেন ঘূর্ণিতে পড়ার মতো দ্রুত হারিয়ে গেল সেটা। বুঝলাম ফিরে আসার শেষ সম্বলটুকুও পাঁকের অতলে। কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবার তেমন সময় ছিল না। সারা ঘাসবন চড়বড় শব্দে ভরে গেল হঠাৎ। দেখলাম, একটা বীভৎস বড় প্রাণী, আকারে হাতির প্রায় চারগুণ। দ্রুত ছুটে যাওয়ায় ঠিক বোঝা গেল না পায়ের সংখ্যা। তবে হ্যাঁ, ছ-সাতটা পা হবেই। প্রাণীটা ছুটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একটা একই রকম জীব ছুটে এল এদিকে। বুঝলাম, ওরা খেলা করছে নিজেদের মধ্যে। ওরা ছোটাছুটি করছিল আর পুরো অঞ্চলটা যেন ভূমিকম্পের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আপনমনে খেলতে লাগল ওরা। আমরা কিছু ঘাস দেহের সামনে এনে লুকোতে চেষ্টা করলাম। ওরা একে অন্যকে ধরতে ছুটছিল, তারপর ধরে ফেললে অদ্ভুত আনন্দে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। এবার ওরা খুব আশ্চর্য রকমের খেলা শুরু করল। গুনে দেখলাম, ছোট-বড় মিলিয়ে ওদের মোট ন'টা পা। সেই ন'টা পা দিয়ে ওরা পাথর ছোড়াছুড়ি করতে লাগল। এক-একটা পাথর গায়ে লাগছে আর ওরা দ্বিগুণ বেগে নেচে উঠছে। হঠাৎ একটা পাথর আমাদের দিকে ছুটে এল। পাথরটা সোজা এসে মামাবাবুর কাঁধে পড়েছে। মামাবাবু চিৎকার করে উঠলেন। ব্যস, সেই দৈত্যের মতো প্রাণী দুটোর লাল চোখের বিস্ময় আটকে গেল এইদিকে। আমরা আরও ঘাস টেনে আড়াল করার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। প্রাণী দুটো হাত-পা ছুড়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। আমাদের থেকে দু-তিন হাত দূরে এসে থামল ওরা। প্রায়ান্ধকার এই গ্রহের চাঁদের মতো নরম আলোয় আমরা দেখলাম ওদের শিং দুটো নাচছে। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ। দু'পক্ষই চুপচাপ। আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা আমাদের। হঠাৎ ওদের একজন হু করে নিশ্বাস ছাড়ল। সেই ধাক্কায় বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেলেন মামাবাবু। কিন্তু কোনওক্রমে সামলে নিলেন নিজেকে। না হলে তিনিও কাদায় আটকে পড়ে যেতেন এখনই। আমার নড়বার উপায় নেই, ইচ্ছেও চলে গিয়েছে। বুঝলাম, আর সম্ভব নয় বেঁচে থাকা। অপেক্ষাকৃত ছোট প্রাণীটা তার সবচেয়ে ছোট পা-টা আমার কাঁধে রাখল। ভয়ে আমার মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। কিন্তু মামাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। দেখলাম, তিনি একটা টর্চ জ্বেলেছেন। আলোটা ওদের চোখে ফেলতে চাইলেন। তাতে কোনও ফল হল না, বরং বড়টা বেশ বিরক্ত হল। আমাকে ছেড়ে ওরা মামাবাবুর দিকে দৃষ্টি দিল এবার। বড় প্রাণীটা তার ছোট পা দিয়ে একটা টোকা মারল মামাবাবুর বুকে। মামাবাবু আর পারলেন না। ওই সামান্য ধাক্কায় তিনি ছিটকে পড়লেন কাদার মধ্যে। অমনি ঘটে গেল ম্যাজিক। পুরো কাদার ডোবাটা কী যেন এক আকর্ষণে ছোট্ট হয়ে এল ক্রমশ। আর তার বিপুল টানে আমরা গিয়ে পড়লাম ডোবার একদম মাঝখানে। তারপর ঘূর্ণির মতো ঘুরিয়ে কাদাটা আমাদের টেনে নিল নিজের গহ্বরে। দমবন্ধ হয়ে এল, জ্ঞান হারালাম। ব্যস, সমস্ত অন্ধকার।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র



রোবট-ডাক্তার

ফ্রান্সের স্ট্রাটসবার্গ-এ ৬৮ বছর বয়স্ক এক রোগীর গল ব্লাডার অপারেশন করা হচ্ছে রোবটের সাহায্যে। ৭০০০ কিলোমিটার দূরে নিউ ইয়র্কে বসে চিকিৎসক রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করছেন রোবটটিকে। ঐতিহাসিক এই টেলি-সার্জারির নাম 'লিন্ডবার্গ অপারেশন'।

রোগীর কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসে জটিল অপারেশন করছেন চিকিৎসকরা। কীভাবে? জানিয়েছেন **অতনু চক্রবর্তী**

কল্পনা করা যায়, হাসপাতালে জটিল অপারেশন চালাচ্ছে রোবট! আশ্চর্য মনে হচ্ছে? বিজ্ঞানীরা কিন্তু ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছেন সার্জিক্যাল রোবট। এই রোবট দিয়ে চিকিৎসকরা নিখুঁতভাবে এবং নিরাপদে রোগীকে না ছুঁয়েই অপারেশন করছেন। এমনকী, রোগীর কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বসেও অপারেশন করছেন চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে চলে এসেছে এই সার্জিক্যাল রোবট।

রোবট বলতে আমাদের সামনে যে চেহারা ভেসে ওঠে, সেই যন্ত্রমানবের মতো চেহারা কিন্তু সার্জিক্যাল রোবটের নয়। এই রোবটকে দেখতে অনেকটা অক্টোপাসের মতো এবং এর আঙুলগুলো সরু পেনসিলের মতো আর বেশ নমনীয়। রোগীর শরীরে ছোট ছোট কয়েকটা ফুটো তৈরি করে এরা আঙুলগুলিকে ঢুকিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন পেশি ছুঁয়ে সেই আঙুলগুলি চলে যায় সঠিক জায়গায়। শরীরের বিভিন্ন টিসু বাদ দিতে, জুড়তে আর সেলাই করতে ওস্তাদ এই রোবট। অপারেশনটি যাতে দেখা যায় সেজন্য একজন লোক আলো আর ক্যামেরা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফোকাস করতে থাকেন। পুরো ব্যাপারটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ও দক্ষ শল্যচিকিৎসক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চিকিৎসক তাঁর চেম্বারে বসে ভিডিও মনিটারে পুরো ব্যাপারটি দেখতে দেখতে স্টিকের মতো একটি জিনিস দিয়ে রোবটের হাত নড়াচড়া করান।

সম্পূর্ণ একটি রোবোটিক সার্জিক্যাল ইউনিট তৈরি হয়েছে মাত্র দু'বছর আগে। ক্যালিফোর্নিয়ার 'ইনটুইটিভ সার্জিক্যালস কোম্পানি' 'দ্য ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম' নামে প্রথম মডেলটি তৈরি করে। চার হাতওলা এই রোবটটিই প্রথম হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ অপারেশন করে। ১০ রকমের অপারেশন করতে পারে দ্য ভিঞ্চি। এর মধ্যে করোনারি ধমনীর বাইপাস সার্জারিও রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার আর-একটি কোম্পানি তৈরি করেছে সার্জিক্যাল রোবট 'জিউস'। এই রোবটটিকে দিয়ে আবার অন্য দেশে বসেও অপারেশন করা যায়। বছরখানেক আগে চিকিৎসকরা নিউ ইয়র্কে বসে ফ্রান্সের একজন ৬৮ বছরের বৃদ্ধের গল ব্লাডার অপারেশন করেছেন। এই কোম্পানিটি আর-একটি রোবট তৈরি করেছে, যা দিয়ে ইন্টারনেটের সাহায্যে অপারেশনটি দেখা যাবে, আর বিশেষজ্ঞরা মত বিনিময় করতে পারবেন, সেইসঙ্গে ছাত্ররা শিখতেও পারবে। সার্জিক্যাল রোবটের মাধ্যমে একজন ৬৪ বছরের বৃদ্ধের বাইপাস সার্জারি করা হয়েছে, যা প্রায় ৪০টি দেশের ২০০ জন লোক অনলাইনে দেখেছেন। বিজ্ঞানীদের আশা, পরের প্রজন্মের রোবট আরও বুদ্ধিমান হবে এবং তাদের চিন্তাভাবনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাও থাকবে।

গবেষণা

দেড় কোটি বছর আগের গোলাপ



কসৌলি শিলাস্তরের পুষ্পমঞ্জরীর জীবাশ্ম

জীবাশ্ম দেখে বোঝা যায়, কোনও কোনও ফুলের বয়স প্রায় পাঁচ কোটি বছর। জানিয়েছেন অজিতকুমার পাল

প্রায় দেড় কোটি বছর আগে ফুটেছিল গোলাপ ফুল। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার প্রিন্সটনের কাছে অ্যালেনবি শিলা সংগ্রহের সময় আদি ফুলটি পাওয়া গিয়েছিল। নাম, 'পেলিওরোজা'।

পেলিওরোজা ফুলটি ছোট। এর ব্যাস দু'মিলিমিটার। বৃতি ও পাপড়ি একান্তরভাবে সাজানো এবং নীচের দিকে যুক্ত হয়ে ফুলের কাপের মতো এককটি গঠন করেছে। গর্ভকেশর চক্রটিতে পাঁচটি গর্ভকেশর দেখা গেছে। এদের প্রত্যেকের গায়ে একজোড়া ডিম্বক পাশাপাশি সাজানো। এইসব গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ফুলটিকে গোলাপ পরিবারে রাখা হয়েছে এবং নাম দেওয়া হয়েছে পেলিওরোজা বা 'প্রাচীন গোলাপ'।

এই আদিম ফুলটি ছিল ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো। এ-বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, আজ পর্যন্ত পাওয়া জীবাশ্ম পুষ্পের মধ্যে এরাই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। জীবাশ্মে অজস্র গর্ভকেশর, পুংকেশর, বৃতি আর পাপড়ি পাওয়া গেছে। প্রতিটি ফুলই আলাদা, সুষম আর এদের পাপড়ি খুবই সুন্দর। বৃতিও সুগঠিত। নানা পতঙ্গ এই ফুলের পরাগ মেখে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াত।



দেড় কোটি বছর আগের গোলাপ ফুল পেলিওরোজার প্রস্থচ্ছেদ

সাতের দশকে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি ফুলের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার মধ্যে ইওসিন যুগের শিলাস্তরে। অনেকক্ষেত্রে এদের অঙ্গারীভবন হয়েছে। ফুলের জৈব পদার্থ কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের ডেকান ইন্টারট্র্যাপিয়ান শিলাস্তরের মধ্যেও কিছু ফুলের জীবাশ্ম রয়েছে। গোটা চেহারার পুনর্গঠনের চেষ্টা হয়নি বলে এদের শ্রেণীবিভাগ করা যায়নি। এইসব ফুল প্রায় পাঁচ কোটি বছর আগে ফুটেছিল। ক্রেপেট, ডিল্চার এবং পটার-এর গবেষণায় ইওসিন যুগের কিছু পুষ্পমঞ্জরীর জীবাশ্মের বিশদ বিবরণ পাওয়া গেছে। ফুলগুলি মঞ্জরীদণ্ডের গায়ে ঘোরানো সিঁড়ির মতো সাজানো। নাম দেওয়া হল 'ইওকিরা'। আর-একটি সুন্দর জীবাশ্ম মঞ্জরীর নাম 'ইওমাইমোসয়ডিয়া'।

ভারতে হিমাচল প্রদেশের কসৌলি শিলাস্তরে (নিম মায়োসিন, প্রায় দু'কোটি বছরের পুরনো) একগুচ্ছ ফুল আর ফুলের মঞ্জরীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এদের দেখা মিলেছে কালকা-সিমলা সড়কের ধারে দাখোটা গ্রামের কাছে মিহি দানার কাদাপাথরে। চার ধরনের ফুল আছে এখানে। প্রথমটি একটি সরল পুষ্প। সাতটি বৃত্যংশ সাতটি গোটা পাপড়ির সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত। পাপড়িগুলির আকৃতি চিমটের ডগার মতো, দৈর্ঘ্য দু'মিলিমিটার। গোটা ফুলটির ব্যাস প্রায় পাঁচ মিলিমিটার। দ্বিতীয় ফুলটির সংরক্ষণ আংশিক, পাঁচটির মধ্যে মাত্র তিনটি রয়েছে জীবাশ্মে। তৃতীয় ধরনের ফুলটি সম্পূর্ণ, ছ'টি পাপড়ি যুক্ত। পাপড়ি ডিম্বাকৃতি, লম্বায় ১.৮ মিলিমিটার এবং বাইরের দিকে সবচেয়ে চওড়া অংশের প্রস্থ ২.৮ মিলিমিটার। ফুলটির ব্যাস ছয়



কসৌলি শিলাস্তরে পাওয়া ফুলের জীবাশ্ম

মিলিমিটার। চতুর্থ ধরনের ফুলগুলির দলমণ্ডলে রয়েছে পাঁচটি দল বা পাপড়ি।

ভারতে প্রথম ফোটা ফুলটির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে মধ্যভারতের মোহগাঁও-কালান অঞ্চলে ইন্টারট্র্যাপিয়ান শিলাস্তরে। অধ্যাপক বীরবল সাহনির নাম অনুসারে পেলিওসিন ইওসিন যুগের এই ফুলটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সাহনিঅ্যান্থাস'।

ফোটো: লেখক

পাঠকের পাতা

মঙ্গল গ্রহের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

আমি অনেক গ্রহ, উপগ্রহ, তারাদের পাশ কাটিয়ে মঙ্গল গ্রহে গিয়েছিলাম। মঙ্গল গ্রহের খুদে প্রাণীরা আমাদের স্পেসশিপটাকে নামতে দেখে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। তারপর আমাকে নামতে দেখে আলাপ করতে এল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। মঙ্গল গ্রহে বেড়াতে এসে দেখলাম এখানেও ঘরবাড়ি, নদী-পাহাড় আছে, আর আছে সকলের মধ্যে একতা। আসার সময় কেউ আমাকে আসতে দিচ্ছিল না। শেষে তাদের একটি করে 'আনন্দমেলা' দিয়ে এলাম। তারা সেটা আমার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছে।

শুচিস্মিতা বসু
সপ্তম শ্রেণী
দি নর্থ এন্ড মডার্ন স্কুল
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

জন্মদিনে মঙ্গল গ্রহে

২০২৫ সালের ১০ এপ্রিল। আজ আমার জন্মদিন, স্পেসসুট পরে মঙ্গলগ্রহের অন্যতম কলোনি ফোব্স ০১৯ থেকে ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে এলাম। সামনে একটা ছোটখাটো কালো পাহাড়। উঠলাম তার উপর, ঝোড়ো বাতাস বইছে। এবার আকাশের দিকে তাকালাম, আকাশ মেঘহীন, গাঢ় বেগুনি রঙের। আকাশে অজস্র তারা। তার মধ্যে সন্ধ্যাতারাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু ঝাপসা অনুজ্জ্বল, ছোট্ট আলোর টিপ...। আমার পৃথিবী, যেখানে আমার দেশ, আমার স্বজন, আমার জন্মভূমি।

সৌম্যদেব রায়
ষষ্ঠ শ্রেণী
হাওড়া জিলা স্কুল

মঙ্গল গ্রহে গিয়ে কী কী দেখলাম

১১ ফেব্রুয়ারি। বারো মিনিট সাঁইত্রিশ সেকেন্ড প্লাজমা ঘড়িতে। মানে মঙ্গলের প্রথম অভিযাত্রী, আমার সময় প্রায় শেষ। শুধু লাল, শুকনো গর্ত, ধুলোমাটি, ঝোড়ো হাওয়া, ন্যাড়া পাহাড়—ব্যস। অর্থাৎ মিশন ফেলিওর। হঠাৎ কী একটা উড়ে এসে কানে লাগল। আরে! একটা পালক মতো। চোখের উপর তুলতেই—কীসব চিহ্ন চারদিকে। অদ্ভুত স্ট্রাকচার—কোনওটা গিটার, কোনওটা ট্র্যাপিজিয়াম। একটা সুইচ না! এগোব? বি-ই-ই-প — ফেরার স্লাইডার অন। ঠিক আছে, স্পেসশাট্‌লে উঠে জাদুপালকটা হিলিয়াম জারে রাখি। পরে অ্যানালিসিস করে...। ১৭ ফেব্রুয়ারি। ল্যান্ড করছি। জারটা খুলে...এ কী? ভ্যানিশ!

পূর্ণতা ঘোষাল
সপ্তম শ্রেণী
দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ কারমেল স্কুল
বর্ধমান

মঙ্গলাভিযান

পৃথিবীর কোনও শক্তিই ঠেকে না আমার কল্পনার কাছে। এই কল্পনাই আমাকে নিয়ে গেছিল লাল গ্রহ মঙ্গলে। পাড়ি দিয়েছিলাম যে রকেটে চড়ে তার নাম 'আনন্দমেলা'। মঙ্গলে পদার্পণ করেই নিল আর্মস্ট্রঙের মতো আমিও বলে উঠলাম, "মানব জাতির এই ছোট্ট পদক্ষেপ আজ আরও একধাপ এগোল।" মঙ্গলে নামতেই আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল কিছু সুন্দর শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ। সেই শ্যাওলার গন্ধ প্যারিসের পারফিউমকেও হার মানায়। এর পরে পৌঁছে গেলাম মঙ্গলের মরু প্রদেশে। এই মরু প্রদেশকেই পৃথিবী থেকে লাল রঙের দেখায়। আরও খানিকটা এগোতেই দেখলাম কিছু অদ্ভুত জীব আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে আতঙ্কে আবার 'আনন্দমেলায়' ঢুকে পড়লাম।

শ্রমণা বন্দ্যোপাধ্যায়
সপ্তম শ্রেণী
রাষ্ট্রীয় উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
পুরুলিয়া

যাত্রামঙ্গল

রকেট চড়ে যাচ্ছি উড়ে, দেখতে গ্রহ মঙ্গল
যেন গায়ে জড়িয়ে আছে বিশাল লাল কম্বল।
রকেট এসে নামল শেষে একটা ঝিলের তীরে
চারপাশে তার পাথরগুলো যেন উজ্জ্বল হিরে
গাছের পাতা নীলচে রঙের, আকাশটা বেগুনি
ফোবিয়া আর ডাইমস—দুই চাঁদ সেখানে গুনি।
টপকানো কী সহজ কথা, নেইকো আমার জানা
দেখছি চেয়ে সামনে খাড়াই ধূসর পাহাড়খানা।
গুহা থেকে বেরিয়ে এল মঙ্গলের এক জীব
সবুজ, বেঁটে, ছ'পাওলা দশটা কালো জিভ।
শিংটা নেড়ে করল তাড়া যেই সে আমাকে
ফিরে এসে স্বস্তি পেলাম দেখে আমার মা-কে।

স্যমন্তক দাশ
পঞ্চম শ্রেণী
লবণ হ্রদ বিদ্যাপীঠ
কলকাতা-৭০০ ০৬৪

এবারের প্রতিযোগিতা

এবারের প্রতিযোগিতার বিষয় 'কবিতা লেখো'। আমরা কবিতার দুটি লাইন লিখে দিলাম—'ক্রিকেটের মাঠে ব্যাটিং না পেলে/গোলপোস্ট ভাঙি ফুটবল খেলে।' এই দুটি লাইনের সঙ্গে আরও ছ'টি লাইন লিখতে হবে তোমাদের। স্কুলের যে কোনও ছাত্রছাত্রী, যারা ফোর থেকে এইট-এ পড়ো, এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করে লিখে পাঠাতে পারো। কবিতা হওয়া চাই মৌলিক এবং অপ্রকাশিত। খেয়াল রেখো, কবিতাটি যেন আট লাইনের বেশি না হয়। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে কবিতাটি প্রত্যয়িত করিয়ে নিতে হবে। সেরা পাঁচটি কবিতা 'আনন্দমেলা'য় ছাপা হবে। সমস্ত কবিতা ২০ মে ২০০৪ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে নীচের ঠিকানায়।

আনন্দমেলা 'কবিতা লেখো প্রতিযোগিতা'
পাঠকের পাতা
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১



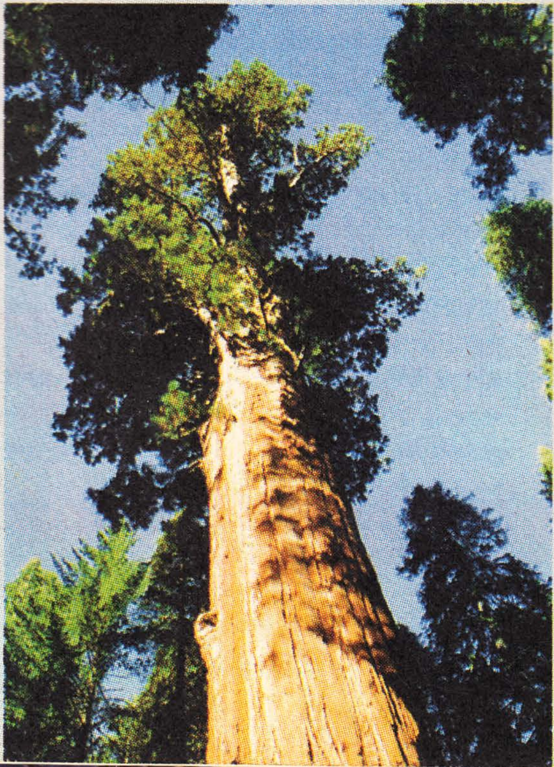
দৈত্যগাছ সেকুইয়া

আয়তনে আর ওজনে ক্যালিফোর্নিয়ার এই গাছ পৃথিবীর বৃহত্তম। এদের জন্মকাহিনিও বেশ মজার। লিখেছেন **অয়ন মণ্ডল**

উচ্চতা ২৫০ ফুট, ওজন আনুমানিক ১৩০০ মেট্রিক টন। আর বয়স? ২৫০০ বছর। প্রায় জীবন্ত দৈত্যই বটে, নাম জায়ান্ট সেকুইয়া বা বিগ ট্রি। ক্যালিফোর্নিয়াতে এদের বাস। ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা পর্বতশ্রেণীর পশ্চিম ঢালে, কিংস ক্যানিয়ন এবং ইয়োসেমাইট ন্যাশনাল পার্কে দেখা যায় এই দৈত্যদের।

আয়তনের দিক থেকে বিচার করলে সেকুইয়া পৃথিবীর বৃহত্তম গাছ। এদের গুঁড়ির পরিধি ১০০ ফুটেরও বেশি। সেকুইয়া গাছের চেয়ে লম্বা গাছও আছে ক্যালিফোর্নিয়াতে, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী রেডউড ফরেস্টে। রেডউড গাছের উচ্চতা প্রায় ৩০০ ফুট। তবে, আয়তনে ও ওজনে এরা সেকুইয়ার কাছে নেহাতই শিশু।

সেকুইয়া গাছের দীর্ঘ আয়ুর রহস্যের অনেকটাই লুকিয়ে আছে এই গাছের ছালে। লালচে বাদামি রঙের ছাল প্রায় ২০ ইঞ্চি পুরু। গাছের ছালে বিশেষ ধরনের কিছু রাসায়নিক থাকার জন্য ছত্রাক ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে এরা রক্ষা পায়। ভাবতে অবাক লাগে প্রায় ১০০ বছর আগে কাটা গাছের গুঁড়ো আজও জঙ্গলে অবিকৃত রয়েছে। এই অদ্ভুত প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্যই এরা আজ প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। কয়েকটি প্রজাতির পাইন গাছ আছে যারা সেকুইয়ার চেয়েও দীর্ঘজীবী। শতাব্দী-প্রাচীন সেকুইয়ার বৃদ্ধির হার বেশি বলেই এদের এইরকম দৈত্যাকার চেহারা। তবে এই বিশাল চেহারাই এদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উলটে পড়ে যাওয়াই সেকুইয়ার মৃত্যুর প্রধান কারণ। বিশাল শরীরের ওজনের তুলনায় এদের শিকড় তেমন পোক্ত নয়। তাই নিজের ভার না রাখতে পেরে এরা উলটে পড়ে।



এই দৈত্যদের জন্মকাহিনিও কম চমকপ্রদ নয়। অত্যন্ত ছোট বীজ থেকে এদের জন্ম। বীজটি থাকে শক্ত শঙ্কু-আকারের খোলের মধ্যে। এই শক্ত খোলের বর্ম ফেটে বীজ বাইরে এলেই জন্ম নেয় 'দৈত্যশিশু'। জঙ্গলের কাঠবেড়ালি এই ব্যাপারে সেকুইয়ার বন্ধু। সেকুইয়ার খোল কাঠবিড়ালিদের প্রিয় খাবার। খোলের বাইরের শক্ত অংশটা এরা ভেঙে খায় আর ভিতরের বীজ এসে পড়ে বাইরে, মাটিতে। অবশ্য সেকুইয়ার বংশবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা আগুনের। জঙ্গলে আগুন লাগলে বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, আর সেই গরমে সেকুইয়ার খোল শুকিয়ে ফেটে একসঙ্গে প্রচুর বীজ ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের মাটিতে, আর প্রাকৃতিক সারের কাজটা করে দেয় সদ্য আগুনে পোড়া পাতার স্তূপ। অঙ্কুরোদ্গমের পরে এই সারেই বড় হয়ে ওঠে সেকুইয়া গাছ।

সি লায়নদের আছে অবাক করা স্মৃতিশক্তি



রিও-র মতো এও এক বুদ্ধিমান সি লায়ন, জোনাও

সমুদ্রের এক আশ্চর্য স্তন্যপায়ী প্রাণী সি লায়ন। এরা অনেক ছবি বা অক্ষর চটপট চিনে নিতে পারে যেমন, সেগুলো মনেও রাখতে পারে অনেকদিন। লিখেছেন ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রিও-র সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল সান্তাক্রুজের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রবিজ্ঞানীদের। তাকে অনেক কিছু শিখিয়েওছিলেন তাঁরা। কয়েকটা কার্ড নিয়মিত দেখাতেন রিওকে। কার্ডগুলোর কোনওটায় অক্ষর লেখা ছিল, কোনওটায় বা সংখ্যা। কার্ডগুলো চেনানোর চেষ্টা করা হত রিওকে। তাঁদের কথাবার্তাও অনেকটাই বুঝতে পারত রিও।

কে এই রিও? রিও এক সি লায়ন-এর নাম। সি লায়ন স্তন্যপায়ী প্রাণী, থাকে সমুদ্রে। ডলফিন, সি কাউ, সিল, তিমি-র মতো সি লায়নদের নিয়েও বিজ্ঞানীদের আগ্রহ কম নয়। জলে থাকতে থাকতে চেহারা পালটে গেছে এই প্রাণীদের। অন্য স্তন্যপায়ীদের মতো লোমে ঢাকা নয় সি লায়নের শরীর। পেছনে পা আছে। পায়ের পাতায় মাঝের তিনটে আঙুলও রয়েছে। ছোট ছোট নখ আছে আঙুলগুলোয়। সি লায়নের শরীর বেশ তেলতেলে। মোটাসোটা মাংসল ঘাড়, অনেকটা সিলের মতো।

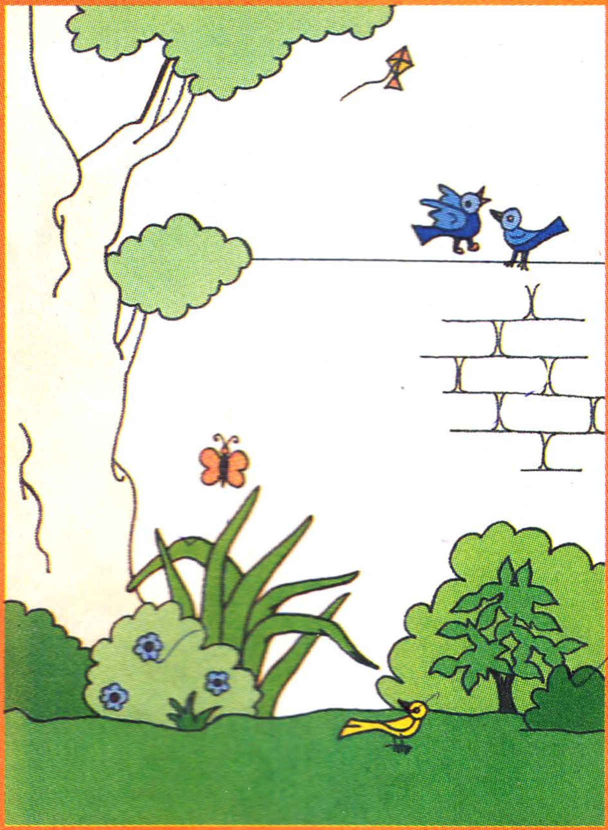
রিওকে নিয়ে অনেক মজার গবেষণা চালিয়েছিলেন সমুদ্রবিজ্ঞানীরা। তাঁদের কথাবার্তা যখন বুঝতে পারল রিও, তখন ওই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন যে, এইসব শেখানো কথা কতদিন মনে রাখতে পারবে এই প্রাণীটি? আর সেটা জানার জন্য রিওর পরীক্ষাও নিলেন তাঁরা। কার্ড দেখিয়ে যেসব সংখ্যা বা অক্ষর চেনানো হয়েছিল রিওকে, কিছুদিন পর সেই সংখ্যা বা অক্ষর লেখা কার্ড আরও অনেক কার্ডের মধ্য থেকে রিওকে বেছে নিতে দেওয়া হল। এই কাজটা করতে পারলে রিওকে যে একটা আস্ত মাছ পুরস্কার দেওয়া হবে সেটাও বুঝিয়ে দেওয়া হল তাকে। তারপর রিও কার্ডের গুচ্ছ থেকে বেছে বের করে দিয়েছিল সঠিক কার্ডগুলি।

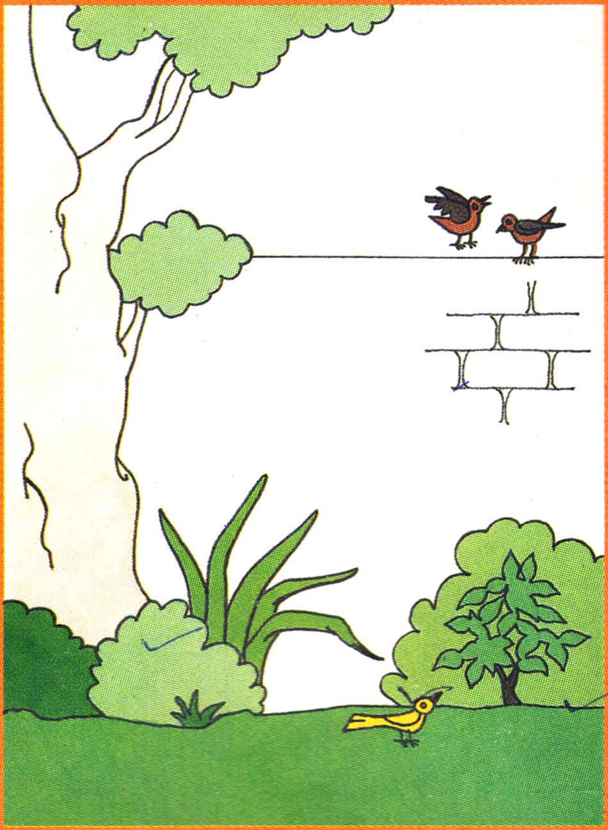
এর পর কেটে গেছে প্রায় ১০ বছরেরও বেশি সময়। এর মধ্যে ওই অক্ষর বা সংখ্যাগুলি আর দেখানো হয়নি রিওকে। বিজ্ঞানীরা দেখতে চাইলেন, এত বছর পর রিও সবকিছু ভুলে গেছে কি না। তাকে বাছতে দেওয়া হল ১০ বছর আগে দেখানো সেই অক্ষর ও সংখ্যাগুলো। দেখানোর আগে পালটে দেওয়া হয়েছিল কার্ডগুলো। অক্ষর ও সংখ্যাগুলো দেখতে একইরকম ছিল, লেখার ধরনটা ছিল আগের চেয়ে আলাদা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে রিও এত বছর পরেও নির্ভুলভাবে বেছে বের করে দিল সঠিক কার্ডগুলি। এবারেও পুরস্কার হিসেবে পেল আস্ত একখানা মাছ।

রিওর মতো আরও এক আশ্চর্য সি লায়ন জোনাও শিখেছিল অনেক কিছু। যেমন মুখে রাইটিং ব্রাশ নিয়ে চাইনিজ় ভাষায় 'মাংকি' লিখতে পারে সে। জোনার বয়স এখন ছ'বছর।

সমুদ্রবিজ্ঞানীরা এখন একমত যে, মানুষ ছাড়া অন্য যে-কোনও প্রাণীর তুলনায় সি লায়নদের স্মৃতিশক্তি অনেক বেশি।

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো





উপরের এই ছবি দুটি দেখতে একইরকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। ছবি: সৌভিক দে

হাসছি দ্যাখো



নিঝুম রাত। রাস্তাঘাট সুনসান। ঘুমে আচ্ছন্ন সবাই। হঠাৎ খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অনিমেষবাবুর। আলো জ্বালতেই দেখলেন ঘরের মধ্যে অচেনা একজন লোক চাবি দিয়ে আলমারি খোলার চেষ্টা করছে। ছিঁচকে চোর, বুঝতেই পারলেন তিনি। হাতেনাতে ধরে ফেলতেই কান্নাকাটি করতে লাগল চোরটি। অনিমেষবাবু বললেন, "কেঁদে চিঁড়ে ভিজবে না। লজ্জা করে না, রাত দুপুরে লোকের বাড়ি চুরি করতে ঢুকেছ।"

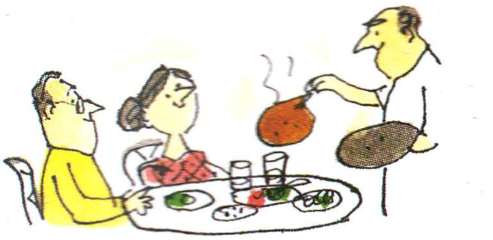
"লজ্জা করে বলেই তো এই রাতের অন্ধকারে চুরি করতে ঢুকেছি স্যার, যাতে কেউ দেখতে না পায়," চোরের উত্তর।

ট্রেনে উঠে ভিক্ষে করছিল একজন লোক। হঠাৎ যাত্রীদের উদ্দেশে সে বলে উঠল, "আসলে আমি একজন লেখক। আমার লেখা বইও আছে বাজারে, নাম, 'অর্থ উপার্জনের একহাজার উপায়'।"

"আশ্চর্য, তুমি তা হলে ভিক্ষে করছ কেন?" একসঙ্গে প্রশ্ন করল ওই কম্পার্টমেন্টের কয়েকজন যাত্রী।

"আসলে আমার বইয়ে লেখা এক হাজার উপায়ের মধ্যে এটাও একটা কিনা, তাই," উত্তর লোকটির।

ওলট পালট



ছবি: দেবাশিস দেব

দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নভোজে অন্নব্যঞ্জন এবং রাতে নৈশভোজ যেভাবে সম্পন্ন হয়।

পাশে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি। এবারে পাশের গোলচিহ্নের ভিতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে উপরের কার্টুন ছবির সংকেতের সমাধান।

গড়াঝটিঝাঁ

কারুইতলা

ফিঙ্গিসারিহেব

অবিমানকতা

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

জিভে আঙুল ঠেকিয়ে ক্যাশিয়ারের টাকা গোনার বদভ্যাসকে যা বলা যায়।

মু দ্রা দো ষ

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ:

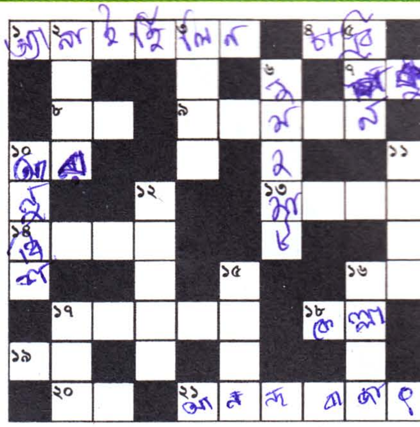
নাগরদোলা, অনিদ্রারোগ, বিষয়সম্পত্তি, অতলসমুদ্র

ঘোষক

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝো-র উত্তর

(১) আকাশে ঘুড়িটি নেই। (২) পাঁচিলের উপরের পাখি দুটি বদলে গেছে। (৩) প্রজাপতিটি নেই। (৪) বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয় ঝোপের তিনটি ফুল নেই। (৫) সরু লম্বা পাতাগুলির সংখ্যা কমে গেছে। (৬) পাঁচিলে ইটের সংখ্যা কম। (৭) ডান দিকের ঝোপটি নেই। (৮) হলুদ-রঙা পাখিটির মাথা ঘুরে গেছে।

শব্দসন্ধান বিষয়: সত্যজিৎ রায়



সংকেত: পাশাপাশি

(১) শঙ্কু-কাহিনিতে উল্লিখিত 'ব্রহ্মাস্ত্র' এমনই। (৪) তাঁর গল্প 'সমাদ্দারের — '। (৫) এর 'ডায়রি' তাঁর একটি গল্প। (৮) 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'-তে শঙ্কু-আবিষ্কৃত 'নস্যাস্ত্র' স্নাফ '—'। (৯) স্মৃতি ফেরাতে শঙ্কু-আবিষ্কৃত যন্ত্র। (১০) '— আছে পোলাপান, একখান, একখান'। (১৩) শঙ্কু-কাহিনি 'স্বর্ণপর্ণী'-তে বেড়ালের আয়ুবৃদ্ধির ওষুধ। (১৪) তাঁর গল্প যেন 'গরল যুক্ত পুষ্প'। (১৬) তাঁর ছবি 'জলসাঘর'-এ এর নাম 'মোতি'। (১৭) তাঁর ছবি 'পোস্টমাস্টার'-এ রাস্তার সেই পাগলটার নাম। (১৮) ফেলুদা-কাহিনিতে যা 'সোনার'। (১৯) তাঁর পরিচালনায় একটিই তথ্যচিত্র। (২০) এরপর 'শশী বন্ধু' মেলালেই 'গোঁসাইপুর সরগরম'-এ ফেলুদার হেঁয়ালি নাম। (২১) ফেলুদার প্রিয় সংবাদপত্র।

উপর-নীচ

(২) শঙ্কু-আবিষ্কৃত স্নায়ু সতেজ করার ওষুধ। (৩) 'পঞ্চপদী অর্থহীন ছড়া'- এটাও তাঁর গল্প। (৫) '— চৌধুরির স্মৃতিভ্রম'। (৬) 'দার্জিলিং —'। (১০) 'শেয়াল-দেবতা রহস্য'-তে মিশরীয় দেবতা। (১১) 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-এ ঘোষাল বাড়ির গণেশের কপালের হিরেটির নাম। (১২) তাঁর গল্পে বিরূপাক্ষ মজুমদারকে খুন করে যে মূর্তি চুরি করা হয়। (১৫) 'গ্রেট ম্যাজেস্টিক সার্কাস' থেকে পালানো বাঘটার নাম। (১৬) গু-গা-বা-বা-তে শুণ্ডী রাজার প্রতিপক্ষ। (১৭) 'অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য'-তে অম্বরবাবুর ড্রাইভারের নাম।

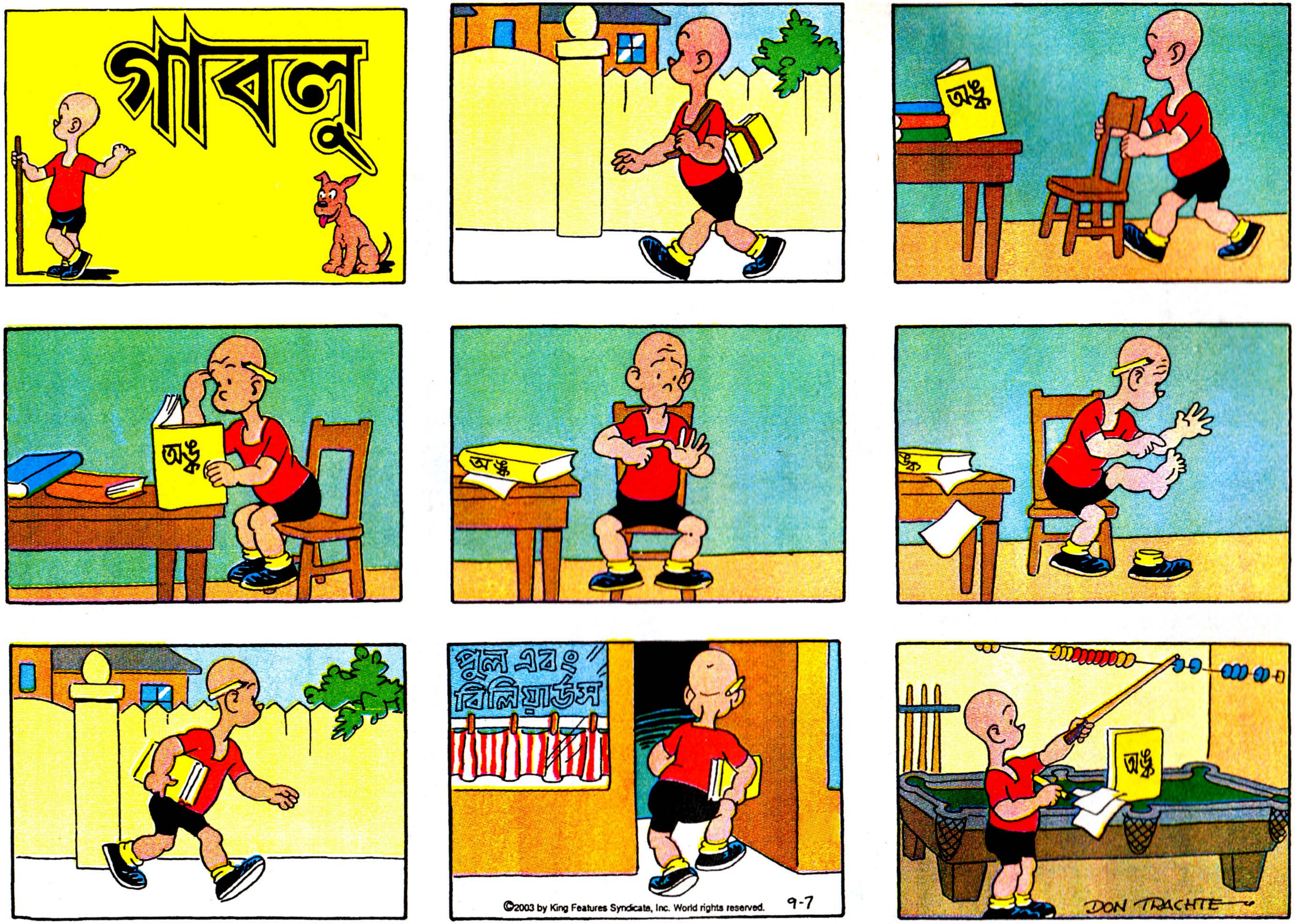
স্নেহাশিস কুমার

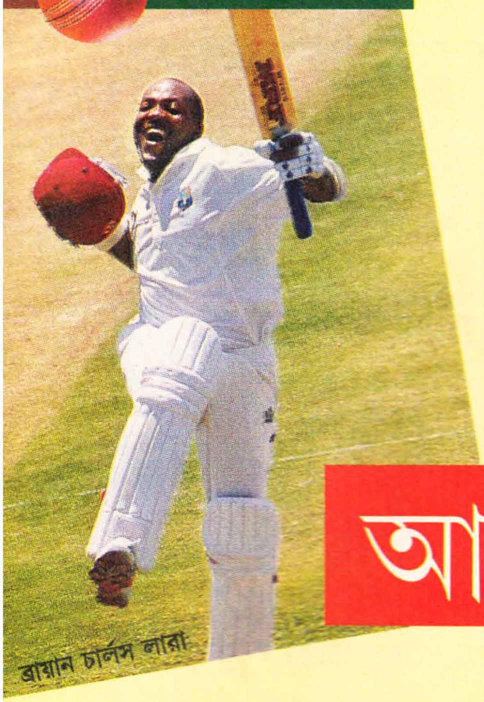
গত সংখ্যার সমাধান

		গো	দা	ব	রী		পা	থা	র
বা	তি	ল		ন			ঞ্জা		জ
স		মা	হ	ত		আ	বি	ষ্কৃ	ত
ব	মা	ল		ল	ঙ্কে	শ			
	ন		হা			কা	য়ি	ক	
	ব	রা	ত			রা		সু	
			টা	ট	কা		আ	র	বি
দি	ন	মা	ন		না	য়ে	ব		রা
ব		শু			ক		দা	প	ট
স	জ	ল		বা	ড়ি	ঘ	র		

রিপ্লির আজব কিন্তু সত্যি




গাবলু
অঙ্ক
অঙ্ক
অঙ্ক
অঙ্ক
পুল এবং বিলিয়ার্ডস
অঙ্ক
DON TRACHTE
9-7



ব্রায়ান চার্লস লারা

আবার লারা বিশ্বসেরা

৪০০ রানের ইনিংস খেলে লারা এখন রূপকথার নায়ক। লিখেছেন চন্দন রুদ্র

সমালোচকদের থামিয়ে ফের স্বমহিমায় জ্বলে উঠেছে 'ত্রিনিদাদের রাজপুত্র' ব্রায়ান চার্লস লারার ব্যাট। 'অসাধারণ', 'অবিশ্বাস্য', 'অভাবনীয়' এমনই সব বিশেষণে ভূষিত হচ্ছেন তিনি। কারণটা মোটামুটি সবার জানা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে ৪০০ রান করেছেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটের ১২৭ বছরের ইতিহাসে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। এ পর্যন্ত অনেক ক্রিকেটারের ব্যাট থেকেই তিনশো রানের ইনিংস এসেছে। কিন্তু তা বলে ৪০০ রানের ইনিংস! এর মাধ্যমে টেস্টে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটি ম্যাথু হেডেনের কাছ থেকে ফের নিজের দখলে এনে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 'জিনিয়াস' শব্দটা শুধু তাঁর জন্যই খরচ করা উচিত।

রেকর্ডের আগের অবস্থাটা একবার ভাবা যাক। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে চারটি টেস্টের মধ্যে তিনটিতেই হেরে লারার দল তখন একেবারে কোণঠাসা। অধিনায়ক হিসেবে ফর্মের নমুনা দেখে, তাঁকে আর অধিনায়ক রাখাটা আদৌ উচিত হবে কি না, তা নিয়েও কথা উঠে পড়েছিল। ব্যাটে তেমন রান পাচ্ছিলেন না, দুই ইনিংসে তো শূন্য রানেই ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। সেখান থেকে ফিরে অ্যান্টিগায় যে এমন খেল দেখাবেন, তা কেউ ভাবতে পারেননি। ৫৫২টি বল খেলে ৪৩টি চার, আর চারটি ছক্কা মেরে ৪০০ রানের ইনিংস খেলে তিনি যখন হাঁটু গেড়ে সবুজ পিচে চুমু খাচ্ছেন, তখন সারা মাঠ উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানিয়েছিল আধুনিক ক্রিকেটের এই মহাতারকাকে।

৩৬ বছর পরে মাইকেল ভনের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ জয় পুরো ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেল লারার এই রেকর্ডের পাশে। তাঁর সব



ঐতিহাসিক ইনিংস খেলে সবুজ পিচে আবেগ উজাড় করে দিচ্ছেন লারা

রেকর্ডের সাক্ষী থাকতে হয় ইংল্যান্ডকেই। এর আগে অ্যান্টিগাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেই ৩৭৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। আবার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর ৫০১ রানের রেকর্ডটিও এজবাস্টনে কাউন্টি ক্রিকেটেই করা। অস্ট্রেলীয় ম্যাথু হেডেন মাত্র ছ'মাস আগে লারার ৩৭৫ রানের রেকর্ড ভেঙে ৩৮০ রানের নতুন রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু ৪০০ রানের ইনিংস খেলে লারা আবার রূপকথার নায়ক। ঝিমিয়ে পড়া ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে আবার আনন্দের সুর। হবে নাই বা কেন! এর আগে দুটি তিনশো রানের ইনিংস খেলেছিলেন একমাত্র ডন ব্রাডম্যান। এখন তাঁর সঙ্গেই এক ব্র্যাকেটে থাকবে লারার নাম। আর কে বলতে পারে, তিনি একদিন স্বয়ং ডনকেই টপকে যাবেন না?

চাপের মুখেই যেন তাঁর ব্যাটের ঝলসানি বেশি দেখা যায়। অনেকটা প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ ওয়-এর মতো। উইজডেনের বিচারে সেরা দশ ইনিংসের তালিকায় যেখানে ভারতের সচিন তেন্ডুলকরের কোনও ইনিংস স্থান পায়নি, সেখানে লারার দুটি ইনিংস জায়গা করে নিয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে সচিনের সঙ্গে বারবার তুলনা টানা হলেও ম্যাচ জেতানো অবিশ্বাস্য সব ইনিংস খেলে লারা কিন্তু সচিনের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে আছেন। সোবার্সের কথাই ঠিক, "কিছু ম্যাচে ব্যর্থ হলেও ওর ফিরে আসা দেখলেই বোঝা যায় ও কত বড় ক্রিকেটার।"

আগামী দিনে এমনই সব অবিশ্বাস্য ইনিংস লারার ব্যাট থেকে বেরোলে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটই নয়, বিশ্ব ক্রিকেটও লাভবান হবে।



হানিফ মহম্মদ এবং জ়াহির আব্বাসের পাশাপাশি পাকিস্তানি ক্রিকেটে সেরার তালিকায়ও ঢুকে পড়েছেন ইনজ়ামাম উল হক। লিখেছেন **প্রীতম সরকার**

পাকিস্তানের 'রান মেশিন'

একদিনের ম্যাচে ভারতের কাছে সিরিজ খোয়ালেও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে দুটো সেঞ্চুরি। মুলতানে প্রথম টেস্টেও সেঞ্চুরি করেছিলেন। লাহোরের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই তাঁকে শূন্য হাতে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়েছিল। সংগ্রহ বলতে প্রথম দিনের ১১৮ রান। তবুও সহ-খেলোয়াড়দের নিয়ে ম্যাচ বের করে নেন তিনি — পাকিস্তানের 'রান মেশিন' ক্যাপ্টেন ইনজ়ামাম উল হক।

সচিনের চেয়ে প্রতিভায় তিনি কিছু কমতি যান না — এমনটাই তাঁর সম্বন্ধে বলতেন প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ইমরান। কিন্তু নিজের ক্রিকেট জীবনে অনেক বিরূপ সমালোচনারও মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। বিশাল চেহারার খেলোয়াড়, চলাফেরার গতি অত্যন্ত মন্থর, রানের জন্য দৌড়তেও যেন বেশ কষ্ট হয় তাঁর, শট নিয়েই হাঁফিয়ে ওঠেন — নিন্দুকদের এই অভিযোগগুলো বরাবরই তাঁর বিরুদ্ধে। তবে তাতে ইনজ়ামামের বিশেষ কিছু যায় আসে না। তিনি চুপচাপ নিজের কাজটাই করে যেতে পছন্দ করেন।

পাকিস্তানি ক্রিকেটে সেরা দুই খেলোয়াড় হিসেবে এতদিন লোকে জানত হানিফ মহম্মদ বা জ়াহির আব্বাসের নাম। তবে ইনজ়ির যা রানের খিদে, তাতে কিছুদিনের মধ্যেই এই তালিকায় ঢুকে পড়েছে তাঁর নামও। একদিনের ক্রিকেটই হোক বা টেস্ট, সবেতেই পাল্লা দিয়ে রান সংগ্রহ করে চলেছেন তিনি। সচিন তেন্ডুলকর যতই ডন ব্র্যাডম্যানের প্রশংসা পান না কেন, রানের গড় হিসেবে কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ইনজ়ি। সচিন, দ্রাবিড় বা লক্ষ্মণ, কেউই ডাব্‌ল সেঞ্চুরির বেশি এগোতে পারেননি। এমনকী ট্রিপ্‌ল সেঞ্চুরি-ক্লাবেও ভারতের প্রবেশ এই কয়েকদিন আগে সহবাগের হাত ধরে। অথচ পাক অধিনায়ক অনেকদিন আগেই ট্রিপ্‌ল সেঞ্চুরি করে বসে আছেন।

যদিও টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে পাকিস্তান আগেই তিনশো-ক্লাবে ঢুকে পড়েছিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিপক্ষে পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ করেছিলেন ৩৬৪ রান। আর ২০০২ সালে লাহোরের মাটিতেই নিউজ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩২৯ রান করেন ইনজ়ামাম। এমনকী ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ খোয়ালেও ম্যান অফ দ্য সিরিজের পুরস্কারটি কিন্তু গিয়েছে তাঁর পকেটে। জোরে বল ঠ্যাঙাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। 'চার' বা 'ছয়' মেরেই রান তুলতেই তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। অন্তত তাঁর খেলা ইনিংসগুলো কাটাছেঁড়া করলে সেটাই মনে হয়। তিনিই এখন বিশ্বক্রিকেটের 'হার্ডেস্ট হিটার'। আসলে আলসেমির মুখোশে নিজের কাজটি ঠিকঠাক করতেই ভালবাসেন ইনজ়ামাম উল হক।

সিরিজ জয়ের পর কাপ হাতে ভরতীয় দলের উচ্ছ্বাস



টিম ইন্ডিয়ার সাফল্যের আসল রহস্যটা কী? ফাঁস করলেন **সব্যসাচী সরকার**

সাফল্যের পাঁচ রহস্য

খোদ পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দেওয়া আর পরদিনই খবরের কাগজের পাতায় আট কলাম জুড়ে টিম ইন্ডিয়ার ছবি, ইতিহাস সৃষ্টি, গণসংবর্ধনা, এসব তো আমরা দেখলাম। সত্যি, এবার বিদেশের মাটিতেও ছোঁয়া যাচ্ছে না সৌরভের দলকে। কীভাবে? অণুবীক্ষণের তলায় দলটাকে ফেলে একটু ময়না তদন্ত করা যাক—

১ সর্বকালের সেরা ব্যাটিং লাইন আপ

ভারতীয় ক্রিকেটের ৭২ বছরের টেস্ট ইতিহাসে এত ভাল ব্যাটিং লাইন আপ কখনও ছিল না। শুরুতে মারকাটারি সহবাগ, বরফঠাণ্ডা মাথার যাবতীয় মশলা থাকা চোপড়া, তিনে শ্রীযুক্ত নির্ভরযোগ্য দ্রাবিড়, চারে ৩৩টি টেস্ট সেঞ্চুরির মালিক সচিন, পাঁচে অক্লেশে ছবি আঁকতে পারা ভি ভি এস লক্ষ্মণ, ছয়ে অফসাইডের ভগবান সৌরভ। তার সঙ্গে যুবরাজ সিংহও এখন টেস্ট দলে— ঢুকব না ঢুকব না করেও শেষমেশ ঢুকে পড়েছেন। এমনকী পার্থিব যে পার্থিব, উচ্চ মাধ্যমিক না দিতে পারেন, কিন্তু ভয়ঙ্কর শোয়েবের বিরুদ্ধে সবুজ পিচে হেলায় করে দিতে পারেন ৬৯ রান। মনে রাখতেই হবে রাহুল দ্রাবিড়কে — টেস্টে গড় ৫৮.৫৮, এখন ক্রিকেট দুনিয়ায় কারও নেই। লারা ৪০০ করেছেন, সচিনের ৩৩টা টেস্ট সেঞ্চুরি, ম্যাথু হেডেনের দৈত্যসুলভ হাবভাব, কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা বিচার্য হলে চোখ বুজে বলে ফেলা যায়, এখন বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটের নাম রাহুল দ্রাবিড়। রাওয়ালপিন্ডির ২৭০ রান বা অ্যাডিলেডের ২৩৩ রান ভুলে যাওয়া যাক, স্রেফ এইটুকু মেনে নেওয়া ভাল, যখনই টিম ইন্ডিয়া বিপদে পড়েছে, ছাতা হাতে গোটা টিমকে ছায়া দিয়েছেন ওই কর্ণাটকি। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস বলছে, বরাবরই এক বা দু'জনের উপর নির্ভর করে থাকত ব্যাটিং, কখনও সেটা গাওস্কর, কখনও বা গাওস্কর-বিশ্বনাথ, কখনও সেটা তেন্ডুলকর। দ্রাবিড় সেই সুবিধে পান, যখন তাঁর আগে থাকেন সহবাগ, আর পরে থাকেন তেন্ডুলকর। তা হলেও টেস্টে পাঁচটা ডবল সেঞ্চুরি আকাশ থেকে পড়ে না। মূলত দ্রাবিড়ের জন্যই সৌরভের টিমের ব্যাটিং লাইন আপ এখন অস্ট্রেলিয়ার চেয়েও এগিয়ে।



২ বোলিংয়ের শৃঙ্খলা

সফর শুরুর আগে ব্যাপারটা ছিল ভারতীয় ব্যাটিং বনাম পাকিস্তানি বোলিং। আদতে গিয়ে দাঁড়াল, শৃঙ্খলাহীন গতি বনাম নিয়ন্ত্রিত সুইং। শোয়েব-সামিরা যেখানে ঘণ্টায় ৯০-৯৫ মাইল গতিতে গাঁকগাঁক করে বল করে গেলেন, সেখানে স্রেফ নিয়ন্ত্রণ আর জায়গায় বল রেখে বাজিমাত ইরফান-বালাজির। বোলিং তো কিছুই ছিল না — জাহির-নেহরা-শ্রীনাথ —বিশ্বকাপের সেই ত্রয়ীই তো হাওয়া। অফস্পিনের সেই জাদুকর হরভজনও নেই, অথচ টেস্টে জিততে গেলে লাগে ২০টা উইকেট, কারা আনলেন সেইসব? অনভিজ্ঞ রোগাভোগা বালাজি আর বদোদরার মধ্যবিত্ত পরিবারের ইরফান পাঠান! একটুও বাড়াবাড়ি নয়, এই জুটি মনে করিয়ে দিচ্ছে কপিল-প্রভাকরকে, দুনিয়াকে জানিয়ে দিচ্ছে, গতি নয়, সঠিক জায়গায় বল রাখাই টেস্ট ক্রিকেটে উইকেট পাওয়ার অস্ত্র। আমরা দেখছি এখন গতি

নয়, নিয়ন্ত্রণই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

৩ আগ্রাসী মানসিকতা

যতই আতিথেয়তা থাকুক আর লাল কার্পেট অভ্যর্থনা হোক, ভারত-পাকিস্তান মানে ভারত-পাকিস্তান। সৌরভ শুধু সেটাকে একটু উসকে দিয়ে বলেছিলেন, "রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসকে চেন টেনে হ্যাঁচকা থামাব।" কথার লড়াই এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অঙ্গ। বুঝতে হয়, জানতে হয়, বলতে হয়। সত্যিই তো থামাল ভারত। এই ভারত হারার আগে হারতে জানে না। এই ভারত ২০০৪-এর মনের কথা বলে, এই ভারত 'ভাল খেলিয়াও পরাজিত'-দের সঙ্গে থাকে না। এই ভারতের কাছে সাফল্যের জন্য বিপক্ষকে বেসামাল করে দেওয়াই আসল কথা, বন্ধুত্ব সত্ত্বেও।

৪ বিজ্ঞানের হাত

টিভিতে প্রায়ই দেখা যায়, ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছেন জনৈক গম্ভীরমুখো ভদ্রলোক, তিনি জন রাইট। সবাই রাইট জানে, লিপাস জানে, গ্রেগরি কিং জানে, কিন্তু রামকৃষ্ণনকে চেনে না। পরিচয় করিয়ে দিই, রামকৃষ্ণন একজন সফ্টওয়্যার বিশেষজ্ঞ। পাকিস্তান হোক বা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড হোক বা দক্ষিণ আফ্রিকা, এঁর কাজই হল ক্রিকেট দুনিয়ার হালফিলের সমস্ত খুঁটিনাটি খবর টিম ইন্ডিয়াকে সরবরাহ করা। শোয়েব কত মাইল বেগে বল করছেন বা লারার ব্যাট কত ডিগ্রি কোণে নামছে, সব নিজস্ব ল্যাপটপে তুলে রাখছেন তিনি। আর তা সময়মতো জানাচ্ছেন জন রাইট ও সৌরভকে। রামকৃষ্ণনের ছবি খবরের কাগজে প্রথম পাতায় ওঠে না, কিন্তু ভবিষ্যতে যারা সৌরভের টিম ইন্ডিয়ার ইতিহাস লিখবেন, বাঙ্গালোরের এই সফ্-টওয়্যার বিশেষজ্ঞ ছাড়া তাদের চলবে না।

৫ অধিনায়কত্ব

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ই ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক কিনা, সেই বিতর্ক এখন নিষ্প্রয়োজন। পরিসংখ্যান বলছে, আজহারউদ্দিনকে টপকে পনেরোটা টেস্ট জিতে সৌরভই ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক। আসলে পরিসংখ্যান কিছুই বলছে না। পরিসংখ্যান বলছে না যে, নতুন ভারত, নতুন মানসিকতা, নতুন ভাবনা — এগুলো ভারতীয় ক্রিকেটে চলে এল এক বঙ্গসন্তানের হাত ধরে। তবে এটা যদি আবেগের কথা হয় তা হলে তথ্যে আসা যাক। ভারতের ৭২ বছরের টেস্ট ইতিহাসে বিদেশে টেস্ট জয় হাতে গোনা। সেখানে ১৫টার মধ্যে সৌরভের সাতটা জয়ই বিদেশে। বিদেশে টেস্ট জয়কে বরাবরই বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে, সিরিজ জয়কে তো আরও। আর এখানেই সৌরভের কৃতিত্ব। এমন একটা জায়গায় টিম ইন্ডিয়াকে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন, যেখানে প্রত্যাশার পারদ আকাশ ছোঁয়ার দিকে। সুতরাং আমরা কেন ভাবব না ২০০৭-এর কথা? কেন ভাবব না আগামী বিশ্বকাপটা উঠবে বঙ্গসন্তানের হাতে?


লক্ষ্মীপতি বালাজি

ভারতের সেরা অধিনায়করা

(১) সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়:
অধিনায়কত্ব করেছেন ৩৮টি টেস্টে, জয় ১৫টি টেস্টে, ড্র ১২টি টেস্ট, পরাজয় ১১টিতে।
টেস্ট জয় দেশে: ৮টি, জিম্বাবোয়ে (২০০০-০১), অস্ট্রেলিয়া (২০০০-০১, ২টি টেস্ট), ইংল্যান্ড (২০০১-০২), জিম্বাবোয়ে (২০০১-০২, ২টি টেস্ট), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০০২-০৩, ২টি টেস্ট)।
টেস্ট জয় বিদেশে: ৭টি, বাংলাদেশ (২০০০-০১), জিম্বাবোয়ে (২০০১), শ্রীলঙ্কা (২০০১), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২০০১-০২), ইংল্যান্ড (২০০২), অস্ট্রেলিয়া (২০০৩-০৪), পাকিস্তান (২০০৪)।

(২) মহম্মদ আজহারউদ্দিন: অধিনায়কত্ব করেছেন ৪৭টি টেস্টে, জয় ১৪টি ম্যাচে, ড্র ১৯টিতে এবং হার ১৪টি টেস্টে।

(৩) সুনীল গাওস্কর: অধিনায়কত্ব করেছেন ৪৭টি টেস্টে, জয় ৯টি টেস্টে, ড্র হয়েছে ৩০টি ম্যাচ, পরাজয় ৮টি টেস্টে।

(৪) মনসুর আলি খান পটৌডী: নেতৃত্ব দিয়েছেন ৪০টি টেস্টে, জয় ৯টি ম্যাচে, ড্র হয়েছে ১২টি টেস্ট, হার ১৯টি টেস্টে।

(৫) বিষেণ সিংহ বেদী: মোট ২২টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে জয় ৬টি টেস্টে, ড্র হয়েছিল ৫টি টেস্ট এবং পরাজয় ১১টি ম্যাচে।

(৬) কপিলদেব: অধিনায়কত্ব করেছেন ৩৪টি টেস্টে, জয় ৪টি ম্যাচে, ড্র ২২টি, পরাজয় ৭টি টেস্ট, ১টি টেস্ট টাই হয়েছিল।

(৭) অজিত ওয়াড়েকর: নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৬টিতে, জয় ৪টি টেস্টে, ৮টি ড্র, হার ৪টিতে।

আর মাত্র কয়েকটা মাস, তারপরই গ্রিসের রাজধানী আথেন্সে বসছে অলিম্পিকের আসর। এবারের অলিম্পিক আরও বেশি বর্ণময়, ঝাঁ-চকচকে। লিখেছেন **সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**



ক্রিটের নতুন স্টেডিয়াম, যেখানে কয়েকটি ফুটবল ম্যাচের প্রিলিমস অনুষ্ঠিত হবে

জন্মভূমিতে ফিরছে অলিম্পিক



গ্রিক দেবদেবী অ্যাথেনা এবং অ্যাপোলোকে নিয়ে অলিম্পিকের ম্যাসকট

অনেক বছর পর আবার জন্মভূমিতে ফিরছে অলিম্পিক, সময়ের হিসেবে প্রায় ১০৮ বছর। আর সেজন্যই বোধ হয় এবার অলিম্পিককে ঘিরে এমন মোহাচ্ছন্ন লাগছে ক্রীড়ারসিকদের। গ্রিসের রাজধানী আথেন্সে বসতে চলেছে অলিম্পিকের আসর — শুধু এই তথ্যটাই তো আবেগের পারদ চড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

এর পিছনে অবশ্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। আসলে 'অলিম্পিক' শব্দটার সঙ্গে এই শহরের একটা অদ্ভুত টান আছে। ১৮৯৬ সালে আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম আসর এখানেই বসেছিল। আর তারও আগে ধরলে অলিম্পিকের মহান আদর্শের শুরুও এখান থেকেই। ইতিহাস বলছে, প্রাচীন অলিম্পিক শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সালে। গ্রিক মহাকাব্যে আছে ক্রোনাসের বিরুদ্ধে জিউসের বিজয়োৎসবের অঙ্গ হিসেবে অলিম্পিয়া পাহাড়ে একটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেটাই প্রাচীন অলিম্পিকের সূচনাপর্ব বলে ধরা হয়ে থাকে। তবে সে সময় অলিম্পিকের খেলাগুলো ছিল একেবারেই অন্য ধরনের। অশ্বচালনা, রথচালনা এসব তো ছিলই, আবার তার পাশাপাশি বক্সিং, কুস্তি, বর্শা ছোড়া ইত্যাদির মতো আমাদের পরিচিত খেলাও ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে ৩৯৩ খ্রিস্টাব্দ — ১১৬৮ বছর ধরে ২৯৩টি গেমস চলার পর রোমান সম্রাট থিওডোসিউসের আমলে প্রাচীন অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত রোমান শাসকদের নিজেদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা অন্তর্দ্বন্দ্বই বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেয় প্রাচীন অলিম্পিককে। তবে এখনকার এই হাইটেক অলিম্পিকের যুগেও কিন্তু অলিম্পিয়া পাহাড়ের সেই কবেকার ধূসর ইতিহাস আজও সমানভাবে অম্লান গবেষকদের কাছে।

সত্যি কথা বলতে আধুনিক অলিম্পিকের উৎস তো নিহিত ছিল সেই প্রাচীন অলিম্পিকের গর্ভেই। যাকে পূর্ণতা দিয়েছেন মঁসিয়ে ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তাঁ, এই ফরাসিই হলেন আধুনিক অলিম্পিকের জনক। আই ও সি, মানে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কাউন্সিলের জন্ম ১৮৯৭ সালে। কুবার্তাঁর উদ্যোগে আধুনিক অলিম্পিক অবশ্য শুরু হয়েছিল তার এক বছর আগেই। ১৮৯৬ সালের ৬ এপ্রিল আথেন্সের অতি প্রাচীন পানা মেনিয়ক স্টেডিয়ামের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন করে নির্মিত

স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হয় গেমসের। ১৩টি দেশের প্রায় ৩২৫ জন প্রতিযোগী যোগ দেন আধুনিক অলিম্পিকের এই প্রথম আসরে।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। আধুনিকতার খোলস ছেড়ে অতি-আধুনিকতার মোড়কে নিজেকে মুড়ে আরও ঝাঁ- চকচকে হয়েছে অলিম্পিক। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে অলিম্পিক। আই ও সি কর্তাদের মতে ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিকই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ অলিম্পিক। সংগঠন এবং পরিচালনার দিক থেকে তাকে কি ছাপিয়ে যেতে পারবে আথেন্স? তবে এই নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট আশাবাদী সবাই। তা সত্ত্বেও কিন্তু অগস্টের ১৩-২৯ — এই পনেরো দিনের মহাযজ্ঞকে ঘিরে চাপা টেনশন থাকছেই বিভিন্ন মহলে!

না, আয়োজনে কোনও ত্রুটি রাখছেন না সংগঠকরা। ঝাঁ-চকচকে গেমস ভিলেজ প্রায় তৈরি, আথেন্সের মূল স্টেডিয়ামটিও একেবারে খোলনলচে বদলে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। উদ্বোধনী এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছাড়াও ম্যারাথন ও পেন্টাথলন বাদে অ্যাথলেটিকসের সমস্ত ইভেন্ট এবং ফুটবল ফাইনালও হবে এই স্টেডিয়ামেই। আথেন্সের অ্যাকোয়াটিক সেন্টার দেখেও সকলে মুগ্ধ। তবে প্রতিযোগীদের যে ব্যাপারটা চিন্তায় রেখেছে তা হল, আথেন্সের আর্দ্রতাপূর্ণ গরম আবহাওয়া। অগস্টের মাঝামাঝি আথেন্সের প্যাচপেচে গরম নিয়ে ভাবিত ইয়ান থর্প, পলা র‍্যাডক্লিফ থেকে রবার্ট করজেনিওস্কি সব্বাই।


আথেন্সের অ্যাকোয়াটিক সেন্টার

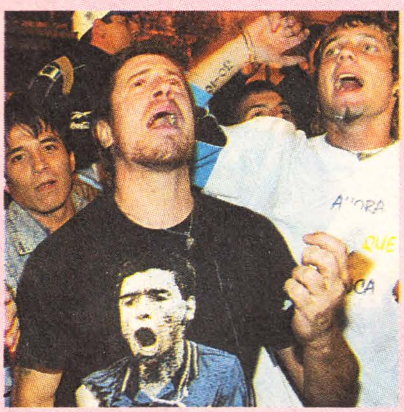
তবে আথেন্সের সাধারণ নাগরিকদের চিন্তায় রেখেছে অন্য একটা সমস্যা, তা হল যানজট। শুনতে অবাক লাগলেও সারা ইউরোপেই যানজটের জন্য আথেন্সের বেশ বদনাম আছে। গেম্‌স চলাকালীন এমনিতেই শহরে প্রচুর বিদেশি পর্যটকরা ভিড় জমাবেন, তা ছাড়া প্রতিযোগীদের নিরাপত্তার খাতিরে যান নিয়ন্ত্রণ করবে পুলিশ। সুতরাং দু'য়ে মিলে রাস্তাঘাটের রোজকার চেহারা যে কোন কিম্ভূতকিমাকার জায়গায় পৌঁছবে, তা কে জানে! এটাই ভেবে আকুল হচ্ছেন আথেন্সবাসীরা।


হাভানায় অলিম্পিকের টর্চ হাতে কিউবান লংজাম্প চ্যাম্পিয়ন ইভান পেড্রোসা

আর প্রশাসনকে উদ্বেগে রেখেছে সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি। ভুললে চলবে না ২০০১ সালে সেই দুঃস্বপ্নময় ১১ সেপ্টেম্বরের পর এটাই প্রথম অলিম্পিক। আর সেইজন্য কর্তৃপক্ষ এবং নিরাপত্তাকর্মীদের একটু অতিমাত্রায় সতর্ক তো থাকতেই হবে। কে ভুলতে পেরেছে ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে গেমস ভিলেজে ঢুকে ইজ়রায়েলি অ্যাথলিটদের উপর প্যালেস্তাইনি গেরিলাদের নৃশংস আক্রমণের কথা। অলিম্পিকের পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত করা সেই ঘৃণ্য লোকগুলোর কথা কোনওদিনই কেউ ভুলতে পারবে না।

তবে আথেন্সের মহারণ একবার শুরু হলে এই সব যানজট, নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বিষয় বিলকুল হাওয়া হয়ে গিয়ে সারা বিশ্ব শুধু খেলা নিয়েই মেতে থাকবে। আর্কলাইটের তলায় হইহই করে ঢুকে পড়বেন মারিয়ন জোন্স, অ্যান্ডি রডিক, ইয়ান থর্পরা, এটা মোটামুটি পাকা। ঝলমলে তারকাদ্যুতি যে সবসময়ই নিকষ অন্ধকারকেও ঢেকে দেয়!

ফ্রি স্টাইল



অসুস্থ মারাদোনা

ফুটবলের রাজকুমার ডিয়েগো মারাদোনা গুরুতর রকমের অসুস্থ। বোকা জুনিয়র্স ক্লাবের একটি খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন আর্জেন্তিনা তথা বিশ্ব-ফুটবলের এই প্রাক্তন তারকা। বুয়েনস আইরেসের সুইজো ক্লিনিকের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি আছেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন হার্ট, হাইপারটেনশন এবং প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন মারাদোনা। কৃত্রিম উপায়ে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখতে হয়েছিল। প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা কিছুটা ভাল হলেও বিপদসীমার বাইরে নন তিনি। সন্দেহ করা হচ্ছে, কোকেন খাওয়ার জন্যই শরীরের এমন অবনতি হয়েছে মারাদোনার। অসুস্থ হয়ে পড়ার দিনও নাকি তিনি মাত্রাতিরিক্ত কোকেন খেয়েছিলেন। পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে তাঁকে।

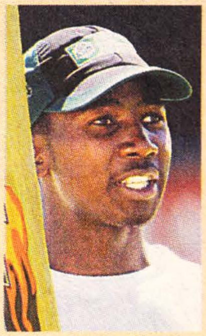


ম্যাচে সন্ত্রাস

নাটকীয় ঢঙে সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনা ভেস্তে দিল লন্ডন পুলিশ। এতদিন পর্যন্ত মাঠে বোমা লুকিয়ে রাখার দৃশ্য শুধু সিনেমাতেই দেখা যেত। কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর লিভারপুলের একটি স্নায়ু-টানটান ম্যাচের আগে এই ঘটনা সত্যিই ঘটতে যাচ্ছিল। ম্যাচের দিন সকালে আল কায়দা সুইসাইড স্কোয়াডের দশজন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করে লন্ডন পুলিশ। ম্যান ইউ বনাম লিভারপুলের ম্যাচ চলাকালীন মাঠে বিস্ফোরণ ঘটানোর প্ল্যান ছিল ওই জঙ্গীগোষ্ঠীর। প্ল্যানমাফিক কাজ এগোলে নিহত হতেন অন্তত ৬৭ হাজার ফুটবলপ্রেমী।

নেতৃত্বে তাইবু

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হোম সিরিজে সম্পূর্ণ নতুন দল নামাতে চলেছে জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ড। সম্ভবত এই সিরিজে কোনও শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটারকে জিম্বাবোয়ের হয়ে খেলতে দেখা যাবে না। হিথ স্ট্রিক সহ ১৩ জন শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটার দল থেকে নিজেদের নাম তুলে নেওয়ার পর তাতেন্দা তাইবুর নেতৃত্বে ১৫ জনের নতুন দল তৈরি করা হয়েছে। ২০ বছরের তাইবু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার হিসেবে তিনি জিম্বাবোয়েকে নের্তৃত্ব দিতে চলেছেন। জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, কোনও পরিস্থিতিতেই বিদ্রোহী শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটারদের সঙ্গে আপোসের রাস্তায় হাঁটবে না তারা।



ইডেনের উন্নতি

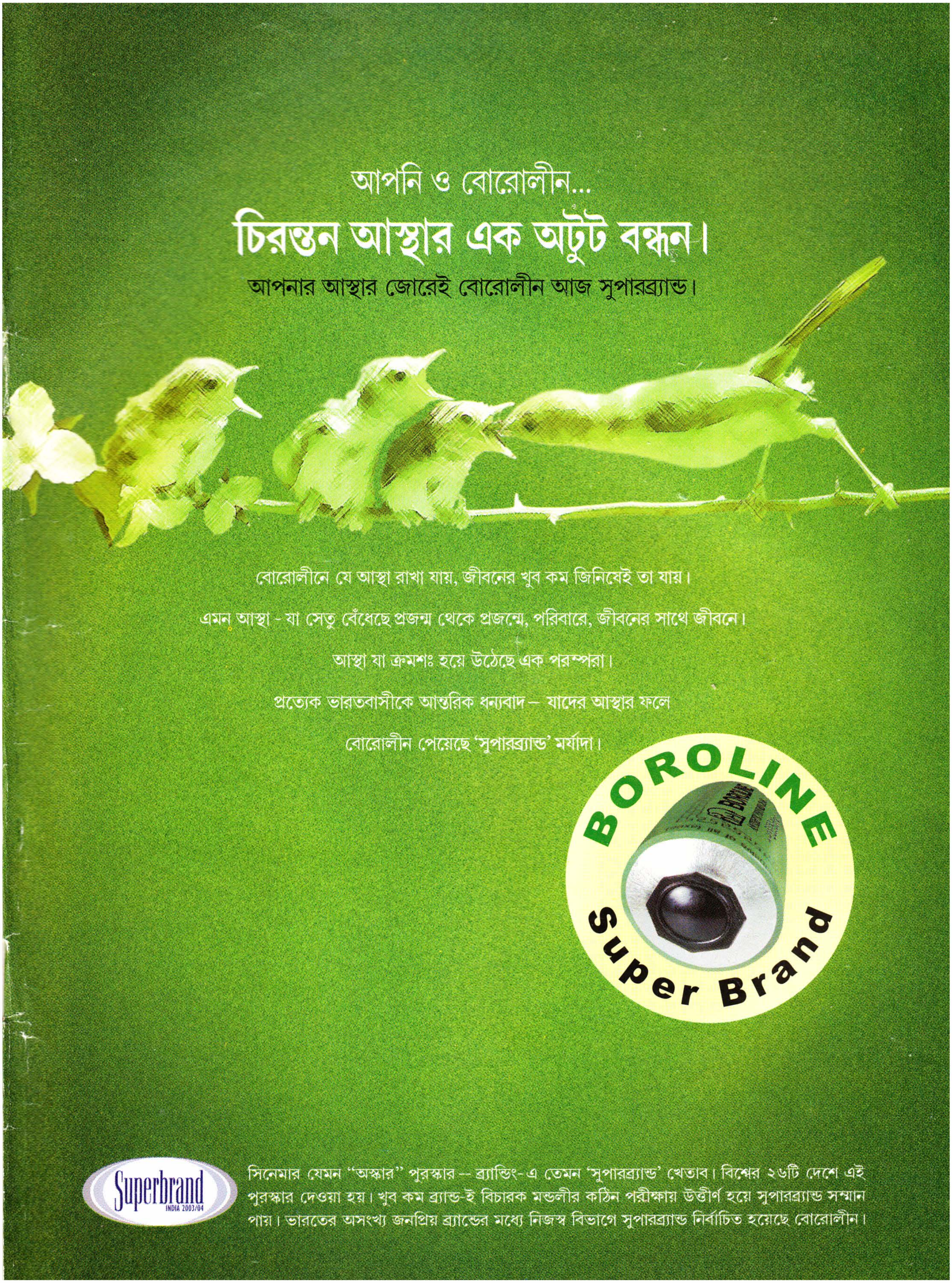
এতদিনে লর্ডসের সমকক্ষ হয়ে উঠতে চলেছে ইডেন। এই বছরেই সেখানে একটি মিউজিয়াম এবং একটি স্যুভেনির শপ তৈরির কাজ শুরু হবে। সি এ বি-র সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া জানিয়েছেন, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মিউজিয়ামে বাংলার নামী ক্রিকেটারদের নানা কীর্তির স্মারক সংরক্ষিত থাকবে। ইডেনে যেসব আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই ম্যাচগুলোর ভি ডি ও ক্যাসেটও রাখা হবে এখানে। স্যুভেনির শপে কিনতে পাওয়া যাবে ইডেনের ছবি দেওয়া ডায়েরি, পেন, কফি মগের মতো নানা জিনিস।

বিপদে 'দুসরা'

বিতর্কিত 'দুসরা' করতে পারবেন না শ্রীলঙ্কার অফস্পিনার মুথাইয়া মুরলীধরন। স্পিন বোলিংয়ের ক্ষেত্রে যে অফিশিয়াল গাইডলাইন আই সি সি বেঁধে দিয়েছে, দুসরা তার মধ্যে পড়ে না। আই সি সি-র পক্ষ থেকে একথা শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। আই সি সি-র গাইডলাইন অনুযায়ী বল করার সময় একজন স্পিনারের হাত পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত সোজা হওয়া দরকার, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দুসরা করার সময় মুরলীর হাত দশ ডিগ্রি পর্যন্ত সোজা হচ্ছে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বায়ো মেকানিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য জানিয়েছেন পাঁচ ডিগ্রির নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলা হলে বহু স্পিনারই নিয়মভঙ্গের দায়ে পড়বেন এবং আই সি সি-র এই গাইডলাইন মোটেই 'প্র্যাকটিক্যাল' নয়। তা সত্ত্বেও কোনওরকম নরম মনোভাব দেখানোর রাস্তায় হাঁটছে না ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। দুসরা করার অভিযোগে কোনও আম্পায়ার যদি আগামী এক বছরের মধ্যে মুরলীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন, তা হলে এক বছরের জন্য ব্যানও হতে পারেন মুরলী। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গত হোমসিরিজে আম্পায়ার ক্রিস ব্রডের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড আচরণবিধি লঙ্ঘনের যে অভিযোগ করেছিল, তার স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণ চেয়েছে আই সি সি।



মনীষা দাশগুপ্ত



আপনি ও বোরোলীন...
চিরন্তন আস্থার এক অটুট বন্ধন।
আপনার আস্থার জোরেই বোরোলীন আজ সুপারব্র্যান্ড।
বোরোলীনে যে আস্থা রাখা যায়, জীবনের খুব কম জিনিষেই তা যায়।
এমন আস্থা - যা সেতু বেঁধেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, পরিবারে, জীবনের সাথে জীবনে।
আস্থা যা ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে এক পরম্পরা।
প্রত্যেক ভারতবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ – যাদের আস্থার ফলে
বোরোলীন পেয়েছে 'সুপারব্র্যান্ড' মর্যাদা।
BOROLINE
Super Brand
Superbrand
INDIA 2003/04
সিনেমার যেমন "অস্কার" পুরস্কার -- ব্র্যান্ডিং-এ তেমন 'সুপারব্র্যান্ড' খেতাব। বিশ্বের ২৬টি দেশে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। খুব কম ব্র্যান্ড-ই বিচারক মন্ডলীর কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুপারব্র্যান্ড সম্মান পায়। ভারতের অসংখ্য জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের মধ্যে নিজস্ব বিভাগে সুপারব্র্যান্ড নির্বাচিত হয়েছে বোরোলীন।

ANANDAMELA 2 MAY 2004 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 RS
LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-236/LPWP-20/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-236/FGN-20/LPWP-FGN-07/2004-06

